শর শাস্ত্র

চাণক্য সিরিজ ২



অভিজ্ঞান গাঙ্গুলী

শর শাস্ত্র

অভিজ্ঞান গাঙ্গুলী







Shar Shastro
by
Abhigyan Ganguly
ISBN: 978-93-92722-92-9

সব চরিত্র এবং ঘটনা সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক।
বাস্তবের কোনো ঘটনার সাথে কোনোভাবে জড়িত নয়।

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ : সপ্তদীপ দে সরকার
অলংকরণ: গৌতম কর্মকার

মূল্য : ৩৯৬ টাকা

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯



ভূমিকা

প্রিয় পাঠক,

নতুন করে কিছু বলার নেই। এই বইটি চাণক্য সিরিজের দ্বিতীয় বই। গল্পের প্রেক্ষাপট ঐতিহাসিক ও লোককথাভিত্তিক হলেও কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে এবার মূল কাহিনির সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে আছে অনেক বেশিমাত্রায়। আশা রাখি, পাঠকরা চাণক্যর 'কৌটিল্য'-চিত চরিত্রের পরিচয় এই বইয়ের দুটি কাহিনিতেই পাবেন। তবে, বইয়ের রসাস্বাদন করতে হলে 'হত্যা-শাস্ত্র' আগে পড়া আবশ্যক। এবার বইতে একটি উপন্যাসিকা এবং একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস আছে। পাঠকদের অনুরোধ তাঁরা বইয়ের ক্রম অনুযায়ীই দুটি কাহিনি পাঠ করবেন। ২০২১ সালের শুরুর দিকে আমি 'সোম-শাস্ত্র' লেখা শেষ করেছিলাম। এরপর এক বছরেরও বেশি সময় পর ২০২২ সালের শেষের দিকে শুরু করি 'শর-শাস্ত্র' এবং পরবর্তী ন-মাস আমি শুধুই এই উপন্যাস লিখেছি। চাণক্যকে ফিরিয়ে আনতে দেরি হওয়ার কারণ আশা রাখি পাঠক এই বই পাঠের সময়েই উপলব্ধি করতে পারবেন এবং এতদিন অপেক্ষা করানোর জন্যে লেখককে ক্ষমা করবেন। আসলে আমি দেখেছি চাণক্যর কাহিনি নিজে থেকেই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় সঠিক সময় এলে। তার আগে বহু ভেবেও উপযুক্ত 'প্লট' মাথায় আসে না। তাই লেখার চেয়েও অনেক বেশি সময় ব্যয় হয় ভাবনায়।

পাঠকদের জানাই, এখানে চরিত্রদের মাঝের সম্পর্ক বোঝাতে 'আপনি' ও 'তুমি' দু-ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ, যখন জীবসিদ্ধি বা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে একান্তে কথা বলছে তখন তারা তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছে। আবার তারাই লোকসম্মুখে সম্রাটকে তার যোগ্যসম্মান প্রদর্শন করে 'আপনি' সম্বোধন করেছে। এই আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক সম্বোধনের ব্যবহারে আশা করি পাঠক দ্বিধায় পড়বেন না। চরিত্রদের মাঝের সম্পর্ক ও মনের ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে সম্বোধন পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলেছে।

আগের বইয়ের মতোই, এই বইতেও সকল রহস্যের সমাধানসূত্র আছে পাঠকের চোখের সামনেই। শুধু এই বইয়ের নয়, মূল রহস্যেরও অনেক ইঙ্গিত কাহিনির আনাচকানাচে ছড়িয়ে রাখলাম দুটি বই জুড়ে। তা উন্মোচন করার ভার পাঠকদের ওপর ছাড়লাম।

সবশেষে বলি, যদি এই বই পড়ার সময়ে কোথাও গিয়ে, কোনখানে ইতিহাস শেষ হয়েছে এবং কল্পনার শুরু হয়েছে এই নিয়ে আপনার দ্বন্দ্ব জাগে; তবে জানব আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

ইতি,
আপনাদেরই প্রশ্রয়ে স্পর্ধিত
এক গল্পকার—
অভিজ্ঞান গাঙ্গুলী।

সূচিপত্র



সোম-শাস্ত্র

১.

আজকে সেজে উঠেছে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র। চারিদিকে মানুষজন পথে বেরিয়ে এসেছে নতুন বস্ত্র পরে এবং অলংকারে সজ্জিত হয়ে। বিনামূল্যে আহার এবং পানীয় দেওয়া হবে প্রতিটি মানুষকে। আজ উৎসব! আজ মহা সমারোহ পর্ব!

হবে নাই-বা কেন? আজ এক বিশেষ দিন। আজকে মগধের সম্রাট, বা, বলা ভালো সমগ্র আর্যাবর্তর সম্রাট, স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর বিবাহ!

পাটলিপুত্রর রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত করা হয়েছে বিভিন্ন ফুল এবং বর্ণময় সজ্জাবস্তু দিয়ে। প্রদীপ সাজানো হয়েছে মহলের প্রতিটি বাতায়ন ও ছাদের ধারে। যদিও এই দিনের আলোয় সেগুলো প্রজ্বলিত নয়। এগুলি সূর্যাস্তের পর প্রজ্বলন করা হবে।

দাসদাসী এবং রাজপুরুষরা ছুটে বেড়াচ্ছে ব্যস্তভাবে। আয়োজনে যেন কোনো ত্রুটি না থাকে আজ! মহামাত্য কৃষ্ণনাথের চোখে গত কয়েক রাত্রি নিদ্রা নেমে আসেনি চিন্তায়। তাঁরই উপর তো সবচেয়ে অধিক দায়িত্ব। একে এই বিশাল আয়োজন, তার উপর এই মুহূর্তে মহলে রয়েছেন বহু ভিন রাজ্যের আমন্ত্রিত রাজপুরুষরা। তাদের আপ্যায়ন ও যত্নের সামান্যতম ত্রুটিতেও প্রশ্নের মুখে পড়বে মগধের গৌরব। প্রতিটি রাজপুরুষের ভিন্ন প্রয়োজন, ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস। তাদের প্রত্যেককে তুষ্ট করতে হবে।

এই মুহূর্তে মহলে আজকের মহাভোজের এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে। পুষ্করিণীর ধারে, বিবাহ মণ্ডপসজ্জা করছে একদল কর্মচারী। তাদের কাজের দিকে নজর রাখছেন মহামাত্য। মাঝে মাঝেই এক-দু-জন করে তাঁর কাছে এসে এসে তাদের প্রয়োজন জানিয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডা মাথায় তাদের কথা শুনছেন এবং প্রয়োজনমতো নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। বয়স হয়েছে তাঁর। যদিও বার্ধক্য ছাপ ফেলেনি কৃষ্ণনাথের স্বাস্থ্যে। তবে শারীরিকের চেয়েও মানসিক দিক থেকে ক্লান্ত। প্রায় গোটা দেশ পরিচালনা করা সহজ কাজ নয়। সব মিটে গেলে সম্রাটকে বলে তিনি কয়েক দিন বিশ্রাম নেবেন।

সম্রাটের কথা মনে হতেই খানিকটা মনমরা হলেন বৃদ্ধ। কতই-বা বয়স হবে চন্দ্রগুপ্তর? নেহাতই সদ্য কৈশোর পেরিয়েছেন। অথচ কী বিশাল দায়িত্ব দৃঢ় হাতে সামলে চলেছেন তিনি। আর এখন এই বিবাহ...

প্রণাম মহামাত্য।

তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ল কৃষ্ণনাথের। ঘুরে দেখলেন ব্রাহ্মণের বেশে এক যুবক উদ্দেশে দু-হাত জোড় করে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'আহ্! জীবসিদ্ধি মহাশয়! প্রণাম।'

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর গুরুভ্রাতা এবং পরম মিত্র জীবসিদ্ধিকে দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন তার দিকে। জীবসিদ্ধি বলল,

'আপনাকে এক দর্শনেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, আপনি কয়েক রাত্রি জাগরণ করেছেন। এত চিন্তা কীসের, আর্য?'

'চিন্তার বিষয় কি কম? এত বড়ো অনুষ্ঠান! এত অতিথি! মগধের মানসম্মান জড়িয়ে আছে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে।'

'বুঝতেই পারছি। তবে নিজের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন, আর্য। মগধের মানসম্মানের সঙ্গে সঙ্গেই, তার মহামাত্যর স্বাস্থ্যও মূল্যবান।'

এতক্ষণে হাসলেন কৃষ্ণনাথ। জীবসিদ্ধি বলল,

'আমি পাকশালার দিকটা পর্যবেক্ষণ করে এসেছি। ঠিকঠাক সব। এদিকে সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। সব ঠিকই আছে আয়োজন।'

'আর সম্রাট?'

মুখে ছায়া নেমে এল বৃদ্ধের। বললেন,

'সম্রাট অতিথিদের অভ্যর্থনা করেছেন যথাযথ। নিজের রাজধর্মে কোনো ত্রুটি রাখেননি। তবে...'

কথাটি অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে গেলেন বৃদ্ধ। জীবসিদ্ধি গম্ভীর হয়ে বলল,

'বুঝতে পারছি।'

একটু ত্রুটি চোখে পড়ায় মণ্ডপসজ্জার কর্মচারীদের উদ্দেশে কয়েকটি নির্দেশ দিলেন কৃষ্ণনাথ। তারপর পুনরায় জীবসিদ্ধির দিকে ফিরে বললেন,

'তিনি কথা বলছেন না বিশেষ কারুর সঙ্গেই। আমি সকলকে নির্দেশ দিয়েছি তাঁকে বিরক্ত না করতে। কোনো প্রয়োজন থাকলে যেন আমায় আগে বলে। সম্রাটকে যেন দূরে রাখা হয় এইসব থেকে।'

‘ঠিক করেছেন!’

নির্মীয়মাণ বিবাহমণ্ডপের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই কথাটা বলল জীবসিদ্ধি। কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রশ্ন করল,

‘কন্যাপক্ষ কখন আসবে?’

‘তাঁরা গতকালই রাজধানীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অন্য একটি মহলে আছেন। সংবাদ এসেছে যে, তাঁরা রাজমহলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন ইতিমধ্যে।’

‘তবে তো বেশিক্ষণ সময় লাগবে না তাঁদের এখানে উপস্থিত হতে।’

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ।’

অঙ্গাবস্ত্রটি এককাঁধে গুছিয়ে নিয়ে জীবসিদ্ধি বলল,

‘তবে আমি একবার সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি।’

‘হ্যাঁ। তাই করুন। আর আচার্য? তিনি কখন আসবেন?’

‘যখন উনি সঠিক সময় মনে করবেন। সেই সময় যে কখন, তা স্বয়ং বিষ্ণু জানেন একমাত্র।’

২.

দালান পার করে সোজা সম্রাটের অন্দরমহলে ঢুকে এল জীবসিদ্ধি। তাকে দেখে দ্বারের দু-জন প্রহরীর একজন ভিতরে ঢুকে গেল। জীবসিদ্ধি রাজরক্ষীদের পরিচিত। তাই তাকে আসতে দেখেই সম্রাটের কাছে তার আগমনের কথা জানিয়ে দিতে গেল। খানিক বাদেই সে বেরিয়ে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে দ্বারের দু-পাশে মূর্তিবৎ পূর্বের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। অর্থাৎ, জীবসিদ্ধির প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন সম্রাট।

কক্ষে প্রবেশ করে জীবসিদ্ধি দেখল একটি চারপায়া কাষ্ঠাসনে বসে আছেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। তিনজন ব্যক্তি তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। আজকে রাত্রের বিবাহের বস্ত্র তাঁর গায়ে চড়িয়ে তাঁরা দেখছেন মাপ ঠিক আছে কি না। চন্দ্রগুপ্ত নির্লিপ্তভাবে বসে আছেন। মুখে তাঁর কোনোরকম অভিব্যক্তি না থাকলেও, জীবসিদ্ধি তাঁর সঙ্গে বহু বছরের পরিচিতির সুবাদে জানে যে, তিনি মনে মনে অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছেন।

জীবসিদ্ধিকে দেখে সম্রাটের মুখে তাঁর পরিচিত হাসি ফুটল না। শুধু তার প্রতি একবার শীতল দৃষ্টি হানলেন।

গোটা মগধে যে কয়েক জন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আজকে এই বিবাহে অসন্তুষ্ট, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং তাদের মধ্যে একজন। সম্ভবত তিনিই সবচেয়ে অধিক অপ্রসন্ন আজকে নিজের বিবাহ নিয়ে।

জীবসিদ্ধি এগিয়ে গিয়ে সম্রাটকে প্রণাম জানিয়ে বলল,

‘সম্রাটের জয় হোক। আপনাকে এই অপূর্ব অলংকার শোভিত রাজবেশে সূর্যের মতোই দীপ্তমান লাগছে। তবে বলে রাখি, মগধের ভাবী মহারানিও কিন্তু রূপে কম যান না। তাঁর রূপের ছটায় স্বয়ং অপ্সরারাও ম্রিয়মাণ।’

কণ্ঠে ক্ষোভ ঝরে পড়ল সম্রাটের,

‘উপহাস করছ হে, জীবসিদ্ধি? উপহাস করছ আমায় নিয়ে?’

সম্রাটের কথায় কক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিরা থেমে গিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে বিস্ময় আর ভীতি। তারা সম্রাটের হঠাৎ ক্ষোভের কারণ অনুধাবন করতে পারছে না।

তবে তারা না জানলেও চন্দ্রগুপ্তর অসন্তোষের কারণ জীবসিদ্ধি জানে; ভালোভাবেই জানে। এবং, তাতে সম্রাটকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর জায়গায় জীবসিদ্ধি নিজে থাকলে সেও এইরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করত।

‘একান্ত!’

কক্ষে উপস্থিত অন্যদের প্রতি নির্দেশ দিল জীবসিদ্ধি। দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করল সম্রাট এবং জীবসিদ্ধি বাদে সকলে।

কক্ষ খালি হতে আনুষ্ঠানিক সম্ভাষণ ত্যাগ করে জীবসিদ্ধি বলল,

‘ভ্রাতা চন্দ্র। আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তুমি তো জানোই এই বিবাহে আমারও মত ছিল না। কিন্তু গুরুদেবের এই সিদ্ধান্ত যে তোমার এবং মগধের পক্ষে হিতকর, সেটা অস্বীকার করা যায় না।’

উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্রগুপ্ত। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,

‘তাই বলে আমার জীবনের এত বড়ো একটি সিদ্ধান্ত তিনি আমার মতের বিরুদ্ধে নেবেন? তুমি কি বুঝতে পারছ আমার মনের অবস্থা? আর কয়েক প্রহর পরেই আমি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছি আমারই পরম শত্রুর কন্যার সঙ্গে! আমি স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে চলেছি, আমার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারী, আমার পরম-শত্রু ধনানন্দর কন্যা দুর্ধরাকে!’

জীবসিদ্ধির মুখে কোনো সান্ত্বনাবাণী জুটল না। হ্যাঁ, এটা সত্য। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর ভাবী মহারানি আর কেউ নয়, স্বয়ং ধনানন্দর একমাত্র কন্যা রাজকুমারী দুর্ধরা। সেই ধনানন্দ যার স্বৈরাচারী শাসন থেকে, কয়েক বর্ষ পূর্বেই মগধকে মুক্ত করেছিল আচার্য চাণক্য

এবং চন্দ্রগুপ্ত। সেই ধনানন্দ যার অত্যাচারের বলি হয়েছিল চন্দ্রগুপ্তর পরিবার। সারাজীবন যার প্রতি প্রবল ঘৃণা নিয়ে বেড়ে উঠেছে চন্দ্রগুপ্ত, আজ তাকেই নিজের আত্মীয় বানাতে বাধ্য হচ্ছে সে।

এবং, এর মূলে আছেন স্বয়ং আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। তিনি বাদে আর কারই-বা ক্ষমতা আছে এই পৃথিবীতে যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে কোনো কাজে বাধ্য করেন? আচার্যই চন্দ্রগুপ্তর এই বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটিকে বিবাহ না বলে বরং একটি রাজনৈতিক চুক্তি বলাই সমীচীন।

কয়েক মাস পূর্বেই একদিন হঠাৎ রাজমহলে এসে হাজির হয়েছিলেন আচার্য চাণক্য। জীবসিদ্ধিও সেসময়ে সেখানেই উপস্থিত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত তাদের নিজের কক্ষে এনে বসাতে, কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই চাণক্য বললেন,

'সম্রাট। আমি মনে করি তোমার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে।'

কথাটা শুনে চন্দ্রগুপ্ত ও জীবসিদ্ধি অবাক হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী চমক বাকি ছিল তখনও। চন্দ্রগুপ্তকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চাণক্য ফের বললেন,

'তোমার বিবাহ ধনানন্দর একমাত্র কন্যা রাজকুমারী দুর্ধরার সঙ্গে দেওয়ার নির্ণয় নিয়েছি আমি।'

চন্দ্রগুপ্ত এবং জীবসিদ্ধি দু-জনেই কয়েক মুহূর্ত আচার্যর মুখের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। প্রথমে তারা ভেবেছিল আচার্য কৌতুক করছেন। কিন্তু চাণক্যর মুখ দেখেই দু-জন বুঝতে পারল তাঁর মুখে কৌতুকের কোনো আভাস নেই। চন্দ্রগুপ্তই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলল,

'এ আপনি কী বলছেন, আচার্য?'

ডান হাত তুলে চন্দ্রগুপ্তকে থামিয়ে দিলেন চাণক্য। বললেন,

'এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, চন্দ্রগুপ্ত। আমি ইতিমধ্যে ধনানন্দর অমাত্য রাক্ষসের নিকট বিবাহপ্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠিয়েছি। কয়েক দিন পরেই তার ও ধনানন্দর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করে বিবাহের তিথি চূড়ান্ত করে আসব।'

'কিন্তু, আচার্য...'

জীবসিদ্ধির কথাও মাঝপথে কেটে দিলেন চাণক্য,

'জীবসিদ্ধি, তোমার গুপ্তচররা যে সংবাদ এনেছে, যে প্রাক্তন সম্রাট নন্দর কয়েক জন সমর্থক একত্রিত হয়েছে বিদ্রোহ করার উদ্দেশ্যে এবং ধনানন্দর ও তার অমাত্য রাক্ষস,

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে তৎপর হয়েছেন, একথা তুমি সম্রাটকে জানিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

চাণক্যর এই 'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে 'সম্রাট', আনুষ্ঠানিক সম্ভাষণের পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে তাঁর এই কথাগুলো তিনি আর ব্যক্তিগত স্তরে বলছেন না। এতএব তাঁর কথার গুরুত্ব এবার যেন চন্দ্রগুপ্ত তাঁর শিষ্য হিসাবে নয়, একজন সম্রাট হিসাবে বিবেচনা করেন। চাণক্য বললেন— সম্রাট, আপনি কি এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারছেন? নন্দ এক অযোগ্য শাসক হলেও, তার অমাত্য রাক্ষস একজন সুদক্ষ প্রশাসক। নন্দ মদ ও আমোদে ডুবে থাকত এবং বাস্তবে সাম্রাজ্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতেন রাক্ষস। অতএব, তাঁর সমর্থক এই রাজ্যে কম নয়। তিনি যদি আমাদের শত্রুর আসনে বসেন এবং বিদ্রোহে ইন্ধন দেন, সেটা আমাদের পক্ষে চিন্তার বিষয়। কিন্তু, অমাত্য রাক্ষস নিজে ধনানন্দর প্রতি অনুগত এবং ধনানন্দর কন্যা দুর্ধরাকে নিজের কন্যাজ্ঞানে স্নেহ করেন। অতএব, তাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ হলে তাঁর আনুগত্য আপনার প্রতি কিছুটা হলেও আসবে। এবং, ধনানন্দ নিজের জামাতার জীবনহানি করে, নিজের পুত্রীকে বৈধব্য জীবনের দিকে ঠেলে দেবে না কখনোই। অর্থাৎ, এই বিবাহে আপনার জীবনহানির আশঙ্কা দূর হবে এবং সেইসঙ্গে বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্বেই ধ্বংস হবে।

'কিন্তু আচার্য! এ যে ধনানন্দ! আপনি কি ভুলে গেলেন তার অত্যাচারের কথা? তার অপমানের কথা? তার কন্যাকে আপনি মগধের মহারানি করতে চাইছেন? তাকে আমায় স্ত্রীর মর্যাদা দিতে বলছেন?'

'হুম। শোনো সম্রাট, মিত্রদের সর্বদা নিকটে রাখতে হয়, কিন্তু শত্রুকে তার চেয়েও নিকটে রাখতে হয় সর্বদা।'

'কিন্তু, আচার্য...'

উঠে দাঁড়িয়েছেন চাণক্য ইতিমধ্যে। অর্থাৎ, আলোচনার ইতি হয়েছে। তিনি আর কোনো কথা শুনতে রাজি নন। চন্দ্রগুপ্ত অসহায়ভাবে জীবসিদ্ধির দিকে চাইল। জীবসিদ্ধি গম্ভীর মুখে দু-পাশে মৃদু ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে, এই বিবাহ প্রস্তাবের বিষয়ে সেও পূর্বে কিছুই জানত না। সে নিজেও চন্দ্রগুপ্তর মতোই বজ্রাহত।

এরপর এই প্রসঙ্গে কোনো কথাতেই চাণক্য কর্ণপাত করেননি। আচার্য চাণক্যর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা স্বয়ং সম্রাটেরও নেই।

কয়েক দিন পর সত্যিই চাণক্য জীবসিদ্ধিকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাসিত ধনানন্দর কাছে যান এবং বিবাহ তিথি ঠিক করে ফেলেন। এই সিদ্ধান্তে যে ধনানন্দ খুশি হয়েছিলেন তা নয়। কিন্তু, যেখানে স্বয়ং সিংহাসনে আসীন মগধ সম্রাট চাণক্যর সম্মুখে বিবশ, সেখানে পরাজিত ও নির্বাসিত সম্রাট তার বিরোধিতা করেন কোন সাহসে?

সব কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল জীবসিদ্ধির। চন্দ্রগুপ্ত বিষণ্ন দৃষ্টিতে বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে, রাজমহলের সজ্জা প্রস্তুতির দিকে চেয়ে আছেন। জীবসিদ্ধি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

'দেখো, ভ্রাতা। আমার সত্যি বলতে তোমায় বলার মতো কিছুই নেই। তোমার বিবাহ শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক চুক্তি একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। কিন্তু, একটি কথা তোমায় আমি বলতে চাই। আচার্যর সঙ্গে আমি ধনানন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। সেইসময়ে আমার রাজকুমারী দুর্ধরার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং সামান্য বাক্য বিনিময়ের সুযোগ হয়েছিল। আমি এইটুকু তোমায় বলতে পারি যে রাজকুমারী দুর্ধরা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। পিতার প্রকৃতি দিয়ে তার বিচার কোরো না। এই পুরো ব্যবস্থায় আমি আচার্যর সঙ্গে অন্তত একটি বিষয়ে একমত। রাজকুমারী দুর্ধরা মগধের যোগ্য মহারানি হবেন।'

বাতায়নের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই চন্দ্রগুপ্ত বলল,

'সে মগধের যোগ্য রানি হবে বটে। কিন্তু, আমার স্ত্রী হবে কি? তাকে কি আমি কোনোদিন ভালোবেসে নিজের স্ত্রীর আসন মন থেকে দিতে পারব? সেও কি কোনোদিন তার পিতার চরম শত্রুকে স্বামী হিসেবে হৃদয়ে স্থান দিতে পারবে?

জীবসিদ্ধির কাছে এ প্রশ্নের উত্তর ছিল না। তবে তাকে উত্তর দিতেও হল না, কারণ সেসময়েই বাইরে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। আর এক প্রহরী এসে জানাল, 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর জয় হোক! মহারাজ, কন্যাপক্ষ রাজমহলে এসে উপস্থিত হয়েছেন।'

৩.

প্রধান ফটক দিয়ে কনেপক্ষের অতিথিরা প্রবেশ করতেই তাদের উদ্দেশে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল মহলের বাসিন্দারা। একদল লোকের মধ্যে প্রবেশ করলেন ধনানন্দ। তাঁর পাশের ব্যক্তিকেও চিনতে অসুবিধা হল না জীবসিদ্ধির— অমাত্য কাত্যায়ন। যদিও

অমাত্য ‘রাক্ষস’ নামেই সে বেশি পরিচিত মগধের জনতার মাঝে। মগধের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

এরপরেই ঢুকল একটি পালকি। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে সেটি। তাতে পর্দার আড়ালে যে স্বয়ং রাজকুমারী দুর্ধরা আছেন তা বলে দিতে হয় না। পালকি থেকে নামলেন রাজকুমারী। তৎক্ষণাৎ একদল নারী এবং কয়েক জন সৈনিক তাঁকে ঘিরে, পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ মহলের অন্দরে নিয়ে গেল। নন্দরাজের সময়ে ওটিই রাজকুমারী দুর্ধরার মহল ছিল।

একটু বাদেই নিজের পূর্ব মহল থেকে বেরিয়ে এলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। মাথায় উষ্ণীষ, পরনে রাজবেশ। এগিয়ে আলিঙ্গন করলেন ধনানন্দ এবং চন্দ্রগুপ্ত। মুখে দু-জনেরই কষ্টকৃত হাসি। এরপর দু-জনেই কোনো কথা না বলে যে যার মহলের পথ ধরলেন।

পুরো ব্যাপারটা দূরে বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল জীবসিদ্ধি। চন্দ্রগুপ্ত ও ধনানন্দর আলিঙ্গন দৃশ্য দেখে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে।

আলিঙ্গন করার মুহূর্তে দু-জনই যে অপরজনের বুকে তরবারি বসিয়ে দেওয়ার কথা কল্পনা করছিলেন, এ বিষয়ে জীবসিদ্ধি নিশ্চিত। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির কারণে কোনোটাই করা সম্ভব হচ্ছে না উভয়ের পক্ষেই— তিনি আচার্য চাণক্য।

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল জীবসিদ্ধি। তার স্পষ্ট মনে আছে, মগধের সিংহাসন দখলের পর চন্দ্রগুপ্তসহ বাকি সকলেরই মত ছিল ধনানন্দকে হত্যা করা হোক। সেইসময়ে তাঁকে গৃহবন্দি রাখা হয়েছে। ধনানন্দ নিজেও গৃহবন্দি অবস্থায় নিজের মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। কিন্তু আচার্য চাণক্য বললেন, ধনানন্দকে হত্যা করা হবে না। তাকে সপরিবার মগধ ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হবে। তাকে প্রাণদণ্ড নয়, নির্বাসিত করা হবে।

প্রতিবাদ করেছিল সকলেই। কিন্তু চাণক্য নিজের নির্ণয়ে অটল রইলেন। এই সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সেইসময়ে বাকিরা বুঝতে অক্ষম হলেও, চাণক্য ভুল করেননি। আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত আচার্য কোনোদিন নেননি।

ধনানন্দকে মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার সুফল পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছিল তারা। দেশবাসী যেখানে নন্দদের হিংস্র, অত্যাচারী সম্রাট বলেই চিনত, সেখানে সারাদেশের জনগণের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল নব্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দয়ালু মনোভাবের কথা। সকলেই জানল যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর হৃদয় এতটাই বিশাল যে, তিনি তাঁর পরম শত্রুকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন।

চতুরঙ্গের মাত্র একটি মোক্ষম চালে সম্পূর্ণ আর্যাবর্তের জনমত মৌর্যদের পক্ষে প্লাবিত করে দিয়েছিলেন চাণক্য। শুধু তাই নয়, ধনানন্দকে হত্যা করলে তাঁর অনুগামীরা সাধারণ জনতাকে ও সৈনিকদের বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করত। সে-সুযোগ তারা পেল না।

তবে ধনানন্দ নিজে যে রাক্ষসের সঙ্গে মিলে রাজদ্রোহের চেষ্টা করবেন সে-সম্ভাবনার কথাও ভেবেই রেখেছিলেন চাণক্য। আর সেই কারণেই যেদিন জীবসিদ্ধির গুপ্তচররা সংবাদ আনল যে, তারা বিদ্রোহ এবং গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করছে, চাণক্য সেই মুহূর্তে নিজের দ্বিতীয় চাল দিলেন। মারী দুর্ধরার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন।

জীবসিদ্ধি ভেবেই অবাক হচ্ছে যে, এই অসম্ভব বুদ্ধিমান, ক্ষুরধার মস্তিষ্ক মানুষটি কতদূর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ভেবে রেখেছেন। অস্বীকার করা যায় না যে, এই বিবাহের ফলে মগধ এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত লাভবান হবেন। রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহের ফলে মগধের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্তর অধিকার আরও অনেকটাই মজবুত হয়ে যাবে। এর ফলে তিনি আর সিংহাসন দখলকারী সম্রাট নন, বরং পূর্ব সম্রাটের কন্যাকে বিবাহসূত্রে প্রকৃত সম্রাট হবেন।

এ ছাড়াও বিদ্রোহের সম্ভাবনা দমন করা গেল এবং নন্দর তরফ থেকে তার প্রাণসংশয় হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকছে না বললেই চলে। চাণক্য জানে সামনে বড়ো যুদ্ধ আসছে। আচার্য শকুনি প্রতিক্ষণে দেশের কোনো কোণে বসে ষড়যন্ত্রের চক্রব্যূহ রচনা করে চলছেন। কোনদিক থেকে তাঁর পরবর্তী আঘাত আসবে তা কেউ জানে না। এর মধ্যে নন্দ, বা, বলা ভালো রাক্ষসও মৌর্যদের বিরুদ্ধে যোগ দিলে তা আশঙ্কার কথা হবে। তাই এই বিবাহের দ্বারা একবাণে একাধিক পাখি শিকার করতে চলেছেন চাণক্য।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্তর কথা ভেবে জীবসিদ্ধির আফশোস হচ্ছে। হাজার হোক চন্দ্রগুপ্ত তার বাল্যমিত্র। এই বিবাহের সংবাদে সে ও তাদের অন্য পাঁচ গুরুভ্রাতাও হর্ষিত হতে পারেনি। অক্ষয়, শশাঙ্কসহ ছয়জন ছাত্রের কেউই মেনে নেয়নি খুশিমনে। তারা, অর্থাৎ আচার্য চাণক্যর ছয় শিষ্য বহু বছর ধরে অভিন্নহৃদয় মিত্র। সেই গুরুকুলের সময় থেকেই তারা একে অপরের গুরুভ্রাতা। নন্দ রাজ্যের পতনে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত ছাড়াও এই পাঁচজনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রত্যেকেই নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দেশকে নন্দদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিল। অতএব স্বাভাবিকভাবেই তাদের কারুরই এই বিবাহে মত নেই। চন্দ্রগুপ্তর বিবাহ এতটাই অকস্মাৎ এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে হচ্ছে যে, জীবসিদ্ধি বাদে অন্য চার ছাত্র আজ এখানে উপস্থিত পর্যন্ত থাকতে পারেনি। তারা প্রত্যেকেই মগধের

বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ গুরুদায়িত্ব সামলাচ্ছে। বিশেষ করে শকুনির সন্ধানের কাজ গত বছর তাদেরই উপর দিয়েছেন চাণক্য।

ছোটো থেকেই জীবসিদ্ধি শুনে এসেছে যে, বিবাহ হল দুটি হৃদয়ের মিলনের অনুষ্ঠান। কিন্তু এক্ষেত্রে তা যে শুধুই রাজনৈতিক পদক্ষেপ হয়ে রইল। হৃদয়ের কথা কেই-বা ভাবে? চাণক্য অন্তত ভাবেন না। আচ্ছা, আচার্যর জীবনে কি কখনো প্রেম এসেছিল? তিনি কি জানেন ভালোবাসার মর্ম? অনুরাগের অনুভূতি? তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন, এমন কোনো নারী কি এই জগতে থাকতে পারে যে চাণক্যকে নিজের হৃদয় অর্পণ করেছিল? নাহ্, এ বোধ হয় সম্ভব নয়। নিজের মনেই এইসব এলোমেলো চিন্তায় ডুবে ছিল জীবসিদ্ধি।

অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে আবার পাকশালের কাছে এসে পৌঁছে গিয়েছে জীবসিদ্ধি। বিশাল, বিস্তৃত জায়গা জুড়ে বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। জীবসিদ্ধি নিজেও পূর্বে কোনোদিন এত আয়োজন চাক্ষুষ করেনি। সে যতই দেখছে ততই বিস্মিত হচ্ছে।

সমস্ত পাকক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ করছেন জীমূতবাহন নামে এক রন্ধন বিশেষজ্ঞ। জীবসিদ্ধি আগ্রহী দৃষ্টিতে সব দেখছে দেখে জীমূতবাহন এগিয়ে এলেন তার দিকে।

'প্রণাম, ব্রাহ্মণদেব।'

হেসে জীবসিদ্ধি বলল,

'প্রণাম, মহাশয়। আপনাকেই খুঁজছিলাম। এখানের বেশিরভাগ বস্তুই আমার কাছে অজানা। জানতে কৌতূহল হয় এই খাদ্যবস্তুর বিষয়ে।'

উৎসাহে জীমূতবাহন মহাশয়ের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। অনেকটা একজন শিল্পীকে তার শিল্প সম্বন্ধে জানতে চাইলে যেমন হয়ে থাকে। জীমূতবাহন শুরু করলেন,

'খাদ্যের স্বাদ বুঝতে গেলে আগে আপনাকে খাদ্যকে বুঝতে হবে। খাদ্য তিন প্রকার। সাত্ত্বিক, যা হল মুনিঋষিদের খাদ্য। যেমন, ফল, দুধ, মধু। রাজসিক, যা আপনার কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। আর আছে তামসিক, যা মানুষের চরিত্রের দোষত্রুটি তথা অন্যান্য তমোগুণ প্রকাশ করে। যেমন ধরুন মাংস, মদিরা ইত্যাদি। আজকের ভোজসভায় সকল প্রকার খাদ্যের আয়োজন আছে মহাশয়। সুকাধন্য, সামিধন্য, শাক, পায়োবর্গ, মদ্যবর্গ, মামসাবর্গ সব।'

জীবসিদ্ধিকে নিয়ে তিনি একদিকে আনলেন যেখানে সবজি, মশলা প্রভৃতি ধোয়া ও বাছাই চলছে। সেদিকে ইঙ্গিত করে জীমূতবাহন বললেন,

'দেখুন। রন্ধনের পূর্বে অনেকগুলি ধাপ থাকে কাঁচা সামগ্রীকে আগে রন্ধনের উপযুক্ত করে তোলার। প্রথম ধাপ 'শোধন'। সবজি ও ফলাদির খোসা ছাড়ানো, হিং-কে ব্যবহারের পূর্বে ঘি-তে আগে ভেজে নেওয়া, জিরে চালুনিতে চেলে নেওয়া, সব শোধনের অন্তর্গত। এরপর আসে 'নিদান পরিবর্জন' অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী থেকে শ্লেষাত্মক উৎপাদক সরিয়ে ফেলা। এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে। কোন খাদ্য ভোজনের পূর্বে খেলে খিদে বাড়ে, বা, কোন বস্তু ভোজনের পরে খেলে পাচন প্রক্রিয়া ভালো হয়। সব খেয়াল রাখতে হয়।'

জীবসিদ্ধি দ্রুত উৎসাহ হারাচ্ছে। কিন্তু এই মহাশয় তাকে এখনই ছাড়তে রাজি নন। তিনি তাকে অন্য একটি অংশে নিয়ে এলেন।

'এখানে ডাল রন্ধন চলছে। তিন ধরনের ডাল। উরদ, মুসুর ও মুগ। ওদিকের বিশাল জালায় দুধ এসেছে। মহিষ, ছাগ ও গোদুগ্ধ আলাদা আলাদা। কারণ তাদের ব্যবহার আলাদা। এদিকে দই থেকে পানীয় ঘোল তৈরি হচ্ছে। ওদিকে দেখুন, ওই বিশাল হাঁড়িতে দুধ, গুড় তথা কিছু বিশেষ তৃণ ফুটিয়ে এক উপাদেয় মধু-পানীয় তৈরি হচ্ছে। এদিকে পুরি তৈরি হচ্ছে সামান্য শুকিয়ে রাখা মেথি পাতা দিয়ে। মণ্ড পুরোটা মাখা হচ্ছে দুধ ও ঘি দিয়ে। এতে রুটি বা পুরির স্বাদ বৃদ্ধি হয় এবং সুগন্ধ হাতে লেগে থাকে ভোজনের দু-প্রহর পরেও। মামস বা মাংস জাতীয় খাদ্য ওইদিকে। মৃগ মাংস হল সবচেয়ে সুস্বাদু মাংস। উত্তর ভারত থেকে তা আনানো হয়েছে নুনের মধ্যে করে। এই মাংস যত পুরোনো হয়, ততই সুস্বাদু। এবং এইখানে...'

বলার প্রয়োজন ছিল না। দেখাই যাচ্ছে। এটা মদিরা জাতীয় পানীয়র অংশ। বিশাল বিশাল পিপে রাখা হয়েছে আলাদা আলাদা করে। কিছু বলার পূর্বেই তাকে বাধা দিয়ে জীবসিদ্ধি বলল,

'আমি মদিরা পান করি না। তাই এতে আমার আগ্রহ নেই।'

কিছুটা মুষড়ে পড়লেন জীমূতবাহন। কিন্তু জীবসিদ্ধির আর ধৈর্য নেই। এখন এই মানুষের থেকে বিদায় নিতে পারলে সে বাঁচে। জীমূতবাহন পুনরায় তাকে অন্য একটি অংশে নিয়ে যেতে চাইছিলেন।

'এইদিকে চলুন। ওদিকে পলান্ন...'

তাঁর কথার মাঝেই ডাক পড়ল,

'জীবসিদ্ধি মহাশয়!'

জীবসিদ্ধি ঘুরে দেখল অমাত্য কৃষ্ণনাথ তাকে ডাকছেন। সম্ভবত কোনো প্রয়োজনে। তাকে দেখে হাতে চাঁদ পেল জীবসিদ্ধি।

জীমূতবাহনের দিকে ফিরে বলল,

‘ক্ষমা করবেন। এখন একটু যেতে হবে। বাকিটা পরে শুনব। প্রণাম!’

জীমূতবাহনের মুখ দেখে মনে হল ঠিক যেন একটি শিশুর হাত থেকে তার প্রিয় পুতুলটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। জীবসিদ্ধি যত দ্রুত সম্ভব সেখান থেকে প্রস্থান করল।

---

*চরক সংহিতা অনুযায়ী,
সুকাধন্য — cereals
সামিধন্য — pulses
শাক — সবজি
পায়োবর্গ — dairy products
মদ্যবর্গ— alcoholic beverages
মামসাবর্গ— meat

৪.

রাজকুমারী দুর্ধরার কক্ষ। নিজের কক্ষ যেভাবে ছেড়ে গিয়েছিল কয়েক বছর পূর্বে, এখনও প্রায় একইরকম আছে। রাজভৃত্যরা গত কয়েক বছর তার অনুপস্থিতিতে পরিষ্কার রেখেছে এই কক্ষ। তাই সকালে এই কক্ষে পা দিতেই অনেকগুলো স্মৃতি এসে ভিড় করছিল দুর্ধরার মনে।

কক্ষ একই আছে, তাতে বসবাসকারী মানুষটাও একই থাকবে। কিন্তু তার মধ্যেই কয়েকটি বছরে সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। দুর্ধরা কোনোদিন দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেনি তাকে এই রাজমহল ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু একদিন তাই হল।

দুর্ধরা বুদ্ধিমতি। আসন্ন সময়ের অশনিসংকেত এই মহলের চার দেয়ালের মধ্যে থেকেও তার নজর এড়িয়ে যায়নি। তার পিতার আমোদপ্রমোদের সঙ্গে সঙ্গেই মাদকাসক্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে তাল মেলাতে প্রজাদের উপর রাজকরের বোঝা বেড়ে চলছিল। এর ফলেই প্রজাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল কয়েক বছর যাবৎ। দুর্ধরা দেখতে পেত তার পিতৃসম অমাত্য কাত্যায়নকে বার বার ব্যর্থ মনোরথে পিতা ধনানন্দর কাছ থেকে ফিরতে। মহামাত্য অনেক চেষ্টা করত পিতাকে সঠিক পথে চালনা করতে। কিন্তু ধনানন্দ ক্রমেই শাসক থেকে স্বৈরাচারী হয়ে উঠছিলেন। এমনকী তাঁর

একান্ত অনুগত কাত্যায়নকেও তিনি সর্বসমক্ষে হেয় করতে পেছপা হতেন না। তাঁর আমোদে বাধা দিয়ে কাজের কথা বলার জন্যে তার পিতা ধনানন্দই কাত্যায়নকে 'অমাত্য রাক্ষস' বলে সম্ভাষণ করতেন। অন্য সভাসদদের ও প্রজাদের মুখে মুখে ক্রমে কাত্যায়নের এই নামই ছড়িয়ে পড়ল। তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি ফোটে না, তাই বোঝার উপায় ছিল না সে মনে মনে দুঃখিত হত কি না। অথচ এত কিছুর পরেও অমাত্য কাত্যায়ন প্রাচীরের মতোই স্থির দাঁড়িয়ে মগধকে রক্ষা করে চলেছিল। তাই দুর্ধরা ভাবেনি যে মহা পরাক্রমী মগধকে কোনোদিন পরাস্ত হতে হবে। ক্রমে সেই দিনটাও এল। দুর্ধরার মনে আছে, একদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই তার কাছে অমাত্য রাক্ষস ছুটে এসে বলেছিল,

'আমরা পরাজিত হয়েছি, রাজকুমারী। আপনি এই মুহূর্তে গোপনে রাজমহল ত্যাগ করুন।'

প্রথমে কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি দুর্ধরা। পরে বুঝতে পেরে তার হৃদয় আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল। সে জানতে চেয়েছিল,

'মহল ত্যাগ করব? আমাদের দুর্গে শত্রু প্রবেশ করবে?'

'সময় নেই, রাজকুমারী। যতটা সম্ভব মূল্যবান হিরা, মাণিক্য ও অলংকার সঙ্গে নিয়ে নিন।'

'কিন্তু... কিন্তু পিতা? আপনি? আপনারা কী করবেন?'

'সম্রাট... সম্রাট বন্দি শত্রুর হাতে! আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারব না। এই রাজসেবক তার রাজার সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করবে, রাজকুমারী। আপনি আপনার সখী ও দাসীদের সঙ্গে মগধ ত্যাগ করুন অবিলম্বে!'

'না! আমি কিছুতেই আপনাদের মৃত্যুর মুখে ফেলে ভীরুর মতো পলায়ন করতে পারব না। আপনি আমায় অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন। প্রয়োজনে আমি হাতে অস্ত্র নেব!'

সেই মুহূর্তে আবেগহীন বলে কুখ্যাত অমাত্য রাক্ষসের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু দেখেছিল দুর্ধরা। আর্দ্র কণ্ঠে মিনতি করেছিল পর্বতের মতো অটল মানুষটি,

'দোহাই রাজকুমারী! আমার কথা শুনুন। নিজের এবং অন্য নারীদের সম্মান রক্ষা করুন। যদি আমাকে আপনি এত বছরে একবারের জন্যেও পিতাজ্ঞানে সম্মান করে থাকেন, তবে এই আমার শেষ অনুরোধ আপনার কাছে।'

এরপর আর কিছু বলতে পারেনি দুর্ধরা। নিজের দু-জন বাল্যসখী কৃষ্ণকলি ও মধুবন এবং সেইসঙ্গে প্রায় ত্রিশজন নারীকে নিয়ে মগধ ত্যাগ করে দুর্ধরা।

পরের দু-দিন দুর্ধরা আত্মগোপন করে অপেক্ষা করেছিল পিতা ও অমাত্যর মৃত্যুসংবাদের। কিন্তু বিস্ময়করভাবেই তা এল না। বরং দুর্ধরা জানতে পারে যে, ক্ষমতা দখলকারী এক তরুণ অধিনায়ক এবং তার ব্রাহ্মণ গুরু নাকি কাউকে হত্যা করেনি। সকলের সামনে দু-টি বিকল্প রেখেছে। হয় তাদের সঙ্গে যুক্ত হও অথবা নির্বাসনে যাও।

প্রথমে এই সংবাদ বিশ্বাস করেনি দুর্ধরা। কিন্তু তার কয়েক দিন পশ্চাৎ যখন তার পিতা এবং অমাত্য অক্ষত ফিরে এল, সেদিন মনে মনে ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়েছিল সে। রাক্ষসকে নাকি পুনরায় মহামাত্য পদে বহাল করতেও চেয়েছিল শত্রুরা। কিন্তু রাক্ষস রাজি হননি।

পিতা ধনানন্দ আগামী কয়েকটি বছর শুধুই নিজের অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হয়েছেন দিনরাত।

কিন্তু দুর্ধরার মনে জেগেছিল কৌতূহল। কে এই চন্দ্রগুপ্ত? যে নাকি বিজিত পক্ষের প্রতিটি নারীকে সসম্মানে বেঁচে থাকার বিকল্প দিয়েছে। কে এই সেনানায়ক যে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির রক্ত ঝরাতে অস্বীকার করেছে?

অমাত্য রাক্ষসের পুরো বিষয়টায় কী দৃষ্টিভঙ্গি সেটা বোঝা যায়নি। তিনি নিজেও মুখ ফুটে কিছু বলেননি। কিন্তু পিতা ধনানন্দ এইসব কিছুকে চূড়ান্ত অপমান হিসাবেই দেখেছেন। তাকে জীবনদান করাটা সবচেয়ে বড়ো অপমান বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো অপমান বাকি ছিল।

কয়েক মাস পূর্বেই হঠাৎ রাজকুমারী জানতে পারেন যে, তাঁর সঙ্গে সেই অজানা সেনানায়ক, বর্তমানে মগধ নরেশ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর বিবাহপ্রস্তাব রাখা হয়েছে মগধের পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রস্তাবপত্রের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, এই প্রস্তাব অস্বীকার করার ফল ভালো হবে না! বোঝাই যায় এই পত্রের প্রেরক এই বিবাহ সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর। এবং, তার পিতা ধনানন্দর হাতে কোনো বিকল্প রাখেনি।

রাক্ষস এসেছিল দুর্ধরার মত নিতে। তিনি এও বলেছিলেন যে, তিনি এই বিবাহে রাজি নন। দুর্ধরা অসম্মত হলে তিনি তাই জানাবেন মগধকে। এবং, এর ফলে যেকোনো বিপদের মোকাবিলা তিনি করবেন।

দুর্ধরা তার রাজধর্ম পালন করে সম্মতি জানায়। সে জানত অসম্মতির ফল কী হতে পারে। এরপর যেদিন দু-জন ব্রাহ্মণ তার কাছে আসে তার মত শুনতে, সেদিনই তাদের সম্মতির কথা জানিয়ে দেন দুর্ধরা। কারণ রাজকুমারী বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই বিবাহ করতে অস্বীকার করলে রাজরোষ নেমে আসবে তার পিতার উপর। রাজকুমারী তা হতে

দেবেন না। তিনি নিজের রাজধর্ম পালন করে শত্রুর সঙ্গে একই শয্যা গ্রহণ করবেন, প্রয়োজনে ধর্ষিত হবেন। কিন্তু তার কারণে নিজের প্রিয়জনের প্রাণ বিপন্ন করবেন না।

নিজের শয্যায় বসে সমস্ত কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল রাজকুমারী দুর্ধরার। প্রতিটি নারীর স্বপ্ন থাকে এক স্বপ্নপুরুষকে জীবনসঙ্গী করার। কিন্তু আজ তাঁর বিবাহ। এবং, রাজকুমারী নিজের হবু স্বামীকে চোখেও দেখেননি। জানেন না তিনি যে আগামী দিনে কী ধরনের অত্যাচার অপেক্ষা করে আছে তাঁর জন্যে। বহুক্ষণ দমন করে রাখা অশ্রু চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল তাঁর। কিন্তু না! তাঁকে দৃঢ় থাকতে হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। এই তাঁর রাজধর্ম, যা তিনি পালন করবেন।

বহুক্ষণ পূর্বেই তাঁর এবং তাঁর কক্ষে উপস্থিত দু-জন সখীর জন্যে ভোজন দিয়ে গিয়েছে এক ভৃত্য। স্বর্ণ থালায় সাজানো খাদ্য ও স্বর্ণ পানপাত্রে দেওয়া পানীয় রাজকুমারীর জন্যে। এবং, সেইসঙ্গে দুটি সাধারণ পেতলের থালা ও পেয়ালায় খাদ্য ও পানীয় তাঁর দুই সখীর জন্যে।

গরম খাবার ঠান্ডা হয়ে জুড়িয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। খাবার সুযোগ হয়নি, কারণ এই থালা তিনটি রেখে যাওয়ার পর পরই একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পর পর তিনজন তাঁর কক্ষে এসেছিল। শেষজন এই খানিকক্ষণ পূর্বেই কক্ষ ত্যাগ করল। তাই এতক্ষণ ভোজন করার সুযোগ পায়নি কেউই।

রাজকুমারীর দীর্ঘ মেঘঘন কেশে সুগন্ধি তৈল মালিশ করে দিচ্ছে তাঁর দু-জন সখী। এই কাজ শেষ হলেই তারা ভোজন করবে।

হঠাৎ কেশে টান লাগায় দুর্ধরা বলে ওঠেন,

'উফ! কৃষ্ণ! কোনদিকে মন তোমার?'

'ক্ষমা করবেন, রাজকুমারী।'

'তুমি দেখছি অন্যমনস্ক হয়ে আছ, কৃষ্ণ। কী হয়েছে?'

'কি... কিছু না, রাজকুমারী।'

দ্বিতীয়জন, অর্থাৎ মধুবন বলে বসল,

'আপনার বিবাহ নিয়ে শুধু কৃষ্ণ নয়, আমিও চিন্তিত রাজকুমারী। কোন বর্বরের সঙ্গে আপনার...'

কথা শেষ করতে না দিয়েই দুর্ধরা বলে উঠলেন,

'মধু! তোমায় বলেছি না? এই বিষয়ে কোনো কথা তোমাদের মুখে শুনতে চাই না আমি। যা হচ্ছে, তা আমি মেনে নিয়েছি। ব্যস! এই আমার ভবিতব্য। এই আমার রাজধর্ম।'

কেশ পরিচর্যা শেষ হয়েছে ইতিমধ্যে। রাজকুমারী বললেন,

'এইবার তোমরা আহার শুরু করো। আমার ক্ষুধা নেই।'

মধুবন বরাবরই বেশি কথা বলে। আর কৃষ্ণকলি শান্ত, মুখচোরা। মধুবন বলল, 'আপনি না খেলে আমরাও এই আহার মুখে তুলব না, রাজকুমারী। কি, তাই তো, কৃষ্ণ?'

কৃষ্ণকলি কিছু একটা ভাবছিল। একটু চমকে উঠে বলল,

'হ... হ্যাঁ হ্যাঁ।'

দুর্ধরা উঠে বসলেন। বললেন,

'বেশ। একটু মেজ এগিয়ে দাও আমার দিকে। আমি তৃষ্ণার্ত।'

ভোজন সাজানো চারপায়া মেজটা দু-জন মিলে ঠেলে শয্যার সামনে এনে রাখল। সোনার পানপাত্রটির দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেলেন রাজকুমারী। তিনি দেখলেন তিনটি পানপাত্রেই একই পানীয় দেখা যাচ্ছে। ভুরু কুঁচকে বিরক্তস্বরে বললেন,

'আরে, একী? এ কী ধরনের অপদার্থ রাজকর্মী? আমায় সুরা দিয়েছে! এদের কি এইটুকু জ্ঞান নেই যে, ক্ষত্রিয়রা সুরা পান করে না! মধু, যাও, বাইরে দাসকে বলো আমার জন্যে সোম এনে দিতে। অথবা, অন্য কোনো পানীয়।'

মধুবন উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে কৃষ্ণকলি উঠে দাঁড়াল,

'ন... না, না! আ... আমি যাচ্ছি। তুমি এখানে থাকো। আমি যাই।'

বলে দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করল কৃষ্ণকলি।

সে বেরিয়ে যেতে দুর্ধরা বলল,

'কৃষ্ণর আজ হয়েছে কী?'

মধুবন ততক্ষণে নিজের পাত্রের পানীয় শেষ করে ফেলেছে অর্ধেক। উত্তর দিল, 'বোধ হয় আপনার জন্যে ওর মন ব্যাকুল। আপনার বিবাহ নিয়ে...'

আবার এই প্রসঙ্গ শুনতে ইচ্ছে করল না দুর্ধরার। তাই কথা ঘুরিয়ে রাজকুমারী বললেন,

'এই আমার পানপাত্রের পানীয়ও তুমিই পান করো। নাও।'

সখীর পানপাত্রে নিজের পাত্র থেকে সবটুকু পানীয় ঢেলে দিলেন রাজকুমারী। নিজে অপেক্ষা করতে লাগলেন আলাদা পানীয় আসার।

পুনরায় নিজের ভাবনায় ডুবে যাচ্ছিলেন রাজকুমারী দুর্ধরা। হঠাৎই পর পর দুটি শব্দে তাঁর চিন্তাসূত্রে বাধা পড়ল। প্রথমে ধাতব কিছু পতনের শব্দ এবং পরমুহূর্তে ভারী একটি শরীরের পতনের শব্দ।

সেদিকে দৃষ্টি ঘোরাতেই আতঙ্কে মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল রাজকুমারীর। কারণ মেঝেতে পড়ে আছে তাঁর প্রিয় সখী মধুবন। হাত থেকে পানপাত্র আগেই খসে পড়েছে। মধুবনের মুখ থেকে গ্যাঁজলা জাতীয় কিছু বের হচ্ছে। চোখ দুটি উলটে গিয়েছে, সারাশরীর থরথর কাঁপছে মেঝেতে।

রাজকুমারীর চিৎকার শুনে কক্ষের বাইরে থেকে প্রহরী ও দাসীদের প্রবেশের কয়েক মুহূর্তকালের মধ্যেই কাঁপুনি থেমে গেল মধুবনের শরীরে। নিষ্প্রাণ নিথর দেহ এলিয়ে পড়ল!

৫.

নিজের কক্ষে পদচালনা করছেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

একটি আসনে বসে আছে জীবসিদ্ধি। জীবসিদ্ধি লক্ষ করছে চন্দ্রগুপ্তকে। চন্দ্রগুপ্ত দুশ্চিন্তায় থাকলেই এভাবে পদচালনা করেন। একই জায়গায় বার বার গোলাকারে হেঁটে বেড়ান। এটা আগেও একাধিকবার লক্ষ করেছে জীবসিদ্ধি।

‘ব্যাপারটা কে কে জানে?’

চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করতেই, নিজের ঠোঁটে হাত দিয়ে তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করল জীবসিদ্ধি। নিজের আসন ছেড়ে প্রথমেই উঠে গিয়ে কক্ষের দ্বার বন্ধ করল। অতীতে বহু বছর আচার্য চাণক্যর জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করার ফলে জীবসিদ্ধির মধ্যে এক সহজাত সতর্কতার ভাব তার চারিত্রিক বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে দু-জন রাজপ্রহরী মোতায়েন আছে এমনিতেই। কারুর পক্ষেই তাদের বার্তালাপ বাইরে থেকে শুনতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবুও দ্বাররুদ্ধ না করে কথা শুরু করতে জীবসিদ্ধির আপত্তি।

নিজের আসনে ফিরে এসে বলল,

‘আপাতত গোপন রাখা হয়েছে অন্যান্য অতিথিদের থেকে। আমি, মহামাত্য কৃষ্ণনাথ এবং আমাদের কয়েক জন রক্ষী জানে। আর জানে ধনানন্দ এবং রাক্ষস। তাদের জানাতে বাধ্য হয়েছি রাজকুমারীর অনুরোধে। এ ছাড়া কয়েক জন বিশ্বস্ত রাজরক্ষী জানে। উপায়ও নেই তাদের না জানিয়ে।’

‘তারা অন্য কাউকে জানাবে না এমন ভাবার কারণ কী?’

‘এই দু-জনের সঙ্গে সর্বক্ষণ একজন করে বিশ্বস্ত রাজরক্ষীকে থাকতে নির্দেশ দিয়েছি। রক্ষীর সামনে কথা বলতে পারবে না কেউই।’

‘আর অন্য রক্ষীরা?’

‘তাদের এই মহলে প্রহরায় থাকতে বলেছি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত। এর ফলে তারা অতিথিদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে না।’

‘বেশ। আর?’

‘রাজকুমারীর দ্বিতীয় সখী নিরুদ্দেশ এখনও। তবে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করতে পারেনি আমি নিশ্চিত। সে এখানেই কোথাও আছে। বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না। রাজার আদেশে প্রধান দ্বার আমি রুদ্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছি। কোনো অবস্থায় যেন কাউকে প্রবেশ করতে বা বাহিরে যেতে না দেওয়া হয়। শুধু একজন ব্যতীত। তিনি এলে যেন তৎক্ষণাৎ তাকে এই দক্ষিণ মহলে আনা হয়।’

চলা থামিয়ে জীবসিদ্ধির দিকে চেয়ে চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন,

‘তা ‘তিনি’ কখন আসছেন?’

‘একজন সৈনিক দ্বারা সংবাদ পাঠিয়েছি আচার্যর কাছে। চলে আসবেন আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই।’

পুনরায় পদচালনা শুরু করলেন চন্দ্রগুপ্ত।

জীবসিদ্ধি নিজের আসনে বসেই কক্ষের সজ্জা দেখতে শুরু করল। সে একজন উত্তম পর্যবেক্ষক। আচার্যর সমান না হলেও, অন্যদের থেকে তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বেশি নিঃসন্দেহে।

মখমলের ভারী রক্তিম পর্দা ঝুলছে বাতায়নের দু-ধারে ও দ্বারে। ছাদ থেকে মস্ত ঝাড়বাতি। এর সঙ্গে আজকের বিশেষ অবসরে ছাদে ও দেয়ালে পুষ্পমালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। আসবাব সাজানো। একমাত্র সম্রাটের নিজের আসনটি নির্দিষ্ট স্থানে নেই, কারণ তাতে সম্রাট খানিক পূর্বেই উপবিষ্ট ছিলেন। আর একটি ত্রিপায়া মেজের উপর চন্দ্রগুপ্তর অর্ধভুক্ত খাদ্যের কিছু অংশ রয়ে গিয়েছে।

সম্রাটের আহারের মাঝেই মধুবন নামক যুবতীর হত্যা সংবাদ নিয়ে প্রবেশ করেছিল জীবসিদ্ধি। হত্যাকারীর আসল নিশানা যে রাজকুমারী দুর্ধরা, তা বলাই বাহুল্য। অতএব, আহার সমাপ্ত না করেই চন্দ্রগুপ্ত আসন ত্যাগ করেছেন।

চিন্তায় ছেদ পড়ল বাহিরে রক্ষীর ভারী কণ্ঠস্বরের ঘোষণায়,

‘মহামতি চাণক্য দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।’

জীবসিদ্ধি দ্রুত উঠে গিয়ে দ্বার খুলে দিল।

কক্ষে প্রবেশ করলেন বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। মুণ্ডিত মস্তকে দীর্ঘ কেশশিখা বিশিষ্ট সন্ন্যাসীর বেশ তাঁর। অঙ্গাবস্ত্রের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে থাকা উপবীত-সূত্র তাঁর ব্রাহ্মণকুলের পরিচয় দেয়। বিস্তৃত ললাটে ত্রিপুণ্ড টিকা কাঁধে তাঁদের অতিপরিচিত কাপড়ের ঝোলা। দন্তসারি অনিয়মিত হওয়ায় এই কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যম উচ্চতার ব্যক্তির মুখের গঠনে এক ধরনের কুরূপতা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাঁর অত্যধিক উজ্জ্বল দুটি চোখে তাঁর অন্য সমস্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যহীনতাকে ছাপিয়ে যায়। সেই দু-চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন সম্মুখ ব্যক্তির হৃদয়ের গহিন কোণের সমস্ত গোপন রহস্য প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম।

চাণক্য প্রবেশ করতেই সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও জীবসিদ্ধি তাঁর পদ স্পর্শ করে প্রণাম করল। তাদের মস্তকে হাত রেখে ব্রাহ্মণ বললেন,

'সদা সুমতি ভবঃ।'

জীবসিদ্ধি একটি আসন এগিয়ে দিতে চাণক্য তা গ্রহণ করলেন। জীবসিদ্ধি দ্বার রুদ্ধ করে পুনরায় এসে বসল নিজের স্থানে।

চন্দ্রগুপ্ত এবং জীবসিদ্ধির মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর চোখে চোখ রাখছেন না। নিজের বিবাহ নিয়ে তিনি গুরুর উপর ক্ষুণ্ণ। চাণক্য নিজেও তা জানেন। অতএব জীবসিদ্ধির উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন,

'হুম। কী ঘটেছে?'

'হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, আচার্য!'

'সম্রাটকে?'

'আজ্ঞে না। রাজকুমারী দুর্ধরার পানীয়ে কেউ মারণ বিষ মিশ্রিত করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছে!'

'সেকী? সে ঠিক আছে তো?'

এই প্রথমবার কণ্ঠে ঔৎসুক্য প্রকাশ পেল চাণক্যর।

'হ্যাঁ, রাজকুমারী ঠিক আছেন। ভাগ্যক্রমে সেই পানীয় তিনি পান করেননি।'

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন চাণক্য। জীবসিদ্ধি বলল,

'কিন্তু সেই বিষ তাঁর এক সখীর প্রাণ নিয়েছে, আচার্য! এবং, তাঁর দ্বিতীয় সখী নিরুদ্দেশ। সন্দেহ করা হচ্ছে সে-ই এই হত্যার সঙ্গে যুক্ত।'

চাণক্য হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

'ওহে, জীবসিদ্ধি। শুরু থেকে বলো পুরো ঘটনা।'

জীবসিদ্ধি আজ সকাল থেকে ঘটা সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করল আচার্যকে। অন্তত সে যেটুকু জানতে পেরেছে, সেটুকু। পুরো সময়টা চন্দ্রগুপ্ত একটিও কথা না বলে শ্বেতপাথরের মেঝের দিকে চেয়ে থাকলেন। এটা তার গুরুর প্রতি তার অসন্তোষ প্রকাশের একটি পদ্ধতি। যদিও চাণক্য সব জেনেশুনেও তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করলেন। তাতে চন্দ্রগুপ্তর অসন্তোষের মাত্রা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেল।

সব শুনে চাণক্য কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন,

'ধনানন্দর কী বক্তব্য এই বিষয়ে?'

জীবসিদ্ধি উত্তর দিল,

'স্বাভাবিকভাবেই সে কন্যার সুরক্ষার কথা ভেবে বিবাহ স্থগিত রাখতে চাইছে। অমাত্য রাক্ষসও তাই বলেছেন। আমি তাদের কোনোভাবে থামিয়েছি। অন্য অতিথিদের কাছে এই সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি এখনও।'

খানিক থেমে জীবসিদ্ধি বলল,

'কিন্তু গুরুদেব, তাদের দাবি অগ্রাহ্য করা যায় না। এই রাজমহলে, এক হত্যাকারী ঘুরছে। হত্যাকারী ধরা না পড়লে ধনানন্দকে বেশিক্ষণ আমরা আটকে রাখতে পারব না। তা ছাড়া রাজকুমারীও বাল্যসখীর মৃত্যুতে শোকাহত। তিনিও এই অবস্থায় বিবাহে রাজি হবেন বলে মনে হয় না।'

চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

'বিবাহলগ্ন কোন সময়ে?'

'রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের শুরুতে।'

'এখন দিনের শেষ প্রহর শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, আমাদের হাতে সময় দুই প্রহরেরও কম। তার পূর্বেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। অন্যথায় এই বিবাহ সম্ভব হবে না।'

এইবার আর থাকতে না পেরে চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

'এই বিবাহ সম্পন্ন করা কি এতটাই প্রয়োজনীয়?'

'হুম। এই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা যদি আপনি এখনও নিজে থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়ে থাকেন, তবে আর আমার বুঝিয়ে বলেও কোনো ফল হবে না। আর তা ছাড়া, এই বিবাহ এই ক্ষণে এসে সম্পন্ন না হলে মৌর্যদের সম্মান শেষমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। যে সম্রাট তার হবু স্ত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না, তার উপর অন্যান্য প্রজা ও করদাতা জনপদের রাজারাও ভরসা রাখবে না।'

পুরো কথা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তর দিকে না তাকিয়েই বললেন। তাঁর দৃষ্টি চলে গিয়েছে সম্রাটের অর্ধভুক্ত আহারের দিকে। কিছুক্ষণ কিছু ভাবলেন চাণক্য। বললেন,

'ওহে, জীবসিদ্ধি।'

'বলুন, আচার্য।'

একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জীবসিদ্ধিকে কিছু বললেন আচার্য। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল জীবসিদ্ধি।

তখনই বাইরের প্রহরী ঘোষণা করল মহামাত্য কৃষ্ণনাথ এসেছেন।

কথা শেষ করে দ্বারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

'কৃষ্ণনাথ মহাশয় বিষয়টি জানেন?'

'এক প্রহরীকে পাঠিয়েছিলাম তাঁকে ঘটনাটা জানাতে। সম্ভবত সেই শুনেই তিনি উপস্থিত হয়েছেন এখানে।'

চাণক্য দ্বার খুলে দিতেই প্রবেশ করলেন কৃষ্ণনাথ। তাঁকে দেখে জীবসিদ্ধির মনে হল যেন সকালের থেকেও পাঁচ বছর বয়স বেড়ে গেছে বৃদ্ধের। চোখ কোটরাগত হয়ে গিয়েছে তাঁর। অসহায় কণ্ঠে চাণক্যকে বললেন,

'আচার্য! আচার্য! এ দায়িত্ব থেকে আমায় মুক্তি দিন! দয়া করুন! আপনি প্রধানমন্ত্রী পদ ত্যাগ করার পর আপনারই অনুরোধে আমি এই পদ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এই গুরুদায়িত্ব আমার পক্ষে যে আর সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। ভাবতে পারেন, হত্যা! এই রাজপ্রাসাদে, আজকের দিনে, হবু মহারানিকে হত্যার প্রচেষ্টা! কী অনর্থ! কী অনর্থ!'

বৃদ্ধর দু-কাঁধে হাত রাখলেন চাণক্য। বললেন,

'আপদকালে ভেঙে পড়ার মানুষ তো আপনি নন, আর্য। এখনই তো আমাদের মস্তিষ্ক শীতল রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ ভাবার আদর্শ সময়। পূর্বে এর চেয়েও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন আমরা হয়েছি, মহামাত্য মহাশয়। তাই নয় কি? এক বর্ষ পূর্বে যখন সারাদেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, তখনও আপনি পাশে ছিলেন আমাদের।'

জীবসিদ্ধি মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ এবং সেই ধাক্কা সামলাতে গিয়েই বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়েছে।

কিছুটা শান্ত হয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালেন মহামাত্য কৃষ্ণনাথ। চাণক্য আবার বললেন,

'আমায় সাহায্য করুন, আর্য কৃষ্ণনাথ। কথা দিচ্ছি এই গুরুদায়িত্ব থেকে আপনাকে আমি মুক্তি দেব। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত, মনে রাখবেন এই মুহূর্তে আপনি মগধের মহামাত্য। এবং, মগধের অন্দরমহলে আঘাত করা হয়েছে।'

'বেশ! বলুন মহামতি, আমায় কী করতে হবে?'

'রাজকুমারীর বিষ মিশ্রিত পানীয়র পাত্র ও আহার ইতিমধ্যে পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছে বলে জীবসিদ্ধি জানিয়েছে। এইবার সেইসঙ্গে সম্রাটের ওই অর্ধভুক্ত আহারও পরীক্ষা করতে হবে।'

কৃষ্ণনাথের মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন,

'কিন্তু কেন, আচার্য? সম্রাটের শরীরে কি বিষক্রিয়া দেখা দিয়েছে?'

'না।'

'তবে? আহার এবং পানীয় তো সম্রাট গ্রহণ করেছেন ইতিমধ্যে। তবে কেন তা পরীক্ষা করব? তা ছাড়া আপনারই নির্দেশে সম্রাটের খাদ্য কোনো খাদ্যপরীক্ষক পরীক্ষা করে না তাঁর আহার গ্রহণের পূর্বে।'

'আপনাকে সব বুঝিয়ে বলতে সময় লাগবে। তবে আপাতত এই কথা কাউকে বলার প্রয়োজন নেই যে, সম্রাট আহার গ্রহণ করেছেন ইতিমধ্যে। আপনি গিয়ে অমাত্য কাত্যায়নকে নিয়ে আসুন। জীবসিদ্ধি ততক্ষণে এই আহার আর পানীয় নিয়ে আপনার অপেক্ষা করবে পরীক্ষা গৃহের সামনে। আমি চাই এই পানীয় এবং আহার, ধনানন্দদের বিশ্বাসযোগ্য কোনো মানুষের উপস্থিতিতে পরীক্ষা করা হোক। তাই কাত্যায়নকে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করুন।'

বিস্ময়ের ভাব পুরোপুরি কাটল না অমাত্য কৃষ্ণনাথের মুখের ভাব থেকে। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকলেন। বেরিয়ে গেলেন রাক্ষসের উদ্দেশে। জীবসিদ্ধিকে ইশারা করতে সেও স্বর্ণ থালা ও পানীয় নিয়ে বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে। তারা বেরিয়ে যেতে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে প্রশ্ন করল,

'আপনি সন্দেহ করছেন আমার আহার বা পানীয়তেও বিষ ছিল?'

মৃদু হেসে চাণক্য বললেন,

'থাকলেও যে তোমার শরীরে তা প্রভাব ফেলবে না, তা তুমি ভালোই জানো।'

কথাটা মিথ্যে নয়। এই গোপন তথ্যটি মুষ্টিমেয় কয়েক জন মাত্র জানে। বাল্যকাল থেকেই চন্দ্রগুপ্তর আহারে নির্দিষ্ট মাত্রায় বিষ মিশিয়ে তাকে নিয়মিত খাইয়ে গিয়েছেন চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তর বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিষের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আজও তার আহারে বিষ মেশানো হয়ে থাকে চাণক্যর নির্দেশে। যে কারণে সম্রাটের আহার কোনো

খাদ্য পরীক্ষকের গ্রহণ না করার কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন চাণক্য। বিষের মাত্রা এখন এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সেই আহার গ্রহণ করলে যেকোনো সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটবে।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত বিষ গ্রহণের ফলে চন্দ্রগুপ্তর শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে, যেকোনো বিষই তার ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকী বিষধর সর্পের দংশনেও তার মৃত্যু হবে না। কারণ চন্দ্রগুপ্তর শরীরে বিষের প্রভাব পড়ে না।

চাণক্য বহু বর্ষ পূর্বেই জানতেন যে, ভবিষ্যতে চন্দ্রগুপ্ত এই আর্যাবর্তর সম্রাটের সিংহাসনে বসলে, তাকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা শত্রুরা করবেই। এবং, গুপ্তহত্যার সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হল বিষপ্রয়োগ। শুধু খাদ্যে নয়, অস্ত্রের ধারালো অংশ বিষাক্ত করে, অথবা বিষধর নাগ ব্যবহার করেও হত্যা করার উদাহরণ আছে। চন্দ্রগুপ্তকে এই সকল সম্ভাবনা থেকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন চাণক্য। যে কারণে, আজকে তার খাদ্যে বা পানীয়ে বিষ থাকলেও তার প্রভাব চন্দ্রগুপ্ত বুঝতে পারবে না। এই গোপন তথ্য স্বয়ং মহামাত্য কৃষ্ণনাথেরও অজানা।

চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন,

‘তাহলে এবার কি করণীয়, আচার্য?’

‘হুম। আপাতত তুমি নিজের বিবাহের প্রস্তুতি নাও। এবং, আমার জন্যে কিছু মধুদ্রব্য আনতে নির্দেশ দাও কাউকে। জানোই তো, ও ছাড়া আমার মস্তিষ্ক সচল হয় না।’

গুরুদেবের এই অত্যধিক মধু প্রীতি তার অজানা নয়। বলল,

‘সে-ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবেন আশা করি?’

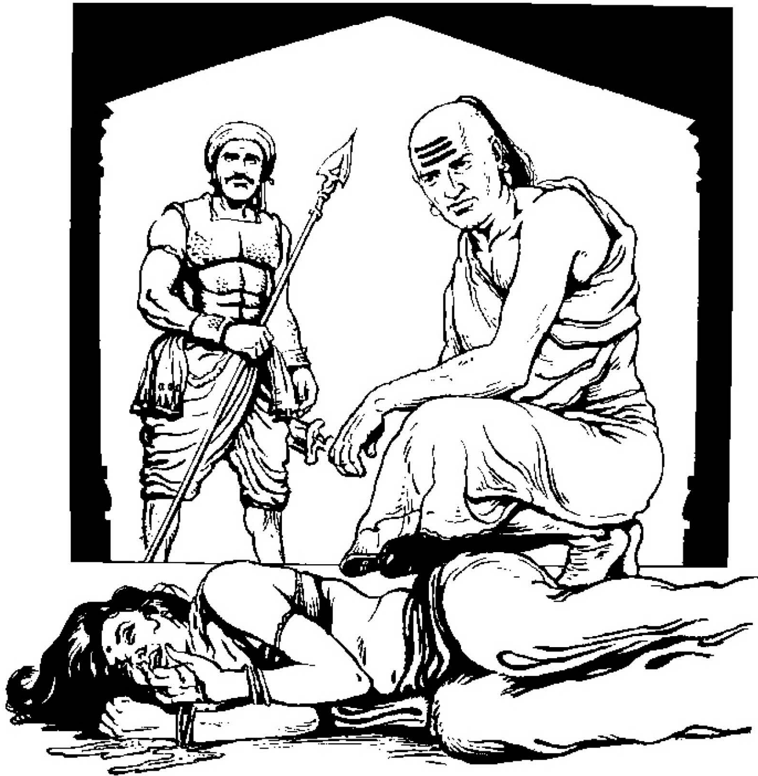
‘হুম। রাজকুমারীরা সম্ভবত দক্ষিণ মহলে উঠেছেন। অতএব সেখানকার একটি কক্ষেই ব্যবস্থা কোরো। সেখানেই আমি যাই। সময় যে বড়োই কম আমার হাতে।’

‘বেশ। তাই হবে। প্রথমেই কাকে দিয়ে শুরু করতে চান?’

‘অবশ্যই পুরো ঘটনার যিনি মূল লক্ষ্য। রাজকুমারী দুর্ধরা!’

৬.

রাজকুমারী দুর্ধরার কক্ষেই মৃতদেহ রাখা রয়েছে এখনও। চাণক্য প্রথমে সেই কক্ষে এসে মৃতদেহ দেখলেন কাছে গিয়ে। আঙুলের নখ ও ঠোঁট নীলাভ। বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর চিহ্ন স্পষ্ট মৃতদেহে।



কক্ষের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন চাণক্য। শয্যার কাছে মেজটি রাখা। তাতে এখন অবশ্য কিছু নেই। কারণ বাকি খাদ্য পরীক্ষা করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে।

চাণক্য বললেন,

'ভোজনের থালা রাখা মেজটি বোধ হয় ওইদিকে রাখা ছিল। তাই ওটা টেনে শয্যার কাছে আনার সময় খানিকটা পানীয় চলকে মেঝেতে পড়েছে দেখেছি। হুম।'

কথাটা স্বগতোক্তি করলেন চাণক্য। কারণ তিনি জানেন যে, তাঁর এই কথাটা প্রতিপাদন করার মতো কেউ এই মুহূর্তে কক্ষে নেই।

কক্ষে মাত্র দু-জন সৈনিক মৃতদেহের পাহারা দিচ্ছে। রাজকুমারীকে অন্য একটি কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন চাণক্য। এক সৈনিক তাঁকে রাজকুমারী দুর্ধরার বর্তমান কক্ষের দ্বার অবধি পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। দ্বাররক্ষী চাণক্যর আগমন ঘোষণা করতে ভিতর থেকে রাজকুমারীর কণ্ঠে দ্বার খুলে দেওয়ার আদেশ ভেসে এল।

শয্যার উপর বসে আছেন রাজকুমারী দুর্ধরা। চোখে এখনও আর্দ্রতা থাকলেও মুখে তাঁর দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। চাণক্য তাঁকে শক্ত থাকতে দেখে মনে মনে প্রশংসা করলেন।

দু-হাত জোড় করে প্রণাম সেরে চাণক্যকে একটি আসনের দিকে ইঙ্গিত করলেন দুর্ধরা। আসন গ্রহণ করে চাণক্য বললেন,

'আপনাকে এই অসুখকর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, রাজকুমারী।'

'এর চেয়েও অসুখকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমায় কয়েক বর্ষ পূর্বেই যেতে হয়েছে, আচার্য। সে নিয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

কথার মধ্যে চাণক্যর প্রতি শ্লেষ গোপন করার কোনো প্রচেষ্টা করলেন না দুর্ধরা। চাণক্য তাঁর ব্যঙ্গোক্তি গায়ে না মেখে প্রশ্ন করলেন,

'ক্ষমা করবেন, রাজকুমারী। কিন্তু আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতেই হবে আমায়।'

'বলুন।'

বাইরে থেকে দ্বাররক্ষী পুনরায় জীবসিদ্ধির আগমনের ঘোষণা করল। চাণক্য অনুমতি দিতে কক্ষে প্রবেশ করল জীবসিদ্ধি। তার চোখে তার স্বভাবজাত সতর্ক দৃষ্টি। সে চাণক্য এবং তারপর রাজকুমারীকে অভিবাদন জানাল।

তার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন চাণক্য,

'যে কার্য বলেছিলাম তা হয়েছে?'

মুখে উত্তর না দিয়ে উপর-নীচে 'হ্যাঁ' সূচক মৃদু ঘাড় নাড়ল জীবসিদ্ধি। চাণক্যই তাকে অন্য একটি আসনে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

পুনরায় দুর্ধরার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন,

'রাজকুমারী দয়া করে আরও একবার আমাদের বর্ণনা করুন কী ঘটেছিল।'

'আমার সঙ্গে কক্ষে আমার দুই সখী ছিল। মধুবন ও কৃষ্ণকলি। আমাদের আহার্য ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল দেখে আমি তাদের আহার শুরু করতে বলি। কিন্তু নিজের পানপাত্রে সোমের পরিবর্তে সাধারণ সুরা দেখে আমি কৃষ্ণকলিকে পাঠাই আমার জন্যে অন্য পানীয়র ব্যবস্থা করতে। কারণ আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম। মধুবন নিজের পানপাত্র খালি করে

ফেলেছে দেখে আমি নিজের পানীয় মধুবনের পাত্রে ঢেলে দিই। আর সেটা পান করতেই...।’

থেমে যান রাজকুমারী।

চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

‘যে দাসী আপনার কক্ষে আহার্য সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তাকে লক্ষ্য করেছিলেন?’

‘না। মনে করতে পারছি না তাকে।’

‘হুম। ঠিক আছে। তাকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে না। আপনি আমায় বলুন, আপনার এই দুই সখীদের আপনি কত বছর চেনেন?’

‘বাল্যসখী দু-জনেই।’

‘অথচ তাদেরই মধ্যে একজন এই মুহূর্তে নিখোঁজ। এর কি কোনো ব্যাখ্যা আপনার কাছে আছে? আপনার কি মনে হয় সে-ই আপনার পানীয়ে বিষ মিশিয়েছিল?’

‘না! কৃষ্ণকলি নিজে থেকে এই কাজ করতে পারে না।’

‘বেশ। তার মানে আপনি সন্দেহ করছেন যে, তাকে কেউ বা কারা লোভ বা ভয় দেখিয়ে এই কাজ করিয়েছে। তাই তো?’

উত্তর দিলেন না দুর্ধরা।

চাণক্য পরবর্তী প্রশ্নে চলে গেলেন,

‘আপনি কি কৃষ্ণকলিকেই নিজের জন্যে পানীয় নিয়ে আসার আদেশ দিয়েছিলেন?’

এই প্রশ্নে খানিকটা ভাবলেন রাজকুমারী। ঘাড় নেড়ে বললেন,

‘আজ্ঞে না। আপনার প্রশ্নে এখন আমার স্মরণে আসছে, আমি মধুবনকেই বলেছিলাম আমার পানীয় বদলে দিতে। কিন্তু কৃষ্ণকলি নিজেই যেতে চাইল।’

‘হুম। অর্থাৎ, সে পলায়ন করার উদ্দেশ্য নিয়েই কক্ষ ত্যাগ করেছিল।’

নিজের বুকের উপর থাকা লম্বা কেশশিখায় আলতোভাবে হস্ত চালনা করে চাণক্য পুনরায় প্রশ্ন করলেন,

‘রাজকুমারী। একবার ভেবে বলুন তো, আপনার সখী কৃষ্ণকলির আচরণে কি কোনোরকম অসংগতি লক্ষ করেছিলেন আজকে?’

‘হ্যাঁ। করেছিলাম। আমি এবং মধুবন দু-জনই লক্ষ্য করেছিলাম যে কৃষ্ণকলি আজ অন্যমনস্ক ছিল। একধরনের অস্থিরতা ছিল তার চিত্তে। তাকে সেই প্রশ্ন আমি করেওছিলাম একবার যে, তার চিত্ত আজ চঞ্চল কেন। কিন্তু সে উত্তর দেয়নি।’

'হুম। ক্ষমা করবেন রাজকুমারী আপনার সখী কৃষ্ণকলির প্রতি কিন্তু আমার সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। তার আচরণ সবদিক থেকেই ইঙ্গিত করছে যে, সে দোষী। আশা করছি এই প্রহর শেষ হওয়ার পূর্বেই তাকে খুঁজে পেয়ে যাবে সৈনিকরা।'

রাজকুমারী কোনো কথা না বলে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। জীবসিদ্ধি বুঝতে পারল চাণক্যর কথায় রাজকুমারী একমত নন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে নিজের সখীর পক্ষ নিয়ে বলার মতো কিছু পাচ্ছেন না তিনি।

চাণক্য পুনরায় প্রশ্ন করলেন,

'কৃষ্ণকলির এই অন্যমনস্ক ভাব কি আজ প্রভাতের সময় থেকেই ছিল? নাকি, বিশেষ কোনো ঘটনার পর তার মধ্যে এই অস্থিরতা দেখা দেয়?'

এইবার একটু ভেবে উত্তর দিলেন রাজকুমারী,

'না। এখানে আসার আগে অবধি সে স্বাভাবিক ছিল। আমার কক্ষ থেকে অতিথিরা বিদায় নেওয়ার পর থেকেই তার মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পেতে শুরু করে।'

ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছে চাণক্যর।

'অতিথি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'কারা?'

'আমার পিতা, আর্য কাত্যায়ন এবং পৌরবরাজ মলয়কেতু। তিনজন এসেছিলেন একে একে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।'

'এরা আপনার কক্ষে দাসী আহার্য রেখে যাওয়ার আগে এসেছিল, নাকি, পরে?'

উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যান রাজকুমারী দুর্ধরা। তিনি বুদ্ধিমতি, অতএব এই প্রশ্নের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে তাঁর। নীচুস্বরে উত্তর দিলেন,

'প্রত্যেকেই পরে এসেছিলেন।'

'হুম। অর্থাৎ, তাঁরা যখন এই কক্ষে ছিলেন, তখন মেজে আপনার খাদ্য ও পানীয় রাখা ছিল। তাই নয় কি?'

কণ্ঠ কিছুটা উপরে উঠিয়ে দুর্ধরা বললেন,

'আপনি কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন, আচার্য চাণক্য? নিজেদের সুরক্ষাব্যবস্থার গাফিলতির ভার এড়াতে কি এইবার আপনি আমারই আপনজনদের আমাকে হত্যা করার প্রচেষ্টার দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে চাইছেন?'

শান্ত ভঙ্গিতে চাণক্য বললেন,

‘অবশ্যই না। আমি শুধু তথ্যগুলো বলছি। কাউকে দোষী বা নির্দোষ বলার সময় এখনও আসন্ন নয়। কিন্তু রাজকুমারী, আপনার পিতা ও কাত্যায়ন মহাশয় যে আপনার আপনজন তা আমি মানছি। কিন্তু পৌরবরাজ মলয়কেতুর আপনার সঙ্গে কী প্রয়োজন থাকতে পারে তা ভেবে পাচ্ছি না, রাজকুমারী।’

কিছুটা বিব্রত ভাব দেখা দিল দুর্ধরার মুখে। বললেন,

‘পৌরবরাজ আমার সঙ্গে...’

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে চাণক্য বললেন,

‘না, না। আপনি প্রথমজনের থেকেই শুরু করুন।’

দুর্ধরা ইতস্তত করছেন দেখে চাণক্য বললেন,

‘আপনার নিকটজনের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত আলোচনার কথা আমি সাধারণ পরিস্থিতিতে জানতে চাইতাম না কখনোই। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। তাই আপনাকে আমি অনুরোধ করব দয়া করে আমায় সবটা বলবেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, এই প্রসঙ্গ আমাদের তিনজন ব্যতীত কেউ জানতে পারবে না। কী হে, জীবসিদ্ধি?’

জীবসিদ্ধি আচার্যর সমর্থনে বলল,

‘আপনি চাইলে আমি এই কক্ষ ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু আমার অনুরোধ আচার্যর কাছে তথ্য গোপন করবেন না। তাতে আপনারই লাভ হবে, রাজকুমারী।’

রাজকুমারী জীবসিদ্ধির উদ্দেশে বললেন,

‘আপনার কক্ষ ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই।’

উঠে দাঁড়িয়েছিল জীবসিদ্ধি। দুর্ধরার এই কথায় তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পুনরায় জীবসিদ্ধি আসন গ্রহণ করল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুর্ধরা বললেন,

‘বেশ। আমি আজকের সব আলোচনার কথাই খুলে বলছি। কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে যে, আপনি তদন্তের সময়ে আপনার ও পিতার মধ্যকার শত্রুতা দূরে রেখে নিরপেক্ষভাবে বিচার করবেন।’

চাণক্য নিজের ডান হস্তের তর্জনী তুলে উপরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘সত্যের কোনো বিকল্প নেই। পক্ষপাতদুষ্ট সত্য মিথ্যার চেয়েও বিপজ্জনক। প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত আবেগকে সদাই দূরে রাখি। চণক পুত্র বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য আপনাকে কথা দিচ্ছে, আমি আপনার সম্মুখে প্রকৃত অপরাধীকে হাজির করবই! সে যে-ই হোক না কেন নিজের দোষের বিচার সে পাবেই!’

৭.

‘ভৃত্য আহারাদি সাজিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর তিনজন এসেছিলেন আমার কক্ষে। কেউই বেশিক্ষণ ছিলেন না যদিও। প্রথম আসেন আর্য কাত্যায়ন। কিছুক্ষণ বসে ছিলেন আমার কক্ষে।’

রাজকুমারী দুর্ধরাকে বাধা দিয়ে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

‘ক্ষমা করবেন। বাধা দিচ্ছি আপনাকে। আপনার কক্ষ থেকেই আমি এখানে এসেছি। পানীয়-আহার রাখা মেজটি আপনার পালঙ্ক থেকে কিছুটা দূরে ছিল সম্ভবত। এবং, ঠিক তার পাশেই একটি আসন রাখা ছিল। রাক্ষ... (মাঝপথেই কথা থামিয়ে) মানে... কাত্যায়ন মহাশয় কি তাতেই আসন গ্রহণ করেছিলেন?’

এই গম্ভীর পরিস্থিতিতেও হাসি পেল জীবসিদ্ধির। কাত্যায়নকে সাধারণত তারাও অন্য সকলের মতোই ‘অমাত্য রাক্ষস’ বলেই সম্বোধন করে। আচার্য মুখ ফুটে সেই সম্বোধন করে ফেলেছিলেন একটু হলেই দুর্ধরার সামনেই। দুর্ধরা খানিকটা বিরক্তির সঙ্গেই বললেন,

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ। শুধু তিনি একা নন, বাকি দু-জনও একই আসনে, একই স্থানে বসেছিলেন।’

‘হুম। বেশ। কী প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিল সেই বিষয়ে যদি আলোকপাত করেন, রাজকুমারী।’

রাজকুমারী কিছুটা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন,

‘আর্য কাত্যায়ন আমাকে পুনরায় একবার আমার নির্ণয় পুনর্বিবেচনা করতে বললেন। বললেন, এখনও সময় আছে। আমি যদি আপত্তি করি এই বিবাহে, তবে তিনি নিজে দেখবেন যেন আমার প্রতি কোনো অন্যায় না হয়। আমি তাঁর কন্যাসমা। আমি যেন পরিবারের কথা ভেবে এই বিবাহ করতে বাধ্য না হই। আমার কোনোরকম পীড়া তিনি সহ্য করতে পারবেন না।’

চাণক্যর ঠোঁটের কোণে একটি মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখল জীবসিদ্ধি। রাজকুমারী লক্ষ্য করার পূর্বেই তা মিলিয়ে গেল। রাজকুমারী বললেন,

‘আমি তাঁকে বলি যে, এই বিবাহ আমি নিজের মতে করছি। কোনোরকম চাপে পড়ে নয়। তিনি যেন আমায় নিয়ে চিন্তা না করেন। তিনি আরও কয়েক বার একই কথা

আমায় বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, আমি শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিরস্ত করে বিদায় জানাই।'

'বেশ, বেশ। এই পুরো সময়ে আপনি কী করছিলেন? এবং, আপনার দুই সখী কোথায় ছিল?'

'তারা কক্ষেই ছিল। আমি তখন সবে স্নান সম্পন্ন করে, পালঙ্কে বসে ছিলাম। আমার দুই সখী আমার ভেজা কেশ শুকিয়ে দিচ্ছিল ও পদ ধৌত করে দিচ্ছিল।'

'আপনি নিশ্চয়ই অতিথির দিকে মুখ করে ছিলেন?'

'সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?'

'কোন সখী আপনার পদ ধৌত করছিল এবং কোনজন কেশ শুকাচ্ছিল, তা কি আপনি স্মরণ করতে পারেন?'

'অবশ্যই পারি। কৃষ্ণকলি আমার সম্মুখে মেঝেতে বসে পদ গোলাপ জলের পাত্রে ধৌত করছিল এবং মধুবন আমারই পালঙ্কে বসে ধুনি জ্বেলে তার সুগন্ধি ধোঁয়া দিয়ে আমার কেশ শুকিয়ে দিচ্ছিল।'

জীবসিদ্ধির দৃষ্টি রাজকুমারীর পরিপাটি করে বাঁধা এবং অলংকার দিয়ে সাজানো, সুদীর্ঘ কেশরাশির দিকে চলে গেল স্বাভাবিকভাবেই।

চাণক্য কিছুক্ষণ ছাদের দিকে চেয়ে ভাবলেন। সম্ভবত রাজকুমারীর বর্ণনা করা কক্ষের তৎকালীন দৃশ্য মানসপটে অনুমান করার চেষ্টা করছেন। রাজকুমারীও কয়েক মুহূর্ত কথা না বলে তাঁকে ভাবার সময় দিলেন। যতক্ষণ না আচার্য নিজেই তাকে কথা বলতে অনুরোধ করলেন।

'বেশ। তারপর বলুন, রাজকুমারী।'

'এরপর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন আমার পিতা।'

চুপ করে যান রাজকুমারী দুর্ধরা। জীবসিদ্ধির বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পরবর্তী কথোপকথন চাণক্যকে বলতে দ্বিধাবোধ করছেন দুর্ধরা।

রাজকুমারীর দ্বিধাবোধের কারণ চাণক্য নিজেও অনুমান করতে পারছেন। আর তাই তিনি বললেন,

'রাজকুমারী, আমি পুনরায় আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই মুহূর্তে আমি একজন নিরপেক্ষ সত্যসন্ধানী মাত্র। আপনার কথা আমি গোপন রাখব এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ কোনোভাবেই আমার যুক্তিনির্ভর চিন্তাসূত্রকে মেঘাচ্ছন্ন করবে না। কিন্তু সত্য অনুধাবন করতে গেলে আগে সম্পূর্ণ সত্য আমার জানা প্রয়োজন। তাই অনুরোধ করব, আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে সব কথা বলতে পারেন।'

চাণক্যর চোখে চোখ রেখে রাজকুমারী দুর্ধরা কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকলেন। সম্ভবত তিনি বুঝে নিতে চাইছেন যে, তাঁর সামনে বসা ব্রাহ্মণটিকে বিশ্বাস করা যায় কি না। তারপর বললেন,

'পিতা প্রথমে এসে জানতে চাইলেন আমি কেমন অনুভব করছি। আমি সত্যই মন থেকে এই বিবাহ মেনে নিয়েছি কি না। আমি তাঁকে বললাম তাঁর এই প্রশ্ন করার কোনো অধিকার নেই। কারণ আজকে আমাকে এই পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত করার জন্যে তিনিও সমানভাবে দায়ী! তিনি যদি আমোদ-আসক্তিতে দীর্ঘকাল ডুবে না থেকে মহামাত্যর কথায় কর্ণপাত করতেন, তবে আজকের এই দিন দেখতে হত না।'

জীবসিদ্ধির ভ্রূ ললাটের আর একটু কাছে উঠেছে। রাজকুমারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সম্মুখে কটু সত্য বলার ক্ষমতা তাকে অবাক করছে। চাণক্য অবাক হয়েছেন কি না সেটা তাঁর মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল না। বরং তাঁর উজ্জ্বল চোখে শংসার দৃষ্টি ফুটেছে।

চাণক্য বললেন,

'হুম। তারপর?'

'পিতা বললেন, তিনি নিজের এবং আমার এই অপমানের কথা ভুলবেন না। এর প্রতিশোধ নেবেন তিনি। মগধের সিংহাসন তিনি পুনর্দখল করবেন একদিন ঠিকই। তিনি এইটুকু বলে নিজেই আমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান।'

'হুম।'

'আমি পুনরায় আশা করব আমি যা যা বললাম তা এই কক্ষের বাইরে যাবে না।'

'নিশ্চয়ই। আচ্ছা, এই বাক্যালাপের সময়ে আপনার এবং আপনার দুই সখীর অবস্থান কী ছিল?'

একটু ভেবে রাজকুমারী উত্তর দিলেন,

'আমি নিজের স্থানেই বসে ছিলাম। পালঙ্কে। তবে এই সময়ে মধুবন আমার সম্মুখে বসে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে আমার হাত ও পায়ের চর্চা করছিল। কৃষ্ণকলি আমার পিছনে বসে আমার কেশে সুগন্ধি তেল দিয়ে দিচ্ছিল।'

আরও একবার চাণক্য কক্ষে সকলের অবস্থানটা অনুমান করে নিলেন নিজের মনে। এরপর বললেন,

'বেশ। সকল কথা অকপটে আমায় বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, রাজকুমারী। এরপর বলুন, তৃতীয় অতিথি কেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল?'

রাজকুমারী দুর্ধরার পাশেই মেজের উপর এক পাত্র সোম রাখা আছে। এইবার অবশ্যই এটি পরীক্ষা করে রাখা হয়েছে। সেটি তুলে দু-চুমুক সোম পান করলেন রাজকুমারী। অনেকক্ষণ কথা বলায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে তাঁর।

পান করে, পাত্র নামিয়ে রেখে বললেন,

'তৃতীয়জন হলেন রাজকুমার মলয়কেতু।'

'হুম। আপনার পিতা ও অমাত্য কাত্যায়নের আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। তবে এই পৌরবরাজের পুত্র মলয়কেতুর আপনার সঙ্গে কী প্রয়োজন তা আমিও অনুমান করতে পারছি না, রাজকুমারী।'

'আপনার জানার কথা নয়, তবে কয়েক বর্ষ পূর্বে রাজকুমার মলয়কেতু আমায় বিবাহ প্রস্তাব দিয়েছিল।'

'তাই নাকি?'

চাণক্য জীবসিদ্ধির দিকে চাইলেন। এই তথ্য জীবসিদ্ধিরও অবগত নয়। তার গূঢ়পুরুষরা রাজকুমারী দুর্ধরার সম্বন্ধে পূর্বে অনেক সংবাদ জোগাড় করেছিল বটে। কিন্তু এই তথ্যটি তাদের অধরা ছিল।

রাজকুমারী মৃদু উপর-নীচে মাথা নাড়িয়ে বললেন,

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমাদের নির্বাসিত হওয়ার এক বর্ষ পরেই এই প্রস্তাব আসে মলয়কেতুর তরফ থেকে। তিনি পূর্বে আমায় দেখেছিলেন সম্ভবত। আমার যদিও তাঁকে স্মরণে ছিল না সেইসময়ে। তিনি নিজেই আসেন আমার পিতার কাছে, বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে। আমি প্রত্যাখ্যান করি।'

'কেন?'

চাণক্য রাজকুমারীর চোখে চোখ রেখে প্রশ্নটা করলেন। দুর্ধরা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

'তাঁকে আমার ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ বলে মনে হয়েছিল প্রথম দর্শনেই। তা ছাড়া, আমার এইটুকু অনুধাবন করার মতো রাজনীতিজ্ঞান আছে রাজকুমার মলয়কেতু নিজের রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব দিয়েছেন। চন্দ্রগুপ্ত... ক্ষমা করবেন, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে মৈত্রী পূর্বে পৌরবরাজ নন্দদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন একথা সকলের জ্ঞাত। কিন্তু তারপর মগধের সম্রাট হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। মলয়কেতু ফিরে গেলেন তাঁর পার্বত্য রাজ্যে। অতএব, স্বাভাবিকভাবেই নিজের অবস্থান নিয়ে বিশেষ প্রসন্ন নন তিনি।'

চাণক্য বললেন,

‘হুম। আমাদের সাহায্যের পরিবর্তে, অর্ধেক আর্যাবর্তর দাবি করেছিলেন রাজকুমার মলয়কেতু।’

কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ফুটিয়ে রাজকুমারী বললেন,

‘তাই নাকি? তারপর? আপনিও নিশ্চয়ই তাঁকে সেই আশ্বাস দিয়েছিলেন? কিন্তু তারপর তাঁর সাহায্যে আমাদের উৎখাত করার পর ছলে-বলে তাঁকেও ফেরত পাঠালেন তাঁর রাজ্যে।’

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে চাণক্যর। বলেন,

‘আমি তাঁকে যা আশ্বাস দিয়েছিলাম, তা তিনি পেয়েছেন। আমি যা বলি, তার দায় আমার। কিন্তু অন্যে সেটা শুনে কী বুঝল, তার দায় আমার নয়!’

রাজকুমারী দুর্ধরার ঠোঁটের কোণেও হাসি দেখা গেল। বললেন, -

‘আপনি অত্যন্ত চালাক, আচার্য।’

আচার্য নিজের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসেন। জীবসিদ্ধি বুঝতে পারছে তার গুরু নিজের প্রশংসা শুনে তৃপ্ত। যদিও তার বহিঃপ্রকাশ করলেন না। পরের প্রশ্নে চলে গেলেন চাণক্য,

‘কিন্তু আজ আপনার কক্ষে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কী ছিল?’

‘আমি তাঁকে সেইসময়ে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি অপমানিত হয়েছিলেন। তাই আজ যেহেতু পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমাকে বিবাহসূত্রে বাঁধা পড়তে হচ্ছে আমার পিতার শত্রুর সঙ্গে, সেই সুযোগে আমায় নিয়ে বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন তিনি। আমায় বললেন যে, সেইদিন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে আমি যে কত বড়ো ভুল করেছি সেটা আজ আমি উপলব্ধি করতে পারছি কি না। বললেন যে, সেইদিন অন্তত তাঁকে বিবাহের বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশের জায়গা ছিল, যেটা আজ আমার নেই।’

‘হুম! আপনি তাকে কী বললেন?’

‘আমি তাঁকে বললাম, মগধের ভাবী মহারানির সাক্ষাৎ পাওয়ার বাসনা রাখলে, ভবিষ্যতে যেন তিনি পূর্বে অনুমতি নিয়ে আসেন।’

এইবার সশব্দে হেসে উঠলেন চাণক্য। জীবসিদ্ধির দিকে চেয়ে বললেন,

‘ওহে, জীবসিদ্ধি। শোনো, শোনো! রাজকুমারী মাত্র একটি বাক্যে কেমন নিজের এবং মলয়কেতুর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর কাছে!’

জীবসিদ্ধি মুখে কিছু না বললেও, সেও দুর্ধরার রাজোচিত উত্তর শুনে মুগ্ধ হয়েছে। জীবসিদ্ধি শুধু একবার রাজকুমারীর উদ্দেশে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল।

হাসি থামিয়ে চাণক্য প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী প্রশ্ন কী হবে তা অনুমান করেই রাজকুমারী উত্তর দিলেন,

‘এই সময়ে আমার এবং আমার দুই সখীর অবস্থান পূর্ববৎই ছিল। অর্থাৎ, মধুবন আমার সম্মুখে বসে হাত ও পায়ের পরিচর্যা করছিল, এবং কৃষ্ণ আমার পিছনে চুল বেঁধে দিচ্ছিল।’

পরবর্তী কয়েক মুহূর্ত ভাবনায় ডুবে গেলেন চাণক্য। আনমনা ভঙ্গিতে নিজের কেশশিখায় হস্ত চালনা করলেন বার কয়েক। তারপর প্রশ্ন করলেন,

‘রাজকুমারী, আপনি কি এই তিন অতিথিদের অথবা আপনার সখীদের মধ্যে কাউকে আপনার পানীয়ে কিছু মিশ্রণ করতে দেখেছেন?’

‘না।’

‘তাদের কি সে-সুযোগ ছিল? অর্থাৎ, এটা কি সম্ভব যে, আপনার চোখের আড়ালে এদের মধ্যে কেউ আপনার পানীয়ে বিষ মিশিয়েছে?’

ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলেন দুর্ধরা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

‘সেভাবে ভাবতে গেলে সে-সুযোগ প্রত্যেকেরই ছিল। আমি কখনোই কারুর দিকে সর্বক্ষণ চেয়ে ছিলাম না।’

‘আপাতত আপনাকে আমার শেষ প্রশ্ন। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আপনার সখী কৃষ্ণকলি বা আপনার তিন অতিথিদের মধ্যে কেউ আপনাকে হত্যা করতে চায়?’

‘না! আমি বিশ্বাস করি না।’

‘এমনকী মলয়কেতুও না? হয়তো অপমানের উত্তর দিতে এসে পুনর্বার অপমানিত হয়ে তিনি আপনার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার পানীয়ে বিষ মিশিয়ে দিয়েছেন।’

নির্দ্বিধায় রাজকুমারী উত্তর দিলেন,

‘না! তার সেই সাহস নেই। সেই সাহস থাকলে তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করতাম না।’

চাণক্যর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা একমুহূর্তের জন্যে ফুটে মিলিয়ে গেল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তিনি বললেন,

‘হুম। বেশ। আমরা আপাতত বিদায় নেব। অন্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। সব কথা নির্দ্বিধায় আমায় বলার জন্যে আরও একবার আপনাকে ধন্যবাদ, রাজকুমারী। এসো হে, জীবসিদ্ধি।’

চাণক্য বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে। তাঁর দেখাদেখি জীবসিদ্ধিও উঠে দাঁড়িয়েছে। তবে বেরোনোর আগে জীবসিদ্ধি দ্বারের চৌকাঠে থেমে গেল। পেছন ফিরে বলল,

‘রাজকুমারী দুর্ধরা।’

রাজকুমারী মুখ তুলে তার দিকে সপ্রশ্ন নেত্রে চাইলেন। জীবসিদ্ধি বলল,

‘আমি আপনাকে একটি আশ্বাস দিতে পারি। মগধে কেউ আপনার অসম্মান ও মর্যাদাহানি করবে না। সম্রাটের গুরুভ্রাতা এবং বাল্যমিত্র হিসাবে এইটুকু আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি। তিনি একজন আদর্শ সম্রাট এবং তার চেয়েও মহৎ একজন মনুষ্য। নারীর প্রাপ্য সম্মান তিনি দিতে জানেন।’

দুর্ধরার মন কিছুটা হলেও হালকা হল সম্ভবত। বললেন,

‘ধন্যবাদ।’

রাজকুমারীকে আরও একবার অভিবাদন জানিয়ে কক্ষ ত্যাগ করল জীবসিদ্ধি।

৮.

চওড়া শ্বেতপাথরের বারান্দা ধরে পাশাপাশি ধীরপায়ে হাঁটছেন চাণক্য ও জীবসিদ্ধি। চাণক্য অন্যমনস্কভাবে চলছেন। চিন্তায় এতটাই ডুবে আছেন যে, বারান্দার ধার ঘেঁষে দাঁড়ানো প্রহরীদের অভিবাদনের প্রতি-অভিবাদনও জানাচ্ছেন না। সাধারণত তিনি এই সৌজন্য দেখিয়ে থাকেন সকলকে। জীবসিদ্ধি যদিও প্রতি-অভিবাদনে প্রত্যেকের উদ্দেশে একবার করে মৃদু ঘাড় নাড়াচ্ছে উপর-নীচ। জীবসিদ্ধির মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগছে। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশ্ন করে গুরুদেবের চিন্তাসূত্রে ছেদ ফেলা উচিত হবে না জেনে চুপ করেই চলেছে চাণক্যর পাশে পাশে।

একটি কক্ষে চাণক্যর জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েকটি আসন মুখোমুখি রাখা হয়েছে। জীবসিদ্ধি পথ দেখিয়ে চাণক্যকে সেই কক্ষের সামনে নিয়ে এল। যদিও তিনি এখনও চিন্তায় ডুবে আছেন।

কক্ষে ঢুকতেই দু-জন ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানাল দুই সৈনিক। তাঁদেরই অপেক্ষায় কয়েক জন সেখানে আগে থেকেই বসে আছে। দু-জন সৈনিকের মধ্যে আরও দু-জন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। একজন জীবসিদ্ধির পরিচিত। ইনি রন্ধন বিশেষজ্ঞ জীমূতবাহন। দ্বিতীয়জন অপরিচিত, ভৃত্য স্থানীয় কেউ।

তাদের দেখেই জীমূতবাহন বলে উঠলেন,

‘আর্য! আমাদের কাজে কি কোনো ত্রুটি হয়েছে? এই দুই সৈনিক আমাদের হঠাৎ তলব করে আনল।’

চাণক্যর চিন্তা কেটে গিয়েছে। সামনে তাকিয়ে দু-জন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে, ঘাড় ঘুরিয়ে জীবসিদ্ধির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

জীবসিদ্ধি পরিচয় করিয়ে দিল,

'ইনি জীমূতবাহন মহাশয়। আজকের পাকশালের সমস্ত দায়িত্ব ওঁর। আর এ...'

উত্তর পাশের সৈনিকটি দিল,

'সম্রাট আদেশ দিয়েছিল, রাজকুমারীর কক্ষে যে ভৃত্য খাদ্য ও পানীয় দিয়ে গিয়েছিল তাকে আপনার সামনে হাজির করতে। এই সেই ভৃত্য, মান্যবর।'

'ওহ্!'

ভৃত্যটি ভয়ে প্রায় কাঁপছে। যদিও তার জানার কথা নয় তাকে এখানে আনার প্রকৃত কারণ। তবে সম্ভবত তার আশঙ্কা, কোনো কারণে রাজকুমারী ক্ষুণ্ন হয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজার তলব দাসদের পক্ষে সুখকর বার্তা নিয়ে আসে না।

সৈনিক জীমূতবাহনকে কিছু একটা ইশারা করল। জীমূতবাহন একবারে না বুঝলেও, পরক্ষণেই বুঝলেন। বললেন,

'আচার্য চাণক্য। সম্রাটের আদেশে আপনার জন্যে এই বিশেষ মধু-পানীয় এনেছি আমি।'

চাণক্যর মুখে হাসি ফুটেছে। একটি আসন গ্রহণ করে বললেন,

'আহা! অতি উত্তম! আমার মস্তিষ্ক সজাগ করার প্রয়োজন বড়ো।'

মস্তিষ্কের সঙ্গে তার আনা মধু-পানীয়ের কী সম্পর্ক, জীমূতবাহন তা অনুধাবন করতে না পারলেও, সে প্রশ্ন না করে একটি বড়ো ঢাকা দেওয়া পানপাত্র এগিয়ে দিল চাণক্যর দিকে।

চাণক্য সেটি হাতে নিয়ে এক চুমুক দিলেন। চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত স্বাদ নিলেন। এই কয়েক মুহূর্ত জীমূতবাহন উদগ্রীব, উত্তেজিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন চাণক্যর দিকে।

চোখ খুলে চাণক্য বলে উঠলেন,

'সাধু! সাধু! এমন চমৎকার পানীয় আমি পূর্বে কোনোদিন পান করেছি বলে স্মরণ করতে পারি না! এ তো দেবপেয়!'

হাতজোড় করে গদগদ ভঙ্গিতে জীমূতবাহন বললেন,

'আমি জানতাম! আমি জানতাম এই পানীয় আপনার ভালো লাগবেই! এই পানীয় আপনার মতো মহামতি ব্রাহ্মণদের জন্যে উৎকৃষ্ট পানীয়। এই পানীয় বানানো হয়...'

পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকেই তাকে বাধা দিয়ে জীবসিদ্ধি বলল,

'আপনি আসন গ্রহণ করুন। আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন আচার্য।'

চাণক্য বলল,

‘ওহে, জীবসিদ্ধি। প্রশ্ন কয়েক মুহূর্ত পরে করলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। কিন্তু জীমূতবাহন মহাশয়কে বলতে দাও। এই পানীয় একটি শিল্পসম আর এর কারিগর স্বয়ং শিল্পী! বলুন মহাশয়, কী আছে এই পানীয়ে?’

উত্তেজনায় ফেটে পড়বেন মনে হল জীমূতবাহন। বললেন,

‘পূর্ণিমার রাত্রে ধান ভেঙে লাল চাল বের করা হয়। সেই রাত্রেই তা গুঁড়ো করে মণ্ডাকারে রাখা হয়। এই চালের মণ্ডে দুধ ও গুড় মিশিয়ে ফোটানো হয় যতক্ষণ না তা ঘন গাঢ় হয়ে আসে। এক প্রহর এটিকে তাম্রপাত্রে রাখা হয় যাতে দুধে তাম্রের গুণ ও ঘ্রাণ মিশে যায়। এরপর এতে মিশ্রিত করা হয় পবিত্র পিপুল বৃক্ষের শেকড়ের চূর্ণ। এই চূর্ণ বানানোরও নিয়ম আছে, আচার্য! এই চূর্ণ পূর্বেই বানিয়ে আগে চাররাত্রি চাঁদের আলোয় রেখে দিতে হয়। চন্দ্রমার রশ্মি যেভাবে সাগরের জলে প্রভাব ফেলে, সেভাবেই তা আমাদের শরীরে ও খাদ্যের স্বাদ এবং গুণে প্রভাব ফেলে।’

‘সাধু! এ পানীয় স্বর্গীয়।’

আরও একচুমুক পান করলেন চাণক্য। তাঁর এই প্রশংসা, সামনের ব্যক্তিটির বিশ্বাস অর্জনের কৌশলও হতে পারে। আবার বাস্তবেই প্রশংসা হতে পারে। চাণক্যর এই মাত্রাতিরিক্ত মধু-দ্রব্য প্রীতি তাঁর নিকটজনমাত্রেই জানা সকলের। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন জিহ্বার সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ আছে। জিভে মিষ্টস্বাদের স্পর্শে তাঁর মস্তিষ্কর কোষিকা নাকি সজাগ হয়ে ওঠে। যদিও এমন নিদান স্বয়ং মহামতি চড়কও দিয়েছেন বলে জানা নেই।

চাণক্য এইবার দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে মনোযোগ দিলেন,

‘আর তোমার নাম?’

‘আজ্ঞে, ভুবন।’

‘তুমি আজ রাজকুমারী দুর্ধরার কক্ষে আহার্য নিয়ে গিয়েছিলে?’

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ।’

‘তুমি নিজে কি তার পানীয় বা খাদ্যে কিছু মিশ্রিত করেছিলে?’

‘আজ্ঞে?’

‘করেছিলে কি?’

‘আজ্ঞে, না! আমি কেন…’

‘অন্য কাউকে করতে দেখেছিলে?’

‘আজ্ঞে, না!’

‘পথে কোথাও থেমেছিলে? বা, কারুর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হয়েছিল?’

‘আজ্ঞে, না!’

এত দ্রুত উত্তর দিয়ো না। ভেবে-চিন্তে বলো।

‘না, ব্রাহ্মণদেব। আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি সাজিয়ে দেওয়া আহার্যের দু-চাকার ‘ঠেলাগাড়ি’ নিয়ে সোজা রাজকুমারীর মহলের কক্ষে হাজির হয়েছিলাম। খালি দ্বারে দু-জন প্রহরী আমার তল্লাশি নিয়েছিল প্রবেশের পূর্বে।’

‘হুম। আর আহার্যগাড়িতে সাজিয়ে কে দিয়েছিল?’

উত্তর জীমূতবাহন দিলেন,

‘আজ্ঞে, আমি। আমার উপস্থিতিতে, আমারই কথামতো সাজানো হয়েছিল আহার। রাজকুমারীর ভোজন বলে কথা! তাই আমি নিজেই তদারকি করেছিলাম মান্যবর। কিন্তু কেন এ প্রশ্ন? আমার কি কোনো ত্রুটি হয়েছে?’

‘হ্যাঁ, মহাশয়। একটি ভুল হয়ে গিয়েছে আপনার সম্ভবত। আপনি রাজকুমারী ও তার সখীদের জন্যে একই পানীয় দিয়েছিলেন। আপনার মতো বিচক্ষণ মানুষের এই ভুল কীভাবে হয়, মহাশয়?’

নিজের বাম হস্তের তালুতে ডান হস্তের মুষ্টি দিয়ে আঘাত করে জীমূতবাহন উত্তেজিতভাবে উত্তর দিলেন,

‘আমি জানতাম! আমি জানতাম কোথাও একটা ভুল হচ্ছে! তালিকায় ভ্রান্তি আছে! কিন্তু আমার উপর নির্দেশ ছিল তালিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা করার।’

‘স্পষ্ট করে বলবেন? কীসের ভ্রান্তি? কোন তালিকার কথা বলছেন?’

‘সকল রাজ অতিথিদের খাদ্যাভ্যাস আলাদা। তাই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেক গণ্যমান্য অতিথিদের জন্যে আলাদা খাদ্যতালিকা পূর্বেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সেই অনুযায়ী আমি তাদের ভোজন পাক করাতে পারি। অন্যান্য কর্মীরা শিক্ষিত নয়, তাই আমাকেই দায়িত্ব নিয়ে তাদের নির্দেশ দিয়ে রন্ধন করিয়ে নিতে হয়। সেরকমই নন্দদের তরফ থেকেও প্রাক্তন মহারাজ তথা রাজকুমারীর খাদ্যতালিকা আমার কাছে এসেছিল গতকালই।

তখনই আমার চোখে পড়েছিল যে, রাজকুমারীর পানীয় তালিকায় সুরা লেখা আছে। আমিও অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু তালিকা অনুযায়ী আমাকে চলতেই হত।’

চাণক্য নিজে কোনোদিন মদিরা জাতীয় পানীয় পান করেন না। মদিরা জাতীয় যেকোনো পানীয় তিনি নিজে অপছন্দ করেন এবং রাজপুরুষদের মদিরাসক্তির তীব্র নিন্দা করেন। তাই তাঁর কাছে সুরা ও সোমের পার্থক্য নেই।

চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

'মহাশয়, আমার অজ্ঞতার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না রাজকুমারীকে সুরা পরিবেশন করা যায় না কেন?'

জীমূতবাহন হাতজোড় করে বললেন,

'ক্ষমা করবেন। আমার এই বিষয়টা আপনাকে প্রথমেই বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল। দেখুন, মদিরা মূলত দু-প্রকার। সুরা এবং সোম। সুরা সৃষ্টি হয় ধান বা গম জাতীয় শস্য পাতন করে। রাজপুরুষ ও ক্ষত্রিয়রা এই শস্য থেকে পাতন করা যেকোনো মদিরাকেই নিম্নশ্রেণির মানুষদের পানীয় বলে মনে করেন। রাজপুরুষ, ক্ষত্রিয় তথা অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানুষ শুধুমাত্র সেই মদিরা গ্রহণ করেন যা ফুল বা ফলের রস থেকে বানানো হয়। যেমন ধরুন, সোমরস বা মৈরেয়া। ঋগ্বেদে সোমরসকে দেবরাজ ইন্দ্রর পেয় বলা হয়েছে। সেরকমই রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রর মৈরেয়া পানের উল্লেখ আছে। তাই সোমাদি পানীয়কে রাজপুরুষ, মনীষী তথা সন্তদের পানীয় ধরা হয়। তাই রাজকুমারীর তালিকায় সোমের পরিবর্তে সুরা দেখে আমি চমকিত হয়েছিলাম।'

চাণক্য প্রতিটা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। মদিরার মধ্যেও যে উঁচুনীচুর বৈষম্য আছে তা আজই তিনি প্রথমবার জানলেন। চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

'আপনার বৈদিক ও শাস্ত্রজ্ঞান দেখে আমি অভিভূত, মহাশয়। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায় যে, তারপরেও আপনি রাজকুমারীকে সুরা দিলেন কেন? কারুর সঙ্গে এই নিয়ে পূর্বে আলোচনা করে নেওয়া উচিত ছিল না কি?'

উত্তর দিতে জীমূতবাহন ইতস্তত করতে লাগলেন। উপস্থিত অন্য রক্ষী আর ভৃত্যর সম্মুখে তিনি কিছু একটা বলতে চাইছেন না, সেকথা অনুমান করেই জীবসিদ্ধি বলে উঠল,

'আচার্য, এই ভৃত্যকে আপনার আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে তাকে যেতে বলি?'

চাণক্য ইঙ্গিত বুঝে উত্তর দিলেন,

'হ্যাঁ। তুমি যাও। আর সৈনিকরাও যেতে পারো। আমার আর কোনো প্রশ্ন আপাতত নেই।'

ভৃত্যটি এতক্ষণে বোধ হয় স্বস্তির নিশ্বাস নিল। রক্ষীদের সঙ্গেই সেও কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বাইরে রক্ষীরা দ্বার রুদ্ধ করল।

চাণক্য পুনরায় জীমূতবাহনের দিকে মনোযোগ দিলেন।

'এইবার বলুন, মহাশয়।'

'আচার্য, আমার অপরাধ নেবেন না। আসলে নন্দদের বংশ পরিচয় আমার অজানা নয়। তারা জাতে 'নাই'। মহাপদ্মনন্দরা ক্ষৌরকার ছিলেন। তাই আমি ভেবেছিলাম হয়তো নন্দরা সুরাপান করে থাকেন। এই নিয়ে কাউকে প্রশ্ন করারও সাহস আমার হয়নি! এই প্রশ্ন কাকে করতাম, আচার্য? এই কথা সম্রাট বা নন্দদের কানে গেলে আমার কি গর্দান থাকত? আপনাদের দু-জনকে অনুরোধ দয়া করে এই কথা অন্য কাউকে বলবেন না! অন্যথায় আমি ঘোর বিপদে পড়ে যাব!

নন্দদের ইতিহাস সকলেই জানে। শিশুনাগ রাজবংশের রাজার ক্ষৌরকার ছিল ধনানন্দের পিতা মহাপদ্মনন্দ ও তার পুত্ররা। আসলে মহাপদ্মনন্দ ছিল এক শূদ্র দাসীর গর্ভে জন্ম নেওয়া শিশুনাগ রাজার অবৈধ সন্তান। তাই তাদেরও জাতে শূদ্র বলেই ধরা হত। কিন্তু মনে মনে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বুনছিল মহাপদ্মনন্দ। একদিন রাজা শিশুনাগের ক্ষৌরকার্য করার সময়ে তার গলায় ক্ষুর চালিয়ে হত্যা করে মহাপদ্মনন্দ। সেইসঙ্গেই রাজার অন্য পুত্রদের হত্যা করে সিংহাসন দখল করে সে। তাই জন্মসূত্রে শূদ্র নন্দদেরকে কেউই সম্মানের চোখে কোনোদিন দেখেনি। অতএব, নন্দ বংশের রাজকুমারী যে রাজকীয় সহবত পালন না করে সুরাপান করতে পারে এমন সন্দেহ অনেকেরই মনে থাকা স্বাভাবিক।'

হাত নাড়িয়ে জীমূতবাহনকে আশ্বস্ত করলেন চাণক্য। বললেন,

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার দ্বিধার কারণ বুঝতে পারছি। এই কথা আমরা তিনজন ব্যতীত কেউ জানবে না।'

'অশেষ ধন্যবাদ, আচার্য।'

'আপনাকে আর আটকে রাখব না। আপনার অনেক কার্যভার আছে অনুমান করতে পারছি। আপনি আসতে পারেন। তবে একটি বস্তু আমার প্রয়োজন। না না, একটি না, দুটি।'

'কী, আচার্য?'

'প্রথমত রাজকুমারীর খাদ্যতালিকাটি। দ্বিতীয়ত আরও একটি পাত্র এই অমৃতসম মধু-পানীয়! দয়া করে এই দুটি আমার এই কক্ষেই পাঠিয়ে দেবেন, মহাশয়।'

উঠে দাঁড়িয়ে পুনরায় দু-জন ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন জীমূতবাহন।

জীবসিদ্ধি কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল কিন্তু সে-সুযোগ পেল না। দ্বারের সম্মুখে অমাত্য কৃষ্ণনাথ ও প্রাক্তন অমাত্য রাক্ষস উপস্থিত হয়েছেন। উত্তেজিতভাবে, অনুমতির অপেক্ষা না করেই কক্ষে প্রবেশ করলেন কৃষ্ণনাথ। কাঁপা কণ্ঠে বললেন,

'আচার্য! আপনার অনুমানই সঠিক! সম্রাটের পানীয়েও বিষ পাওয়া গিয়েছে!'

---

* পাতন— distillation

**নাই— নাপিত, ক্ষৌরকার

৯.

'আপনি নিশ্চিত, মহা অমাত্য কৃষ্ণনাথ?'

প্রশ্নটা করলেন আচার্য চাণক্য। এই সংবাদে চাণক্য বিস্মিত হওয়ার ভান করলেন। কৃষ্ণনাথ উত্তর দিলেন,

'হ্যাঁ, আচার্য! আমার এবং আর্য কাত্যায়নের চোখের সামনেই পরীক্ষা করা হয়েছে!'

চাণক্য এইবার রাক্ষসের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন,

'আপনিও নিশ্চিত যে শুধু রাজকুমারী নয়, সম্রাটের পানীয়েও বিষ ছিল?'

'হ্যাঁ।'

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন রাক্ষস। জীবসিদ্ধি পূর্বেও লক্ষ করেছে। সব পরিস্থিতিতেই সমান মুখের ভাব রাখতে পারেন ইনি। তাঁর মুখ দেখে তাঁর মনের অবস্থা বোঝা সম্ভব নয়। রাক্ষসের পিতৃদত্ত নাম মগধে খুব কম মানুষই মনে রেখেছে। ধনানন্দ প্রদত্ত এই নাম পরবর্তীকালে তাঁর উপাধিবিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই সম্বোধনের প্রতিও তিনি সমানভাবেই উদাসীন।

চাণক্য পানপাত্র থেকে আরও কিছুটা মধু-পানীয় চুমুক দিয়ে বললেন,

'ক্ষমা করবেন। আপনাকে এই অপূর্ব পানীয় নিবেদন করতে পারলাম না। তবে জীমূতবাহন মহাশয় নতুন পেয়ালাটি পাঠালে তা আপনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন।'

'তার প্রয়োজন নেই। ধন্যবাদ।'

পানপাত্র পুনরায় নামিয়ে রেখে, তাতে ঢাকা দিয়ে চাণক্য বললেন,

'আপনাকে কিছু প্রশ্ন করার ছিল, আর্য। আপনি দয়া করে নিজের পছন্দমতো একটি আসন গ্রহণ করলে খুশি হতাম।'

নিজের ইচ্ছায় তিনি বসলেন, নাকি, অনিচ্ছাতেই বসলেন তা বোঝা গেল না। তবে রাক্ষস একটি আসন গ্রহণ করলেন ঠিকই।

চাণক্য কৃষ্ণনাথের দিকে ফিরে বললেন,

‘আপনি চিন্তিত হবেন না। এখনই কাউকে জানানোর প্রয়োজন নেই। আপনি বরং নিখোঁজ মেয়েটির খোঁজ করুন। তাকে তো খুঁজে পেয়ে যাওয়া উচিত এতক্ষণে। একবার সৈনিকদের কাছে খোঁজ নিন, মহাশয়।’

জীবসিদ্ধি বলল,

‘গোপনে তল্লাশি চালাতে হচ্ছে মহল জুড়ে। যাতে অতিথিদের সন্দেহ না হয়। তাই সম্ভবত সময় বেশি লাগছে। আপনি আসুন মহামাত্য মহোদয়। আশা করি মেয়েটিকে খুঁজে পেয়ে যাবে সৈনিকরা। দেখুন, ইতিমধ্যে হয়তো পেয়েও গিয়েছে তার সন্ধান।’

সম্মতি জানিয়ে কৃষ্ণনাথ চলে গেলেন। চাণক্য এইবার রাক্ষসের দিকে ফিরে বসলেন,

‘আর্য কাত্যায়ন, অনেক সময় পর সাক্ষাৎ হল আপনার সঙ্গে। আপনার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো আছে তো?’

‘হ্যাঁ। ধন্যবাদ।’

‘আর মহারাজ...ওহ! ক্ষমা করবেন! মানে, ধনানন্দর শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক আছে তো?’

জীবসিদ্ধি বুঝতে পারছে আচার্য কী করছে। এই মুহূর্তে মুখোমুখি দুই ব্যক্তি বহু বছর ধরে একে অন্যের প্রতিপক্ষ ছিল। মগধ জয়ের পর, চাণক্য নিজেই একবার বলেছিলেন যে, মগধের পতন তিনি আরও পাঁচ বর্ষ পূর্বেই ঘটাতে পারতেন, যদি না তাঁর পথের কাঁটা হিসাবে অমাত্য রাক্ষস থাকতেন। চাণক্য এই মুহূর্তে তাঁর কথার দ্বারা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছুড়ে দিচ্ছেন রাক্ষসের প্রতি।

রাক্ষস নিজেও ব্রাহ্মণসন্তান। মুণ্ডিত মস্তক, কেশশিখা ও উপবীত তাঁর প্রতীক। কিন্তু তাঁর বেশ চাণক্যর মতো সন্ন্যাসী বেশ নয়। তাঁর কণ্ঠে একটি স্বর্ণহার, কানে কুণ্ডল, মণিমুক্তা খচিত একাধিক অঙ্গুরীয় তাঁর প্রতিটি আঙুলে শোভা পাচ্ছে। তাঁর অঙ্গবস্ত্র এবং ধুতিটিও মূল্যবান রেশমের তৈরি। রাক্ষস বিশালবপু, কিঞ্চিৎ স্থূলতনু এবং গৌরবর্ণ। চাণক্য এবং রাক্ষসকে মুখোমুখি দেখে জীবসিদ্ধির মনে হচ্ছিল যেন ঈশ্বর কোনো এক দৈব কৌতুকবশে, ঠিক বিপরীত আকৃতির দুই ব্যক্তিকে একই সময়ে, একই স্থানে উপস্থিত করেছেন।

চাণক্যের ব্যঙ্গোক্তি রাক্ষস গায়ে মাখলেন না। অন্তত তাঁর ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পেল না কিছু। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বললেন,

‘এই বিবাহ আমার মতে স্থগিত রাখা হোক, আচার্য। রাজকুমারী দুর্ধরার যে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা আছে এই রাজমহলে, তা কেউ না জানলেও আপনি তো উপলব্ধি করতেই পারছেন, আশা করি?’

'হুম। ঠিকই বলেছেন। কিন্তু মহাশয়, প্রাণ সংশয় যে শুধু রাজকুমারীর আছে, তা তো নয়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যরও প্রাণনাশের প্রচেষ্টা করা হয়েছে! আপনি নিজেই তো তার খাদ্য ও পানীয় পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলেন। আপনি নিজেই দেখেছেন যে তার পানীয়েও বিষ ছিল।'

তৎক্ষণাৎ কিছু উত্তর দিতে পারলেন না রাক্ষস। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

'আপনার কি ধারণা একই ব্যক্তি এর জন্যে দায়ী?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চাণক্য পালটা প্রশ্ন করলেন,

'আপনার কী ধারণা?'

'রাজবৈদ্য মহাশয়ের মতে বিষ দুটি ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'অভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় কি?'

'তা যায় না। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'এখনও অবধি সমস্ত তথ্য ইঙ্গিত করছে যে, রাজকুমারীর সখী কৃষ্ণকলি তার পানীয়ে বিষ দিয়েছে। যদি সে-সম্ভাবনা সত্যি বলেও ধরে নিই, তাহলে প্রশ্ন আসে যে, তার পক্ষে সম্রাটের পানীয়ে বিষ দেওয়া কীভাবে সম্ভব?'

'আপনার কথায় প্রতীত হচ্ছে যে, আপনি বিশ্বাস করেন না যে, রাজকুমারীর সখী কৃষ্ণকলি দোষী?'

'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন এখানে গুরুত্বহীন।'

চাণক্য কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে রাক্ষসের দিকে চেয়ে থেকে বললেন,

'রাজকুমারীর কক্ষে আজকে আপনি গিয়েছিলেন।'

এটা প্রশ্ন নয়, উক্তি বুঝেই 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর দিলেন না রাক্ষস। চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

'কী ছিল সাক্ষাতের উদ্দেশ্য, আমি জানতে পারি?'

'আমি কি আপনাকে বলতে বাধ্য?'

দু-হাত সম্মুখে তুলে, আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে চাণক্য বললেন,

'একেবারেই নয়! আপনি মগধের অতিথি। বাধ্যবাধকতার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আর্য, আমি আপনাকে একবার পরিস্থিতির বিচার করতে অনুরোধ করব। আমি জানি আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি। আশা করি, আপনি একথা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, আমাকে সব কথা বলাটাই শ্রেয়।'

রাক্ষস চুপ করে আছেন দেখে চাণক্য আবার বললেন,

'রাজকুমারী দুর্ধরা আপনার কন্যাসমা তা আমার জানা। এবং, তিনি মগধের ভাবী মহারানি। তাই তাঁর হিতাহিতের দায়িত্ব আমার ও আপনার উভয়েরই ওপরে বর্তায়। এবং, তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, আর্য!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমাত্য বললেন,

'বেশ। বলুন, কী জানতে চান?'

'রাজকুমারীর সঙ্গে আপনার কী কথা হয়েছিল?'

'আমি তাকে বলি যে আরও একবার যেন তিনি ভেবে দেখেন, এই বিবাহ তিনি করতে ইচ্ছুক কি না। কারণ একথা বুঝতে অসীম বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না যে, তিনি শুধুমাত্র পরিস্থিতির চাপে এই বিবাহপ্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। পিতা তথা পরিবারের অন্য প্রিয়জনদের হিতের কথা ভেবেই তিনি মত দিয়েছেন। একথা আপনারও অজানা নয়, আচার্য।'

'হুম। আপনি কোন স্থানে বসেছিলেন তাঁর কক্ষে?'

রাক্ষস আশা করেছিলেন চাণক্য বিবাহের বিষয়ে কিছু বলবেন। কিন্তু, চাণক্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন করায় এই প্রথম কিছুটা অপ্রতিভ দেখাল রাক্ষসকে। প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তিনি বললেন,

'আপনি যা জানতে চাইছেন তা অনুধাবন করতে পারছি। হ্যাঁ, আমি ঠিক তাঁর আহার্য সাজানো মেজের পাশের আসনেই বসেছিলাম। আপনি কি মনে করেন আমি রাজকুমারী দুর্ধরার পানীয়ে বিষ দিয়েছি?'

'দিয়েছেন কি?'

'অবশ্যই না! যদিও আপনি সম্ভবত আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।'

চোখে কৌতুকের আভাস ফুটল চাণক্যর। বললেন,

'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন এখানে অবান্তর।'

'কিন্তু, তাতে আমার লাভ কী? আমার কন্যাসমা দুর্ধরাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য কী হতে পারে আমার?'

'একাধিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে, আর্য কাত্যায়ন। হতে পারে আপনি পরাজয় স্বীকার করতে পারছেন না নিজের মনে! অথবা, হতে পারে আপনার সঙ্গে ধনানন্দর কোনো মতবিরোধ ঘটেছে। তার প্রতি ক্রোধে আপনি তার কন্যাকে হত্যা করতে চাইছেন। আমি আরও বেশ কিছু সম্ভাবনা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করতে পারি, আর্য।'

অযৌক্তিক এবং হাস্যকর! রাজকুমারীকে হত্যার চেষ্টা এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে হত্যার চেষ্টা আপনাদের সুরক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রমাণ করে। অথচ আপনি ‘কৌটিল্যোচিত’ ভঙ্গিতে তা আমাদের দিকেই পরিচালিত করতে চাইছেন!

বিন্দুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ পেল না রাক্ষসের কণ্ঠে। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতেই কথাগুলো বললেন তিনি।

চাণক্য কিছুক্ষণ তাঁর চোখে চোখ রেখে থাকলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন,

‘হুম। শেষ প্রশ্ন। আপনি রাজকুমারীর কক্ষে যতক্ষণ উপস্থিত ছিলেন, ততক্ষণ রাজকুমারী ও তাঁর দুই সখী কী করছিল?’

খানিক ভেবে রাক্ষস উত্তর দিলেন,

‘রাজকুমারী দুর্ধরা পালঙ্কে বসেই ছিলেন। আর একজন তাঁর কেশে কিছু করছিল, আর একজন পা ধুয়ে দিচ্ছিল!’

‘বেশ। আচ্ছা, এই ঘটনা ঘটার পর কি রাজকুমারীর সঙ্গে আপনার বা ধনানন্দর সাক্ষাৎ হয়েছে?’

‘না। শুনলাম তাকে অন্য কক্ষে নিয়ে গিয়ে সুরক্ষা আবর্তে ঘিরে রেখেছে আমাদের এবং মগধের প্রহরীদল। আমাদের তো কিছু জানানোই হচ্ছে না! আমি শুধু এইটুকু জানতাম যে, রাজকুমারীকে বিষ দিয়ে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ভুলবশত মারা গিয়েছে তাঁর সখী। ঠিক কী ঘটেছে, কে মারা গিয়েছে সেটাও আমার জানা ছিল না। আমি কিছুক্ষণ আগেই সবটা শুনলাম আর্য কৃষ্ণনাথের কাছে।’

‘হুম! ধন্যবাদ, আর্য।’

উঠে দাঁড়ালেন রাক্ষস। বললেন,

‘এই বিবাহ তবে স্থগিত হবে না? রাজকুমারী কি এই ঘটনার পরেও বিবাহ করতে রাজি হবেন?’

‘এখনও বিবাহ লগ্নে বিলম্ব আছে। এখনই কোনো নির্ণয় নেওয়ার সময় আসেনি বলেই আমি মনে করি।’

আর কোনো বাক্যব্যয় না করে কক্ষ ত্যাগ করলেন রাক্ষস।

চাণক্য পুনরায় তাঁর পাত্র থেকে কিছুটা পানীয় গলাধঃকরণ করে বললেন,

‘জীবসিদ্ধি, এইবার পরবর্তী ব্যক্তিকে ডাকো।’

সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়ে জীবসিদ্ধি দ্বার খুলে বেরিয়ে এল। সম্মুখে বারান্দায় উপস্থিত একজন প্রহরীর উদ্দেশে বলল,

‘আর্য ধনানন্দকে গিয়ে জানাও, আচার্য চাণক্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অভিলাষী। তাকে এই কক্ষে উপস্থিত হতে বলো। তাকে জানিয়ো যে, এটি সম্রাটের অনুরোধ।’

জীবসিদ্ধি ভালোভাবেই জানে যে, রাজার ‘অনুরোধ’ বলে কোনো বস্তু হয় না। তার ‘অনুরোধ’ এবং ‘আদেশ’ সমরূপে ব্যবহৃত দুটি শব্দমাত্র। জীবসিদ্ধি এও জানে যে, এই ‘অনুরোধ’-এর অর্থ ধনানন্দও জানেন।

১০.

ধনানন্দ বসে আছেন চাণক্যর সম্মুখে। দু-জন একে অন্যের চোখে চোখ রেখে চেয়ে রয়েছেন। কেউ কথা বলা শুরু করেননি এখনও।

জীবসিদ্ধি চাণক্যর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সতর্ক ভঙ্গিতে। সে ধনানন্দর তরফ থেকে আচমকা কোনো আঘাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছে না। কারণ ধনানন্দর চোখের দৃষ্টিতে তীব্র আক্রোশ লুকোনোর কোনো চেষ্টা তিনি করছেন না। আর এই কক্ষে এই মুহূর্তে তারা তিনজন ব্যতীত কোনো সৈনিক নেই।

চাণক্য শান্তভঙ্গিতে বসে আছেন তার চোখে চোখ রেখে। যেন দু-জন এক অদৃশ্য প্রতিস্পর্ধা লড়ছেন শুধুমাত্র দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। কে আগে চোখ নামাবে সেটাই দেখার।

চোখ শেষ পর্যন্ত ধনানন্দকেই সরাতে হল। জীবসিদ্ধির কণ্ঠে আটকে থাকা নিশ্বাস এতক্ষণে বের হল। শরীরের পেশি সামান্য ঢিল দিল, তবে সম্পূর্ণ অসতর্ক সে হল না। সে বহু বছর ধরেই কোনোদিন সম্পূর্ণ অসতর্ক হয়নি।

জীবসিদ্ধি এতক্ষণে ধনানন্দর চোখ থেকে দৃষ্টি সরানোর সুযোগ পেয়ে তার বেশভূষার দিকে নজর দেওয়ার সুযোগ পেল। রাজত্ব গেলেও, রাজকীয় মেজাজটা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন ধনানন্দ। তবে মাত্র কয়েক বর্ষেই অনেকটা বার্ধক্য ছাপ ফেলেছে তার উপর। সেটি পরাজয়ের গ্লানিতে নাকি অত্যধিক মদ্যপানে, তা বলা সম্ভব নয়।

মাথায় উষ্ণীষের মধ্যভাগে বড়ো একটি রত্ন খচিত। পরনে রেশমের পীতাম্বর অঙ্গাবস্ত্র এবং ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের ধুতি। দুইয়েরই উপর সোনালি জরির কাজ করা। কানে কুণ্ডল, হাতে বাজু এবং বালা, কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে একাধিক হার। সব কিছুই স্বর্ণের। হাতের প্রতিটি আঙুলে অঙ্গুরি। তার মধ্যে বাম হস্তের একটি অঙ্গুরি বোধ হয় নতুন, কারণ সেটা ঢিলে; তার আঙুলে সঠিকভাবে বসেনি। আঙুলে দাগ থেকে বোঝা যায় তাতে ছোটো অঙ্গুরি ছিল, এখন বোধ হয় অনুষ্ঠানের কারণে বড়ো রত্নখচিত অঙ্গুরি পরেছেন

সেই স্থানে। ধনানন্দর স্বর্ণ ও রত্ন প্রীতির কথা সকলেরই জানা। এর সঙ্গে পাদুকাতেও জরির কাজ করা।

ধনানন্দ অন্যদিকে চেয়ে আছেন, আর অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঢিলে অঙ্গুরীয়টি বার বার খোলাপরা করছেন বসে। মনে মনে শাপশাপান্ত করছেন নিঃসন্দেহে সামনে বসা চাণক্যকে। কক্ষের বাতাবরণের এই দম-বন্ধ-করা অবস্থা যেন জীবসিদ্ধি টের পাচ্ছে। এখন কক্ষের একমাত্র ◌ায়নটি খুলে দিতে পারলে কক্ষে সে খুশি হত।

চাণক্য প্রথম মুখ খুললেন,

‘ধনানন্দ!’

কোনোরকম সম্মানজনক সম্ভাষণ চাণক্য ব্যবহার করলেন না সম্মুখে ব্যক্তির উদ্দেশে। ধনানন্দর মুখে একটি রক্তিম আভা এক পলকের জন্যে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। শ্বেতমর্মরের মেঝের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে, তিনি একই ভঙ্গিতে হাতের অঙ্গুরিটি নিয়ে খেলা করতে থাকলেন, যেন শুনতে পাননি চাণক্যের কথা।

চাণক্য পুনরায় বললেন,

‘তুমি কি পুরো ঘটনা শুনেছ?’

‘নাহ্! তোমার প্রহরীরা আমায় রীতিমতো কক্ষে বন্দি করে রেখেছে! কিছুই জানি না! আমার কন্যার প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করেছে তোমাদের মহলের কেউ! আর আমায় জোর করে কক্ষের বাইরে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না! আমি বার বার প্রশ্ন করতেও কেউই আমায় কিছু জানায়নি।’

‘রাজকুমারীকে কেউ বিষ প্রয়োগ করে হত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি ঠিক আছেন এবং সেই বিষে মারা গিয়েছে তাঁরই এক সখী, মধুবন! এবং, তাঁর দ্বিতীয় সখী কৃষ্ণকলি নিখোঁজ। তার খোঁজ করছে প্রহরীরা। সন্দেহ করা হচ্ছে সে-ই বিষ প্রয়োগ করেছিল।’

রাগে ফেটে পড়লেন ধনানন্দ,

‘সে কী! আমার কন্যাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে? আর এত বড়ো ঘটনার কথা আমি এই প্রথম তোমার মুখ থেকে কেন জানছি? আমাকে আগেই এই সংবাদ কেন জানানো হয়নি, চাণক্য?’

আসনের কাঠের হাতলে মুষ্টি দিয়ে আঘাত করলেন ধনানন্দ। বললেন,

‘আর তুমি বলছ ওই কৃষ্ণকলি বিষ দিয়েছে? মিথ্যা কথা! আমি বিশ্বাস করি না! কৃষ্ণকলি আমার কন্যার পরম সখী। আমি নিশ্চিত এই কুকর্ম মগধের কারুর কাজ! যেখানে আমার কন্যার জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই, সেখানে আমি তার বিবাহ দেব

না! শুনে রাখো তুমি চাণক্য! বেশিক্ষণ এভাবে তুমি আমাদের মুখ বন্ধ রাখতে পারবে না! অতিথিরাও জানবে সব ঘটনা। একথা অনুমান করতে কারুর অসুবিধা হবে না যে এই কাজ মগধের! বিবাহের অছিলায়, এ এক ঘৃণ্য হত্যার ষড়যন্ত্র!'

'হুম।'

চাণক্যর থেকে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া না পেয়ে, আরও জ্বলে উঠলেন ধনানন্দ। বললেন,

'আর এই নীচ, কুটিল ষড়যন্ত্র কার মস্তিষ্কপ্রসূত, তা সকলেই অনুমান করতে পারবে!'

সময় নিয়ে দু-চুমুক মধু-পানীয় গলাধঃকরণ করে চাণক্য উত্তর দিলেন,

'অভিযোগ মেনে নিতাম, সকলেই মেনে নিত, যদি একা রাজকুমারীর উপর বিষ প্রয়োগের চেষ্টা হত।'

'অর্থাৎ?'

'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর খাদ্যেও বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে!'

ধনানন্দ আর যাই হোক, এমন একটি সংবাদ আশা করেননি। তাঁর ভ্রূ উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে।

'চন্দ্রগুপ্তর উপর বিষ প্রয়োগ? এ মিথ্যে কথা!'

'নাহ্। সেই কারণেই আমি পরীক্ষার সময়েই অমাত্য কৃষ্ণনাথের সঙ্গে তোমার বিশ্বাসপাত্র রাক্ষসকে উপস্থিত রেখেছিলাম। তাঁর উপস্থিতিতেই বিষ পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে বোধ হয় সাক্ষাৎ হয়নি তোমার। হলে তিনি নিজেই এই সংবাদ জানাতেন তোমায়। অতএব, ঘটনাটা আর শুধুমাত্র রাজকুমারীকে হত্যার চেষ্টা নয়, স্বয়ং সম্রাটকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। তাই অভিযোগের তির মৌর্যর প্রতি যদি ওঠে, তা সমানভাবেই নন্দদের দিকেও ওঠে। আমরা দু-পক্ষই একই তরণির যাত্রী।'

ধনানন্দ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন। চাণক্য বললেন,

'আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

'আমি উত্তর দিতে বাধ্য নই!'

'রাজকুমারীর কক্ষে আজ তিনজন অতিথি প্রবেশ করেছিলেন। প্রত্যেকেই যে সময় কক্ষে উপস্থিত ছিলেন, সেসময়ে আহারাদি সাজানোই ছিল। প্রত্যেকের সুযোগ ছিল বিষ প্রয়োগ করার। অতএব, সন্দেহ কিন্তু তোমার উপরেও পড়ে।'

‘বাহ্‌, বাহ্‌! সাধু, সাধু! মগধের কর্মচারী পানীয় বানাল! মগধের ভৃত্য তা কক্ষ পর্যন্ত নিয়ে এল, সাজিয়ে রাখল! মগধের সুরক্ষাব্যবস্থার মাঝে, মগধের রাজমহলের অন্দরে হত্যার চেষ্টা হল! আর সন্দেহের তালিকায় রইল তিন অতিথি এবং এক বাল্যসখী?’

চাণক্যর ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যেতে লক্ষ করল জীবসিদ্ধি পরমুহূর্তে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

‘তোমার এই কথা থেকে ধারণা হচ্ছে যে, এই বাকি দু-জন সাক্ষাৎপ্রার্থী কে তা তোমার জানা।’

‘হ্যাঁ। জানা। আমার আগে রাক্ষস কক্ষে এসেছিল তা তো দুর্ধরা নিজেই জানায় আমায়। আর, তার পর মলয়কেতু এসেছিল তাও শুনেছি আমার প্রহরীদের কাছেই। তারাও উপস্থিত ছিল মগধের প্রহরীদের সঙ্গেই, কক্ষের বাইরে।’

‘হুম। তো, বিষ কে দিয়েছে বলে তোমার সন্দেহ হয়?’

‘সবচেয়ে বেশি সন্দেহ তো আমার তোমার উপর হয়, আচার্য কৌটিল্য!’

‘বেশ। আর?’

পুনরায় চাণক্যর তরফ থেকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া না পেয়ে ধনানন্দ কিছুটা দমে গেলেন। চুপ করে বসে পুনরায় হাতের আঙুল থেকে বেরিয়ে আসা অঙ্গুরিটি নিয়ে খেলা শুরু করলেন। বললেন,

‘ওই মূষিকমুখো রাজকুমারটি! মলয়কেতু! সেও তো তোমার পক্ষের লোক। সেভাবে দেখতে গেলে, সেও মগধের লোক! আর, ওই ভৃত্যটি, যে খাদ্য দিয়ে গিয়েছে, তাকে বন্দি করা হয়েছে কি? তাকে আমাদের জেরা করার সুযোগ দাও! ও-ই যে বিষ দিয়েছে দুর্ধরাকে, সেটা স্বীকার করিয়ে ছাড়াব!’

‘আমিও নিশ্চিত সেই বিষয়ে।’

‘কী? যে, ওই দাসটিই বিষ দিয়েছে?’

‘নাহ্‌। তোমার লোক যে তাকে পেলে, অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি আদায় করবেই, সেই বিষয়ে!’

বিড়বিড় করে চাণক্যর উদ্দেশে সম্ভবত কয়েকটি অপশব্দ ব্যবহার করলেন ধনানন্দ।

তাঁর অসন্তোষ অগ্রাহ্য করে চাণক্য আবার প্রশ্ন করলেন,

‘কৃষ্ণকলি যদি নির্দোষ হয়ে থাকে, তবে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে কেন মনে হয়?’

উত্তর দিলেন না ধনানন্দ। তাঁর কাছে এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নেই সম্ভবত। চাণক্য পরের প্রশ্নে চলে গেলেন,

‘কক্ষে যতক্ষণ ছিলে, রাজকুমারী আর তার দুই সখী কী করছিল?’

‘দুর্ধরাকে শৃঙ্গার করে দিচ্ছিল।’

‘কে কোন শৃঙ্গারের কাজ করছিল?’

বিরক্তি মেশানো কণ্ঠে ধনানন্দ উত্তর দিলেন,

‘এইসব অর্থহীন প্রশ্নের তাৎপর্য কী? আমার সময়ের মূল্য আছে! এইবার আমি উঠব। এবং, আমি আমার কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই! তুমি তোমার রক্ষীদের বলো...’

কথা শেষ করার পূর্বেই বাধা পড়ল। দ্বার খুলে এক সৈনিক প্রবেশ করল।

‘ক্ষমা করবেন, মহামতি। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, তাই আপনাদের বার্তালাপে বিঘ্ন ঘটাতে বাধ্য হলাম।’

‘বলো? কী হয়েছে? কৃষ্ণকলিকে পাওয়া গিয়েছে?’

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ। কিন্তু...’

‘কিন্তু? কী?’

‘উত্তর মহলের ছাদ থেকে ভূপতিত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে, মহামতি।’

১১.

উত্তর মহলের পিছনের বাগানে মৃতদেহটি পড়ে আছে, মহলের উঁচু দেয়ালের গা ঘেঁষে। অনেকটা উচ্চতা থেকে দেহটি পতিত হয়েছে। উত্তর মহলের ছাদ থেকেই পতন হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। বাতায়ন গরাদহীন হলেও তা দিয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ গলে যাওয়াটা কষ্টকর। তা ছাড়া সকলের নজর এড়িয়ে সেটা সম্ভব নয়। মৃতদেহের প্রাথমিক অবস্থান দেখেই সৈনিকরা অনুমান করছে এটি আত্মহত্যা।

স্বাভাবিকভাবেই আমন্ত্রিত অতিথিদের থেকে এই ঘটনা লুকিয়ে রাখা আর সম্ভব হয়নি। সৈনিকরা যদিও তাদের দূরে রেখেছে ঘটনাস্থল থেকে। মহলের এইদিকটায় তুলনামূলকভাবে লোকজনের চলাচল কম। দু-জন সৈনিক মৃতদেহ দেখতে পেয়ে খবর দেয় অমাত্য কৃষ্ণনাথকে।

মৃতদেহ ঘিরে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েক জন রাজপুরুষ। কারণ অনেক রাজ অতিথিদেরই বাধা দেওয়াটা সাধারণ সৈনিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে চাণক্য, জীবসিদ্ধি, অমাত্য কৃষ্ণনাথ, ধনানন্দ এবং রাক্ষস উপস্থিত। জীবসিদ্ধি খেয়াল করেছে, অন্যান্য কয়েক জনের মাঝে মলয়কেতুও উপস্থিত হয়েছে ভিড়ের মধ্যে।

রাক্ষস মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে। চাণক্য তাঁর পাশেই এসে দাঁড়ালেন।

‘কী মনে হয়, আর্য?’

চাণক্যর প্রশ্নের ইঙ্গিত রাক্ষস উপলব্ধি করতে পারলেও সোজাসুজি উত্তর দিলেন না। বললেন,

‘রাজকুমারীকে হত্যার চেষ্টা করে থাকলে, কৃষ্ণকলির পক্ষে আত্মহত্যা করাটা অস্বাভাবিক নয়।’

‘অথবা?’

উত্তরটা ধনানন্দ দিলেন,

‘হত্যা! এ হত্যা! আর কত লুকিয়ে রাখবে মগধ তাদের অপদার্থতা? রাজকুমারীকে হত্যার প্রচেষ্টা এবং তার দুই প্রিয় সখীকে হত্যা করা হয়েছে! এটাই সত্য!’

ধনানন্দ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এতক্ষণ গোপন রাখা সংবাদটি সকলের সম্মুখে উত্থাপন করার চেষ্টা করছে বুঝতে পারছে জীবসিদ্ধি।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে জীবসিদ্ধি দ্রুত বলল,

‘ভুলে যাবেন না, হত্যার প্রচেষ্টা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকেও করা হয়েছে! তাই বিনা প্রমাণে মগধের দিকে আঙুল না তোলাই সমীচীন, আর্য। বিশেষ করে অতিথিদের সামনে।’

চাণক্য নীচুকণ্ঠে বললেন,

‘এই বিবাহে নন্দদের অসন্তোষের কথা কারুর অজানা নয়। নন্দরা যদি অভিযোগ করে যে, মগধ দু-জন তরুণীকে হত্যা করেছে এবং মগধ যদি পালটা দাবি করে যে নন্দরা সম্রাটকে হত্যার চেষ্টা করছে, তবে আপনার কী মনে হয়? কাদের অভিযোগ বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে, আর্য? কার কথা রাজ অতিথিরা বিশ্বাস করবে?’

চাণক্য প্রশ্নটা রাক্ষসকে করলেও উদ্দেশ্য যে ধনানন্দর প্রতি মুখ বন্ধ রাখার বার্তা, তা বুঝতে অসুবিধা হল না।

রাক্ষস ধনানন্দর দিকে ফিরে বললেন,

‘আমার মনে হয় প্রমাণ না হওয়া অবধি কাউকে কিছু না জানানোটাই উচিত হবে। কিন্তু, আচার্য...।’

‘বলুন?’

‘এই বিবাহ আর সম্ভব নয়। দুটি মৃত্যু ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। বর-বধূর সুরক্ষা যেখানে প্রশ্নের মুখে, এ অবস্থায় এই বিবাহ অসম্ভব! তা ছাড়া আমি নিশ্চিত যে, রাজকুমারী দুর্ধরা কখনোই আজকে এই বিবাহ করতে রাজি হবেন না। তাঁর দুই বাল্যসখীর মৃত্যু হয়েছে আজকে!’

চাণক্য কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,

'হুম। আমি আপনার থেকে কিছুটা সময় চেয়ে নেব। আমি রাজকুমারীকে কথা দিয়েছি যে, রহস্যের সমাধান আমি করব। আমি তা করতে সক্ষম না হলে, এই বিবাহ হবে না এই কথা আমি তাঁকে দিয়েছি। কিন্তু, যদি আমি সক্ষম হই? আর ভুলে যাবেন না, এখানে সিদ্ধান্ত কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর।'

চাণক্যর কথা রাক্ষসের বা ধনানন্দর কারুরই মনঃপূত হয়নি। কিন্তু কিছু বললেন না তাঁরা। ধনানন্দ রাগত ভঙ্গিতে আঙুলের বড়ো অঙ্গুরীয়টি নিয়ে খোলাপরা করতে শুরু করলেন পূর্বের মতোই। রাক্ষস তাঁর পাশেই পাথরের মতো মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জীবসিদ্ধি সৈনিকদের নির্দেশ দিল মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার। অতিথিদের জানানো হল এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র, তাঁরা যেন শান্ত থাকেন। অন্যদের সঙ্গে নন্দ এবং রাক্ষসও স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন।

সকলে চলে যাচ্ছে দেখে, চাণক্য বললেন,

'ওহে জীবসিদ্ধি, মলয়কেতুকে আটকাও। তার প্রশ্নোত্তর পর্বটা এখানেই সেরে ফেলি।'

জীবসিদ্ধি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মলয়কেতুর পথ রোধ করল। দু-জনের মধ্যে কিছু বার্তালাপ হল এবং কিছুক্ষণ বাদেই তাদের চাণক্যর দিকে আসতে দেখা গেল।

মলয়কেতুর মুখের অভিব্যক্তি দেখেই বোঝা যায় যে, নিতান্ত অনিচ্ছাতেই সে আসছে। এসে মেকি হাসি হেসে প্রণাম জানাল চাণক্যকে।

'প্রণাম, আচার্য।'

'প্রণাম, পৌরবরাজ। আপনাকে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। আপনার অধিক সময় আমি নেব না। আমি জানি আপনি কতটা ব্যস্ত।'

শেষের ব্যঙ্গটি মলয়কেতু উপলব্ধি করতে পারল কি না বোঝা গেল না। মলয়কেতু পৌরবরাজ পর্বতেশ্বর পুরুর পুত্র। এবং, এটাই তার একমাত্র পরিচয়। সারাদিন আমোদ, ফুর্তি ছাড়া তার বিশেষ কোনো দায়িত্ব নেই।

মলয়কেতু প্রশ্ন করল,

'আমার থেকে আপনার কী জানার আছে, আচার্য?'

চাণক্য বললেন,

'আজ সকালে আপনি রাজকুমারী দুর্ধরার কক্ষে কেন গিয়েছিলেন?'

'সৌ... সৌজন্য সাক্ষাৎ!'

'হঠাৎ তার প্রতি এই সৌজন্য?'

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে মলয়কেতু। বলল,

‘তেমন কিছু নয়। ব্যক্তিগত একটি বিষয়ে... ।’

‘হুম। মহারাজ, আপনি দয়া করে এই বিভ্রান্তি মনে রাখবেন না যে, আপনার এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য আমাদের অজানা। রাজকুমারী নিজেই আমাদের সব জানিয়েছেন। কয়েক বছর আগে আপনার প্রস্তাবের কথাও আমাদের অজানা নয়।’

চোখে চোখ রাখছে না মলয়কেতু। তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চাণক্য পুনরায় বললেন,

‘পঞ্চনদের কয়েকটি ছোটো জনপদের রাজাদের সঙ্গে আপনি যে ইদানীংকালে যোগাযোগ করেছেন সেটাও সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর কানে এসেছে। তিনি এখনও আপনাকে নিজের মিত্র মনে করেন, তাই আপনাকে এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেননি। মনে রাখবেন কুমার, এমন কোনো কার্যকলাপ করবেন না যাতে সম্রাটকে আপনার প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করতে হয়।’

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে মলয়কেতু বলল,

‘না, না! আমি... মানে আমি...’

উত্তরের অপেক্ষা না করেই চাণক্য বললেন,

‘আজ সকালে যখন রাজকুমারীর কক্ষে আপনি উপস্থিত হয়েছিলেন, সেসময়ের কথা স্মরণে আছে, আশা করি?’

‘আমি আর কোনোদিন রাজকুমারীর সম্মুখে যাব না। আপনি দয়া করে সব ভুলে যান, মহামতি।’

‘আপনি আমার প্রশ্নের উত্তরটা সঠিক দিলে সে-বিষয়ে ভেবে দেখতে পারি।’

‘কী প্রশ্ন?’

‘মৃতা মেয়েটিকে আগে দেখেছেন?’

‘না তো।’

‘সে কী? আজকে সকালে রাজকুমারীর কক্ষে একে দেখেননি?’

‘ওহ্! হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেছি একে।’

‘হুম। মনে পড়ছে তাহলে।’

মলয়কেতু অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একবার নিজের অঙ্গবস্ত্র ঠিক করল।

চাণক্য বললেন,

‘এইবার কষ্ট করে আজকে রাজকুমারীর কক্ষের দৃশ্য স্মরণ করুন।’

‘আজ্ঞে।’

‘বেশ, বেশ। এইবার ভেবে বলুন তো, আপনি কক্ষের কোন স্থানে আসন গ্রহণ করেছিলেন?’

‘কক্ষে একটিই আসন ছিল, আচার্য। তাতেই। তবে, খুবই অল্প সময়ের জন্যে ছিলাম আমি কক্ষে।’

‘অর্থাৎ, মেজের পাশের আসনটিতে। পাশে সাজিয়ে রাখা ভোজনসামগ্রী দেখেছিলেন?’

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ।’

‘আর, রাজকুমারী সেইসময়ে কী করছিলেন?’

‘তিনি রূপচর্চায় ব্যস্ত ছিলেন।’

‘ঠিক কী রূপচর্চা করছিলেন?’

‘তিনি পালঙ্কে ছিলেন। একজন দাসী তাঁর কেশে কিছু অলংকার সজ্জা করছিল আর একজন তাঁর সম্মুখে মেঝেতে বসে হাত না পায়ে কিছু করছিল।’

‘এই মৃতা মেয়েটি কোনজন?’

‘ওহ্! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই মেয়েটি কেশে অলংকার পরিয়ে দিচ্ছিল।’

‘হুম। তার বা অন্য কারুর আচরণে কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল?’

‘না। রাজকুমারী আমার দিকে দৃপাত করছিলেন না। তবে এই মেয়েটি, কেশচর্চার মাঝে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখেছিল বটে।’

ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছে চাণক্যের।

‘অদ্ভুত দৃষ্টি বলতে?’

‘মানে ঠিক বোঝাতে পারব না। তবে, সে যেন আমায় দেখে ভয় পাচ্ছিল। ভীত দৃষ্টিতে বার বার আমার দিকে দেখছিল।’

চাণক্য গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছেন। মলয়কেতু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল পরের প্রশ্নের। কিন্তু চাণক্য অন্যদিকে চেয়ে আছেন। ললাটে গভীর ভ্রূকুটি। মলয়কেতু বুঝতে পারছে না সে কী করবে। সে কি বিদায় নেবে, না, অপেক্ষা করবে? সে বার বার চাণক্য আর জীবসিদ্ধির মুখের দিকে চাইছে।

চাণক্য নিজের ভাবনায় ডুবে আছেন দেখে, জীবসিদ্ধি শেষপর্যন্ত মলয়কেতুকে বলল,

‘আপনি আসুন, মহারাজ। আর কোনো প্রশ্ন বাকি থাকলে আপনাকে পুনরায় বিরক্ত করব।’

অতি দ্রুত তাকে প্রতিপ্রণাম জানিয়ে স্থান ত্যাগ করল মলয়কেতু।

চাণক্য ধীরপায়ে হেঁটে চলেছেন। তাঁর পাশেই জীবসিদ্ধি চলেছে। হঠাৎ বড়ো প্রহর ঘণ্টার শব্দে গমগম করে উঠল গোটা রাজমহল।

দিনের অন্তিম প্রহর শেষ হয়েছে। সূর্যদেব তার রক্তিম আভা বিস্তার করে পশ্চিমের আকাশে বিদায় নিচ্ছে। সন্ধ্যার প্রথম প্রহর শুরু হল। সময় ফুরিয়ে আসছে।

১২.

অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন চাণক্য। জীবসিদ্ধি চাণক্যর সম্মুখে, একটি পাথরের বেদিতে বসল। জীবসিদ্ধি কোনোকালেই প্রকৃতিপ্রেমী নয়। কিন্তু রাজমহলের সুবিস্তৃত বাগানের মধ্যে বিশেষ করে এই অংশটা জীবসিদ্ধির অতি প্রিয়। নন্দ শাসনকালে এখানে সম্রাট ধনানন্দ নারীদের সঙ্গে আমোদ করতেন।

এখন এটি তার এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর চতুরঙ্গ খেলার স্থান। সে মাঝে মাঝেই চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে চতুরঙ্গ খেলতে রাজমহলে আসে। তখন এই স্থানেই খেলার ছক পাতা হয়ে থাকে। অনেকগুলো বড়ো পাথরের বেদি করা আছে এখানে মানুষের বসার জন্যে।

চতুরঙ্গকে বলা হয় বুদ্ধির খেলা, কৌশলের খেলা। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আচার্য চাণক্য এতে একেবারেই পারদর্শী নন। তাঁকে জীবসিদ্ধি বা চন্দ্রগুপ্ত অতি সহজেই বেশ কয়েক বার পরাজিত করেছে। আসলে খেলা আর বাস্তব যুদ্ধকৌশল এক নয়! বাস্তবের যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো নিয়ম হয় না। সেই খেলা অনেক কঠিন, অনেক ভয়ঙ্কর। এবং, সেই খেলায় তাদের গুরুদেব অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ফুলের ঘ্রাণ বুক ভরে একবার টেনে নিল জীবসিদ্ধি। পাখির ঝাঁক ধীরে ধীরে ফিরে চলেছে তাদের বাসায়। গাছে গাছে পাখিরা ফিরে আসছে একে একে। পরিস্থিতি অনুকূল হলে আজকের সন্ধেটা অত্যন্ত মনোরম হত নিঃসন্দেহে। চাণক্যর দিকে চাইল জীবসিদ্ধি। তিনি একইভাবে অপলক দৃষ্টিতে ডুবন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর বুকের উপর এসে পড়া কেশশিখায় অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হস্তচালনা করছেন। চিন্তামগ্ন তিনি।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিষ্যর পাশেই পাথরের বেদিতে বসলেন চাণক্য।

'গুরুদেব। কিছু আশার আলো পেলেন?'

চাণক্য উপর-নীচে ঘাড় নেড়ে বললেন,

'হুম। আলো তো আছেই। কিন্তু, তা শেষ পর্যন্ত আশার না নিরাশার কারণ হবে, সেটাই সবথেকে বড়ো প্রশ্ন।'

‘অর্থাৎ?’

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন চাণক্য,

‘তোমার কী মতামত এই পুরো বিষয়ে? রাজকুমারীকে কে হত্যার চেষ্টা করেছে?’

একবার কেশে, গলা পরিষ্কার করে জীবসিদ্ধি বলল,

‘আপনি সবসময়েই বলে থাকেন যে, সাধারণত সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যাটিই সঠিক হয়ে থাকে। পূর্বেও বহুবার তার প্রমাণ পেয়েছি আপনার সঙ্গে থেকে। সেই হিসাবেই আমি নিশ্চিত যে, বিষ কৃষ্ণকলি নামক যুবতীটিই মিশিয়েছিল রাজকুমারীর পানীয়ে।’

‘তাতে তার উদ্দেশ্য কী?’

‘তার নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে আমি মনে করি না। সম্ভবত তাকে কেউ এই কাজ করতে নিয়োগ করেছে। অর্থের বিনিময়ে বা অন্য কিছুর বিনিময়ে। তাই তাকে হত্যা করা হল। কারণ সে মুখ খুললে সমস্যা হবে তার নিয়োগকারীর।’

‘হুম। তাকে যে হত্যাই করা হয়েছে সেটা নিশ্চিত কীভাবে হচ্ছ?’

মৃদু হেসে জীবসিদ্ধি বলল,

‘আচার্য, লোকসম্মুখে অস্বীকার করলেও, এ যে হত্যা সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মৃতদেহের পতনের ভঙ্গি দেখলেই অনুমান করা কঠিন নয় যে, তাকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে।’

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন চাণক্য। জীবসিদ্ধি বলল,

‘মগধেরই কেউ এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে, এ সম্ভাবনা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আচার্য। আপনার কী মনে হয়, কার কথায় কৃষ্ণকলি বিষ মিশিয়েছে রাজকুমারীর পানপাত্রে?’

চাণক্য এইবার জীবসিদ্ধির মুখপানে চেয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন,

‘ওহে, জীবসিদ্ধি। আমি অন্তত একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে রাজকুমারীকে হত্যার উদ্দেশ্যে, রাজকুমারীর পানীয়ে তার সখী কৃষ্ণকলি বিষ মেশায়নি।’

চাণক্যর কথায় বিস্মিত হয়ে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

‘আপনি কীভাবে এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন, আচার্য?’

‘সামান্য যুক্তি দিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারবে কারণটা। কৃষ্ণকলি এবং মধুবন, দু-জনেই রাজকুমারীর বাল্যসখী। তারাও রাজমহলেই তাদের মেয়েবেলা কাটিয়েছে। অর্থাৎ রাজ রীতিনীতি, আচার-আচরণের সঙ্গে তারা অতিপরিচিত। তাই তারা ভালোভাবেই জানত যে, রাজকুমারী কখনোই সুরাপান করেন না। তাই তারা কখনোই রাজকুমারীর

পানপাত্রে, সোমের বদলে ভুল করে সুরা দেওয়া হয়েছে দেখেও তাতে বিষ মেশাবে না। তাই নয় কি?’

জীবসিদ্ধি চুপ করে গেল। সে এভাবে ভেবে দেখেনি। কৃষ্ণকলিকে দোষী ধরে নিয়েই জীবসিদ্ধি তার বাকি যুক্তিগুলো সাজিয়েছিল। কিন্তু, প্রথমেই সেটি ভুল প্রমাণিত হওয়ার ফলে সে চতুরঙ্গের প্রথম দানেই ফিরে এসেছে। তাকে পুনরায় বিচার ভাবনা করতে হবে পুরো বিষয়টা নিয়ে।

‘অর্থাৎ, বিষ এমন কেউ মিশিয়েছে, যে রাজকীয় আচার-আচরণের সঙ্গে পরিচিত নয়। সেক্ষেত্রে তো সন্দেহ দাসস্থানীয় কারুর উপরেই যায়। ভুবন?’

‘সে যদি বিষ প্রয়োগ করে থাকত, তবে তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না। মনে রেখো, রাজকুমারীর কক্ষে ভোজনাদি রেখে আসার বহু পরে তা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তাঁরা। এতক্ষণে ভুবন সহজেই রাজমহল ত্যাগ করে পলায়ন করতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। সে এখনও মহলেই আছে।’

‘জীমূতবাহন? সে রাজকীয় খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে অবগত হলেও, সে নিজেই স্বীকার করেছে যে তার মনে হয়েছিল যে হয়তো নন্দকুলের রাজকুমারী সুরাপান করে থাকেন। জীমূতবাহন সেই ভেবেই বিষ দিয়ে থাকতে পারে পানীয়ে।’

‘হুমম। সে-ই সব কিছুর দায়িত্বে আছে। খাদ্যপরীক্ষককে ফাঁকি দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাকেও আমার সন্দেহ হয় না।’

‘কেন?’

‘তাকে প্রশ্ন করার সময় তাকে জানানো হয়নি যে, রাজকুমারীকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। সে দোষী হলে, তার বাচনভঙ্গি, হাবেভাবে তা প্রকাশ পেত। তুমি তো জানোই, জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে প্রত্যেকের ভাবভঙ্গি আমি লক্ষ করি। বার বার চোখের পলক ফেলা, অশান্ত ভঙ্গি, হাতের তালু ঘর্মাক্ত হওয়া এগুলো সবই অপরাধীর লক্ষণ"। যদিও একজন পেশাদার অপরাধীর মধ্যে এগুলো প্রকাশ পায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে জীমূতবাহন একজন সুপ্রতিষ্ঠিত খাদ্য-বিশেষজ্ঞ। তাকে যখন সেই বিশেষ মধু-পানীয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, তার মধ্যে রীতিমতো উৎফুল্লতা প্রকাশ পাচ্ছিল। অর্থাৎ, হয় সে নির্দোষ, অথবা, একজন দক্ষ খাদ্যবিশেষজ্ঞের চেয়েও দক্ষতর অভিনেতা।’

জীবসিদ্ধি ভেবে বলল,

‘আজ সকালেও তার সঙ্গে আমার খাদ্য বিষয়ে কথা হয়েছে। সে প্রকৃতই খাদ্য বিষয়ে অতি উৎসাহী একজন মানুষ। আপনি ঠিকই বলেছেন।’

গালে হাত দিয়ে বসল জীবসিদ্ধি। বলল,

'তাহলে বাকি রইল তিনজন। তিন অতিথি। তাই তো?'

'না হে, জীবসিদ্ধি। তিন নয়। চারজন।'

'চারজন?'

'হুম। চারজন।'

জীবসিদ্ধির বিস্ময় বেড়েই চলেছে। কার কথা বলছেন চাণক্য?

জীবসিদ্ধির মনের প্রশ্ন অনুমান করেই চাণক্য উত্তর দিলেন,

'ধৈর্য ধরো হে, জীবসিদ্ধি। চতুর্থ সন্দেহভাজন ব্যক্তির কথায় পরে আসছি। আপাতত প্রথম তিনজনের অবস্থানগুলো একে একে বিচার করা যাক। রাজকুমারীকে হত্যার কী উদ্দেশ্য তাদের থাকতে পারে তা একে একে বিচার করা যাক।'

'বেশ। প্রথমেই তাহলে শুরু করা যাক...'

হাত তুলে জীবসিদ্ধিকে বাধা দিয়ে চাণক্য বললেন,

'ওহে জীবসিদ্ধি, চলো আগে কক্ষে ফিরি। আমার কণ্ঠ যে শুষ্ক হয়ে পড়েছে। অন্ধকারও হয়ে এসেছে।'

---

*জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে সামনের জনের ভাবভঙ্গি থেকে অপরাধী কে তা অনুমান করার পদ্ধতির উল্লেখ অর্থশাস্ত্রতেই আছে।

১৩.

সারা রাজমহল আলোয় সেজে উঠেছে। প্রতিটি ঝাড়বাতি জ্বলছে, প্রতিটি জানলায় আর বারান্দায় সারি বেঁধে প্রদীপ জ্বলছে। এই রূপে কোনোদিন এই প্রাসাদ সেজে উঠতে দেখেনি জীবসিদ্ধি।

কিন্তু তবুও আফশোস হল জীবসিদ্ধির। আফশোস হল দুটি নারীর জন্যে, যারা আজকেই মারা গিয়েছে। হত্যা করা হয়েছে। অথচ কেউ তাদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি। না, একজন করেছেন। নিশ্চয়ই করেছেন। রাজকুমারী দুর্ধরা।

আচ্ছা, তিনি কি এই বিবাহ করবেন? তাঁর দুই সখীর মৃত্যুর পর তিনি যদি রাজি না হন, তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি রাজি হবেন না। তখন? কী করবেন আচার্য চাণক্য? জোর করবেন? একজন শোকাহত নারীকে তিনি ক্ষমতাবলে বিবাহ

দেবেন তাঁর মতের বিরুদ্ধে গিয়ে? হ্যাঁ, চাণক্য তা পারেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে এই মানুষটা পাষাণের মতো কঠিন হতে পারেন।

কক্ষে ঢুকে চাণক্য কিছুটা জল পান করে নিজের আসনে বসলেন। তাঁর মুখোমুখি আসনে বসল জীবসিদ্ধি।

জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

'আচার্য, আর সময় বেশি নেই।'

'হুম।'

'এই বিবাহ কি এই পরিস্থিতিতে সত্যই সম্ভব?'

বিষণ্ণ লাগল চাণক্যকে। বললেন,

'আমি জানি না হে, জীবসিদ্ধি। সত্যি বলতে, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই বিবাহ - নিয়ে আমার মনেও সংশয় জাগছে। আমি নিশ্চিত নই যে, এই বিবাহে আমার আর মত আছে কি না।

অবাক হল জীবসিদ্ধি।

'সে কী? এই বিবাহ তো আপনার উৎসাহেই হচ্ছে! আপনি এই কথা বলছেন, আচার্য?'

উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন চাণক্য। কিছুক্ষণ বাদে উঠে দাঁড়িয়ে কক্ষের মধ্যেই পদচালনা শুরু করলেন।

'ওহে, জীবসিদ্ধি।'

'বলুন, আচার্য।'

'এসো, সন্দেহভাজনদের নিয়ে আলোচনা করা যাক। তোমার সঙ্গে আলোচনায় এর পূর্বেও বহুবার অপ্রত্যাশিতভাবেই সমাধানসূত্র বেরিয়ে এসেছে। দেখা যাক এইবারও তার পুনরাবৃত্তি হয় কি না।'

কথাটা মিথ্যে নয়। বহুবার এভাবেই গুরু-শিষ্য কথোপকথনের মাঝেই চাণক্য সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। হঠাৎ কোনো একটি ঘটনা বা নামের উল্লেখ বা জীবসিদ্ধির উচ্চারণ করা কোনো শব্দের থেকে চাণক্য খুঁজে পেয়েছেন রহস্যের রুদ্ধদ্বারের চাবি। কিন্তু তা নিয়ে জীবসিদ্ধি মোটেই গর্বিত নয়। কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো ঘটেছে জীবসিদ্ধির অজান্তেই। বরং, সে কোনোবারই সঠিক সমাধানসূত্র নিজে খুঁজে পায়নি। সে নিজে চাণক্যর আস্থাভাজন দুর্ধর্ষ গুপ্তচর হতেই পারে, কিন্তু অনুধাবন ক্ষমতায় চাণক্যর

সমতুল্য কেউ নেই। মাঝে মাঝে জীবসিদ্ধির মনে সংশয় জাগে যে, তার গুরুদেবের পারদর্শিতা অর্থশাস্ত্রে অধিক, নাকি, অনুধাবন-শাস্ত্রে?

জীবসিদ্ধি একবার দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বলল,

'বেশ। প্রথমেই আসা যাক প্রাক্তন অমাত্য রাক্ষসের বিষয়ে। সে-ই ছিল রাজকুমারীর কক্ষে আজকে প্রথম অতিথি। সে বুদ্ধিমান, দুর্ধর্ষ, সাহসী এবং এই বিবাহের বিপক্ষে। ধনানন্দর সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষ। কিন্তু আমার কানে এই সংবাদও এসে পৌঁছেছে যে ইদানীংকালে তার সঙ্গে ধনানন্দর মতবিরোধ ঘটছে। রাজ্য হারিয়ে ধনানন্দর মস্তিষ্কের ঠিক-ঠিকানা নেই। আগেও যে ছিল তা নয়, তবে ইদানীং কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি প্রতিশোধ ছাড়া কোনো চিন্তাই করছেন না। আর তাতেই মতের অমিল হচ্ছে রাক্ষসের সঙ্গে। কিন্তু তাতে রাজকুমারীকে হত্যা করে তাঁর কী লাভ?'

উত্তর চাণক্য দিলেন,

'রাক্ষস গত কয়েক বছর ধরেই আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুনে ইন্ধন ঢেলে চলেছেন তা আমাদের অজানা নয়। তুমি ধরেই নিচ্ছ কেন যে তিনি মগধের সিংহাসন ধনানন্দর জন্যেই ফেরত পেতে চাইছেন?'

'অর্থাৎ? বুঝতে পারলাম না আপনার কথা, আচার্য।'

'ওহে, জীবসিদ্ধি। রাজনীতিতে কেউ কারুর স্থায়ী শত্রু বা মিত্র হয় না। হতেই পারে যে, এতদিন পরোক্ষভাবে মগধ পরিচালনা করার পর, রাক্ষসের মনে স্বয়ং সম্রাটের সিংহাসনে বসার সাধ জেগেছে। কে বলতে পারে? হয়তো তিনি বিদ্রোহের সুযোগে নিজের জন্যে মগধ ফেরত পেতে চান। আর সেই কারণেই ধনানন্দ এবং তার অনুগত রাক্ষসের সম্পর্কে এই ফাটল।'

জীবসিদ্ধি বিস্মিত হল। সে কখনোই এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেনি। তবে সে নিশ্চিত, চন্দ্রগুপ্তর মস্তিষ্কে এরকম সম্ভাবনা এসেছে। রাজনীতিতে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যর যোগ্য উত্তরসূরি বটে। এইসব বিষয়ে চন্দ্রগুপ্তর মস্তিষ্ক চাণক্যর ছাত্রদের মধ্যে বরাবরই সবচেয়ে এগিয়ে। সেই কারণেই তাঁকে সম্রাট নির্বাচন করেছিলেন আচার্য।

চাণক্য বলে চলেছেন,

'এইবার পরিস্থিতি বিবেচনা করো। যদি রাক্ষসের মনে নিজের জন্যে মগধের অভিলাষ থেকে থাকে, তবে এই বিবাহ তার লক্ষ্যের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হতে চলেছে। চন্দ্রগুপ্তর আসন আরও শক্ত হবে এই বিবাহে। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে রাজকুমারীকে হত্যার চেষ্টা করাটা কি খুব অস্বাভাবিক?'

'কিন্তু, আচার্য। রাক্ষস রাজকুমারীকে নিজের কন্যাসমা বলেন।'

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে চাণক্য বললেন,

'আবারও বলছি, রাজনীতিতে কোনো সম্পর্কই চিরস্থায়ী নয় হে, জীবসিদ্ধি।'

জীবসিদ্ধি চুপ করে গেল।

চাণক্য বলে চললেন,

'এইবার আসা যাক ধনানন্দর প্রসঙ্গে। সে প্রতিশোধে অন্ধ। এদিকে তার হাতে ক্ষমতা নেই। পূর্বে অন্তত সৈনিকদের কাছে তার কথাই আদেশ ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে রাক্ষসের মানমর্যাদা এবং ক্ষমতা ধনানন্দর চেয়ে অধিক। সৈনিকরা তার কথা শুনতে বাধ্য নয়। তার মস্তিষ্কের স্থিরতা নিয়েও প্রশ্ন জাগছে অনেকের মনে। তার পক্ষে কি মরিয়া হয়ে নিজের কন্যাকে হত্যা করার চেষ্টা খুব অসম্ভব?'

'আপনার কী মনে হয়?'

অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে দু-দিকে মাথা নাড়লেন চাণক্য। বললেন,

'না। এই বিষয়টাতেই আমার সন্দেহ আছে। রাক্ষস যেখানে আবেগহীন, ধনানন্দ মোটেই তা নয়। যে যতই হীন ব্যক্তিত্বের হোক না কেন, সে একজন পিতা।'

'অর্থাৎ, ধনানন্দকে বাদ দেওয়া যায়। সে কখনোই পানীয়ে বিষ মিশিয়ে নিজের কন্যাকে হত্যার চেষ্টা করবে না।'

'কথাটা আংশিক সত্য।'

'আংশিক? কেন?'

চাণক্য এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে পরের জনের কথায় চলে গেলেন, 'এইবার আসা যাক তৃতীয় ব্যক্তির বিষয়ে। পর্বতকা মলয়কেতু। তার অবস্থান আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে অস্পষ্ট। বা, বলা চলে, তারই অবস্থান সবচেয়ে অধিক স্পষ্ট। সে একজন মাংসলোভী শৃগাল বিশেষ। ধূর্ত এবং যেখানে তার লাভ, সে তারই পক্ষে। সে শত্রুপক্ষের কথায় এই কাজ করে থাকতেই পারে।'

'কিন্তু তার কি এতটা সাহস আছে?'

'মনুষ্যচরিত্র বড়ো বিচিত্র বস্তু, জীবসিদ্ধি। এ বড়োই দুরূহ ও জটিল। আমি নিশ্চিত অদূর ভবিষ্যতে মনুষ্যের মনস্তত্ত্ব নিয়ে শাস্ত্রের কোনো একটি শাখা জন্ম নেবে। মানুষের মনকে এত সহজে বুঝে নেওয়া যায় না। কার পক্ষে কী সম্ভব আর কোনটা অসম্ভব তা এত জোর দিয়ে কখনোই বলা যায় না।'

জীবসিদ্ধি হতাশ ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

'অর্থাৎ আমরা সকালে যেখানে ছিলাম, এখনও সেখানেই আছি। সকলেই সম্ভাব্য হত্যাকারী। কিন্তু সেই ব্যক্তিটি কে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।'

চাণক্য একটি প্রদীপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেটির আগুন উসকে দিতে দিতে বললেন,

‘অবশ্যই স্পষ্ট।’

আবারও চমকে উঠল জীবসিদ্ধি। এই নিয়ে আজকে বহুবার চমকেছে সে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল জীবসিদ্ধি,

‘অর্থাৎ? আপনি জানেন কে বিষ প্রয়োগ করে হত্যার চেষ্টা করেছিল রাজকুমারীকে?’

প্রদীপ থেকে হাতে লাগা তেল একটি কাপড়ে মুছতে মুছতে চাণক্য উত্তর দিলেন,

‘না। তবে বিষ কে মিশিয়েছে সেটা আমি জানি। আগের প্রহরেই সেটা অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। কিন্তু রাজকুমারীকে হত্যার চেষ্টার বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।’

‘আচার্য! আপনি কী বলতে চাইছেন আমার কাছে স্পষ্ট নয়। পুরোটাই হেঁয়ালির মতো ঠেকছে। আপনি যদি সেই ব্যক্তির নাম জানেনই, তবে আমরা এখানে কীসের অপেক্ষা করছি? তাকে এখনই বন্দি কেন করছি না?’

মৃদু হেসে আবার পদচালনা শুরু করলেন চাণক্য। উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তখনই দ্বারের বাইরে কারুর আগমনের কথা জানাল রক্ষী।

কক্ষে ভুবন নামের ভৃত্যটি প্রবেশ করল। তার হাতে একটি ভূর্জপত্রের অংশ। দুই ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানিয়ে হাতের ভূর্জপত্রটি এগিয়ে দিল তার নিকটে থাকা জীবসিদ্ধির দিকে।

‘জীমূতবাহন মহাশয় এইটা আপনাদের দিতে বলেছেন। আমি আগেও দু-বার এটা আপনাকে দিতে এসেছিলাম, আপনারা নেই দেখে ঘুরে গিয়েছি।’

জীবসিদ্ধি ভূর্জপত্রটি নিয়ে দেখল তাতে পর পর খাদ্যের নাম লেখা আছে। পত্রের উপরে নাম লেখা রাজকুমারী দুর্ধরার এবং নন্দর শিলমোহর দেওয়া তাতে। এটি রাজকুমারী দুর্ধরার খাদ্যতালিকা।

দাসটিকে বিদায় দিয়ে দ্রুত পড়তে থাকল জীবসিদ্ধি। প্রয়োজনীয় অংশে, অর্থাৎ পানীয়ের তালিকা পাঠ করে জীবসিদ্ধি বলল,

‘আচার্য, জীমূতবাহন মিথ্যে বলেননি।’

‘হুমম। জানি। এতে সোম নয়, সুরা লেখা আছে। তাই তো?’

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ। ভুল নন্দদের তরফেই হয়েছে।’

‘ভুল? তুমি নিশ্চিত?’

‘আপনি কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন, আচার্য?’

মৃদু হেসে চাণক্য বললেন,

‘ওহে, জীবসিদ্ধি। তোমায় বলেছিলাম না? সন্দেহের তালিকায় চতুর্থ একজন আছেন? বলতে পারো সে ব্যক্তি কে?’

‘আজ্ঞে, না। সকলের কথাই আমরা একে একে বিচার করেছি। কে আপনার সন্দেহের তালিকার চতুর্থ ব্যক্তি?’

পদচালনা থামিয়ে জীবসিদ্ধির দিকে চেয়ে চাণক্য বললেন,

‘স্বয়ং রাজকুমারী দুর্ধরা!’

---

*পর্বতকা— পার্বত্য প্রদেশের শাসক

১৪.

জীবসিদ্ধি কয়েক মুহূর্ত বজ্রাহতর মতো স্থাণু হয়ে রইল। নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না সে। আচার্য কি একটু আগে সেটাই বললেন যেটা সে শুনল?

হতবাক ভাবটা কাটিয়ে উঠে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

‘আচার্য? আপনি কী বলতে চাইছেন? রাজকুমারী দুর্ধরা নিজের পানীয়ে, নিজেই বিষ মিশিয়েছিল?’

‘একথা আমি বলিনি।’

‘আপনি একটু পূর্বেই তাই বলেছেন।’

‘না। আমি বলেছি সন্দেহের তালিকায় তাকেও রাখা যায়। কারণ আজকের সমস্ত ঘটনায় তার লাভ সবচেয়ে অধিক।’

‘আপনি পুনরায় হেঁয়ালি করছেন, আচার্য! আপনি বলতে চাইছেন রাজকুমারী আত্মহননের অভিপ্রায় নিয়ে বিষ মিশিয়েছিলেন?’

‘না। আমি তা বলছি না। আমি যা বলতে চাইছি সেটা আগে পুরোটা শুনে নাও। তারপর বিচার করো নিজেই যে, আমার কথা যুক্তিহীন মনে হচ্ছে কি না।’

পদচালনা থামিয়ে চাণক্য জীবসিদ্ধির মুখোমুখি আসনে এসে বসলেন। বললেন,

‘রাজকুমারী দুর্ধরা একজন অসম্ভব বুদ্ধিমতি এবং দৃঢ়সংকল্প নারী। আশা করি তার চরিত্রের এই বিশেষত্ব তোমার নজর এড়িয়ে যায়নি?’

‘হ্যাঁ। সেটা ঠিক। কিন্তু তিনি কেন বিষ মেশাবেন নিজেরই পানপাত্রে? এ যে অসম্ভব!’

‘তাই কি? একবার ভেবে দেখো তো, জীবসিদ্ধি। রাজকুমারীর খাদ্যতালিকায় সোমের পরিবর্তে সুরা লেখাটা কি সত্যিই নিছক ভুলমাত্র? এমন নয় তো যে, কেউ জেনে-বুঝে এই কাজটি করেছে? সেই ব্যক্তি দুর্ধরা হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?’

‘তার মানে...’

কথা শেষ করল না জীবসিদ্ধি। চাণক্য সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন,

‘হুম। একবার তার অবস্থানটা বিবেচনা করো। সে বাধ্য হয়েছে এই বিবাহে সম্মতি দিতে। নিজের পরিবারের সুরক্ষার কথা ভেবে তাকে সেই ব্যক্তির স্ত্রী হতে হচ্ছে, যার কারণেই তার পিতার সমস্ত দুর্দশা। এই বিবাহ সে কোনোদিনই মন থেকে যে মেনে নেয়নি এটা অনুমান করা কঠিন নয়। এহেন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সে কতটা মরিয়া সেটাই প্রশ্ন। আশা করি, এইবার তুমি আমার দ্বিধার জায়গাটা অনুধাবন করতে পারছ?’

জীবসিদ্ধি অনুধাবন করতে পারছে। আর যতই ভাবছে ততই তার মনে সন্দেহের কালো মেঘ আরও ঘন হয়ে উঠছে। প্রতিটি ঘটনা মিলে যাচ্ছে তার মনে।

রাজকুমারী দুর্ধরা নিজেই যদি খাদ্যতালিকায় সোমের জায়গায় সুরা লিখে থাকেন, তবে সেটির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তাঁর কখনোই সেই পানীয় নিজে পান করার উদ্দেশ্য ছিল না। ভৃত্য সেই পানীয় তাঁর কক্ষে রেখে যাওয়ার পর, কোনো এক সুযোগে তিনি নিজেই তাতে বিষ মিশিয়েছেন। তিনি তাতে বিষ মিশিয়েছিলেন তাঁর সখীর জন্যে! সোমের পরিবর্তে সুরা দিয়ে যাওয়ায়, তিনি অজুহাত পেয়ে গেলেন সেটি নিজে পান না করে তাঁর দুই সঙ্গীর একজনকে তা পান করানোর।

একজন সখী মারা গেল। তিনি সকলকে জানালেন যে তাঁর পানীয়ে বিষ ছিল। তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে! এবং ভুলবশত তাঁর সখী মারা গিয়েছে।

দ্বিতীয় সখী নিশ্চয়ই রাজকুমারীকে সন্দেহ করেছিল। এবং, সেই কারণেই তাকেও রাজকুমারী দুর্ধরা নিজেই সরিয়ে দিলেন। নন্দদের সঙ্গে আসা কোনো বিশ্বস্ত সৈনিক বা নিজস্ব অঙ্গরক্ষককে দিয়ে এই কাজ করানো মোটেই কঠিন না।

সকলেই সন্দেহ করবে মগধকে। এবং, এর ফলে বিবাহ সম্পন্ন করা যাবে না। নিখুঁত পরিকল্পনা!

জীবসিদ্ধি আর ভাবতে পারছে না। ধনানন্দর কন্যা হিসাবে দুর্ধরার প্রতি তার মনে প্রথমে শুধুমাত্র ঘৃণাই ছিল। কারণ নন্দদের শাসনকালে, এই পাটলিপুত্রের বুকে গুপ্তচর বৃত্তি করার সময়ে সে নিজের চোখে মগধের দুর্দশা দেখেছে। অত্যাচারী ধনানন্দর প্রতি তার মনে তীব্র ঘৃণা জমেছে।

তাই তার কন্যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তর বিবাহের বিষয়ে তারও সমান আপত্তি ছিল। কিন্তু তার মন পরিবর্তিত হয় দুর্ধরার সঙ্গে সাক্ষাতে। রাজকুমারী দুর্ধরাকে সে সম্মানের চোখে দেখেছিল। তার মনে হয়েছিল যে, আচার্য মানুষ চিনতে ভুল করছেন না। এই কন্যা তার পিতার অনুরূপ নয়।

কিন্তু এখন জীবসিদ্ধি যতই ভাবছে, ততই নিজের মূর্খামিতে তার আফশোস হচ্ছে। এই সহজ ব্যাখ্যা সে দেখতে না পাওয়ার মতো অন্ধ কীভাবে হল?

জীবসিদ্ধি নিজের সম্মুখে বসা চাণক্যর দিকে চাইল। গম্ভীর মুখে চাণক্য বসে আছেন। তারই দিকে চেয়ে আছেন। তাঁকে উদাস লাগছে।

চাণক্য বললেন,

‘ওহে জীবসিদ্ধি, আমি মনে-প্রাণে চাইছি যেন আমার সন্দেহ অমূলক প্রমাণিত হয়। জীবনে এই প্রথমবার আমি চাই যেন ঈশ্বর আমায় ভুল প্রমাণ করেন। কারণ আমি জেনে-শুনে নিজের পুত্রসম শিষ্যর বিবাহ একজন হত্যাকারীর সঙ্গে কীভাবে দিই?’

জীবসিদ্ধি কিছু বলতে পারল না। নিজের মস্তিষ্ক থেকে রাজকুমারীর কথা সে সরাতে পারছে না। যতই ভাবছে ততই তার মনে আরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছে যে সম্পূর্ণ চক্রান্ত রাজকুমারীর।

আচার্য একটি বৃহৎ ভুল করতে চলেছিলেন চন্দ্রগুপ্তর প্রতি। যে নারী নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজের বাল্যসখীর বলি দিতে পারে, সে নিজের স্বামীর কণ্ঠে কৃপাণ চালাতেও দ্বিধা করবে না।

আচার্য চাণক্যকে শোনানোর মতো কোনো সান্ত্বনাবাণী জীবসিদ্ধির কাছে নেই। দৃঢ়কণ্ঠে জীবসিদ্ধি বলল,

‘এ বিবাহ হয় না, আচার্য। আর কোনোভাবেই হয় না। আমাদের পক্ষ থেকেই এই বিবাহ স্থগিত করা হোক এইবার। আমি নিশ্চিত রাজকুমারীই বিষ মিশিয়েছেন নিজের পানীয়ে!’

চাণক্য কিছু বললেন না। শুধু জীবসিদ্ধির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি জীবসিদ্ধি পড়তে পারল না।

চাণক্য কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন।

জীবসিদ্ধি পুনরায় বলল,

'ভেবে দেখুন, আচার্য। সমস্ত ঘটনা আমরা শুধুমাত্র দুর্ধরার মুখেই শুনেছি। সে যা বলেছে, তার কতটা মিথ্যা আর কতটা সত্যি তা আমরা জানি না। জানার কোনো উপায়ও নেই। কারণ তার কথার সত্যতার বিষয়ে যে দু-জন প্রমাণ দিতে পারত, যে দুই নারী তারই কক্ষে ছিল, তারা দু-জনেই মৃত!'

চাণক্যর ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে। তাঁর অন্তর্ভেদী দু-চোখের দৃষ্টি জীবসিদ্ধির উপর নিবদ্ধ।

জীবসিদ্ধি উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে চলেছে,

'পুরো ঘটনা ঘটার সময়ে কক্ষে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। পুরো ঘটনা আমরা দুর্ধরার মুখেই শুনেছি, এবং বিশ্বাস করেছি! আমি মূর্খ! মহা মূর্খ যে এতক্ষণ সত্যটা চোখের সম্মুখে থেকেও ধরতে পারিনি। ধনানন্দর কন্যা নিজেকে অতি বুদ্ধিমান ভাবে। কিন্তু তার এই পরিকল্পনা কখনোই সফল হবে না। তার বোঝা উচিত যে কারুর না কারুর মনে, আজ হোক বা কাল তার এই কাহিনির প্রতি সন্দেহের উদ্রেক ঘটবেই।'

উঠে দাঁড়ালেন চাণক্য। তাঁর ললাটের ভ্রূকুটি গভীর হয়েছে। দু-চোখ অসম্ভব উজ্জ্বল। এগিয়ে এসে জীবসিদ্ধির দু-কাঁধ চেপে ধরলেন। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললেন,

'কী বললে? কী বললে তুমি? তার কথার কোনো সাক্ষী নেই। তাই না? রাজকুমারীর কথার সত্যতার প্রমাণ দেওয়ার মতো কেউ কক্ষে ছিল না। তাই না? চাণক্যর আচরণে বিস্মিত হচ্ছে জীবসিদ্ধি। হঠাৎ কী হল আচার্যর?'

ধীরস্বরে বলল,

'হ্যাঁ, আচার্য! যুক্তি দিয়ে ভাবলে রাজকুমারীর উপর সন্দেহ হবেই! তার কথার সত্যতার প্রমাণ কী?'

'যথার্থ! যথার্থ বলেছ হে, জীবসিদ্ধি! কোনো দাস বা রক্ষী দেখেনি মধুবনকে রাজকুমারী দুর্ধরার পাত্র থেকে ঢেলে দেওয়া সুরা পান করতে। কেউ ছিল না কক্ষে।

জীবসিদ্ধিকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন চাণক্য। বললেন,

'ওহে জীবসিদ্ধি, প্রতিবারের মতোই এইবারও তোমাকে ছাড়া এই রহস্যের সমাধান হত না। এইবার এই রহস্যের যবনিকাপাতের সময় আসন্ন।'

দ্রুত কক্ষের দ্বার খুলে বাইরে বেরোলেন চাণক্য। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকদের উদ্দেশে বললেন,

'এই মুহূর্তে সম্রাটকে যথাশীঘ্র এই কক্ষে আসতে বলো। সঙ্গে ধনানন্দ, রাক্ষস, রাজকুমারী দুর্ধরা এবং কুমার মলয়কেতুকেও উপস্থিত হতে বলো এই কক্ষে। যত শীঘ্র সম্ভব যাও। যাও, যাও!'

কয়েক জন সৈনিক দ্রুত আলাদা আলাদা দিকে ছুটল। চাণক্য দ্বার খোলা রেখেই কক্ষে প্রবেশ করলেন পুনরায়। তাঁর ললাটে আর ভ্রূকুটি নেই। কিন্তু তাঁর দু-চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল। এ দৃষ্টি জীবসিদ্ধির অতিপরিচিত।

আচার্য চাণক্য রহস্যের সমাধান করে ফেলেছেন। এই দীর্ঘ রহস্যের শেষ অঙ্ক উপস্থিত।

১৫.

এই কক্ষটি অন্যান্য কক্ষের তুলনায় আয়তনে ছোটো। সেই কারণে মাত্র কয়েক জন মানুষ একসঙ্গে উপস্থিত হওয়াতেই কক্ষে ভিড় জমে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে জীবসিদ্ধির।

কক্ষের শেষ মাথায় বসে আছেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর পাশে দু-জন অঙ্গরক্ষক সৈনিক। গম্ভীর মুখে বসে আছেন তিনি। তাঁর পরনে এখন একটি গেরুয়া রেশমের ধুতি এবং গাঢ় সবুজ অঙ্গাবস্ত্র। মাথায় ধুতির সঙ্গেই মিল রেখে গেরুয়া উষ্ণীষ, যাতে একটি ময়ূরপুচ্ছ শোভা বৃদ্ধি করছে। তাঁর কণ্ঠে, বাহুতে এবং কর্ণে স্বর্ণালংকার।

তবে কক্ষে এই মুহূর্তে উপস্থিত অন্য দুই রাজপুরুষের তুলনায় তাঁরই অলংকার কম। ধনানন্দ এবং রাক্ষস পূর্বের বেশেই আছেন। ধনানন্দ মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বসে আছেন একটি আসনে। আজ সকাল থেকেই এই একই মুখের ভাব তাঁর। জীবসিদ্ধি নিশ্চিত নয় এটার কারণ মৌর্যদের আতিথেয়তা নাকি এটিই ধনানন্দর স্বাভাবিক মুখভঙ্গি। কারুর দিকে তাকাচ্ছেন না তিনি। খালি পূর্বের মতোই ঢিলে অঙ্গুরীয়টি মাঝে মাঝে আঙুল থেকে বার বার খোলা-পরা করছেন।

রাক্ষসকে দেখলে জড়বৎ প্রস্তরমূর্তি বলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্থিরভাবে তিনি বসে আছেন ধনানন্দর পাশের আসনে। মুখে যথারীতি তাঁর কোনো অভিব্যক্তি নেই। জীবসিদ্ধি লক্ষ করেছে, রাক্ষস চোখের পলকও খুবই কম ফেলেন। যে কারণে তাঁর মুখ দেখলে ভ্রম হয় যেন প্রস্তরখণ্ডে কোনো এক শিল্পী নাক-চোখ-মুখ খোদিত করেছে। এবং,

সে-শিল্পী মোটেই পটু নয়। কারণ মূর্তির মুখে সে কোনোরকম স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে।

এ ছাড়া অমাত্য কৃষ্ণনাথ আছেন। বৃদ্ধর অবস্থা করুণ। মানসিক চাপ আর তিনি নিতে পারছেন না। বার বার বিহ্বল দৃষ্টিতে চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য এবং জীবসিদ্ধির দিকে ক্রম অনুসারে চাইছেন।

চাণক্য বসে আছেন চন্দ্রগুপ্তর পাশের আসনে। দ্বিধাহীন ভঙ্গিতে মধু আর গুড় মিশ্রিত সেই বিশেষ পানীয়টির চতুর্থ পেয়ালা শেষ করছেন। কক্ষের অন্যান্য সকলের ধৈর্যহীনতার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন।

জীমূতবাহনও উপস্থিত আছেন কক্ষে এবং তাঁর সঙ্গেই সেই ভুবন নামক ভৃত্যটিকেও উপস্থিত করা হয়েছে। তাঁরা দু-জন এই সভায় তাঁদের জরুরি তলবের কারণ বুঝতে অক্ষম। কারণ, কোনো ঘটনাই তাঁদের জানা নেই। তাঁদের মুখের ভাবেই তাঁদের বিহ্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। একদল গুরুত্বপূর্ণ রাজপুরুষের মধ্যে তাঁরা নিজেদের আরওই গুটিয়ে নিয়েছেন।

আর একদম কোণের একটি আসনে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার বৃথা চেষ্টা করছে মলয়কেতু। তার মনের ভাব অনুমান করতে জীবসিদ্ধির অসুবিধা হচ্ছে না। সে আর দ্বিতীয়বার চাণক্যর মুখোমুখি না হওয়ার বিনিময়ে নিজের অর্ধেক রাজ্যও দান করতে পারে সম্ভবত।

তবে এই মুহূর্তে, মলয়কেতুর চেয়েও বেশি অপ্রস্তুত যে দু-জন, তাঁরা হলেন স্বয়ং সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং রাজকুমারী দুর্ধরা।

দু-জনের এই প্রথম সাক্ষাৎ, যা হওয়ার কথা ছিল আরও অর্ধেক প্রহর পরে। বিবাহের পূর্বে বর-বধূর সাক্ষাতের নিয়ম নেই। কিন্তু যেখানে বিবাহই হচ্ছে না, সেখানে আর নিয়ম-রীতির তোয়াক্কা কোনো পক্ষই করেনি।

চন্দ্রগুপ্ত এবং রাজকুমারী দুর্ধরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন একে অন্যের থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখতে।

চাণক্যর ঠিক পাশের আসনেই বসে থাকা জীবসিদ্ধির মুখ থেকে একটা আফশোসের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। লাল বস্ত্রে অপরূপ সুন্দরী লাগছে দুর্ধরাকে। তাঁকে বলিষ্ঠ, সুপুরুষ চন্দ্রগুপ্তর পাশে রাজযোটকের মতোই মানিয়ে যেত। কিন্তু হায় রে নিয়তি! মিত্র চন্দ্রগুপ্তর জন্যে জীবসিদ্ধির করুণা হল।

পানপাত্রের মধু-পানীয় সবটুকু শেষ করে ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়ালেন চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তর দিকে চেয়ে বললেন,

'সম্রাটের আজ্ঞা হলে কয়েকটি কথা আমি উপস্থিত সকলের সম্মুখে বলতে চাই।'

চন্দ্রগুপ্ত মৃদু ঘাড় নাড়লেন একবার। চাণক্য প্রতি-উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজকুমারী দুর্ধরার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন,

'রাজকুমারী, এই কক্ষে উপস্থিত প্রায় সকলেই আজকের ঘটে যাওয়া অঘটনের কথা জানেন। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে ঘটনাটি সকলের থেকে গোপন রাখা হয়েছে এবং তাই উপস্থিত কয়েক জনের কাছে তা সম্পূর্ণভাবেই অজানা। আপনি কি দয়া করে ঘটনার সংক্ষেপ আরও একবার সকলের সম্মুখে বলবেন?'

রাজকুমারী দুর্ধরা কিছুটা দ্বিধা করলেও তা ঝেড়ে ফেলে বললেন,

'আজ দিনের বেলা আমার কক্ষে আহার সাজিয়ে দিয়ে যায় মগধের এক ভৃত্য। কিন্তু তারপরেই কক্ষে তিন অতিথি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসায় তা গ্রহণ করতে আমার এবং আমার... আমার সখীদের বিলম্ব হয়। আহার শুরুর আগেই আমি নিজের পানপাত্রে সুরা দেখতে পাই। আমি সুরা পান করি না। তাই আমার সখী কৃষ্ণকলিকে আমি পাঠাই আমার জন্যে সোম আনতে। কিন্তু এরই মধ্যে আমার পানপাত্রের সুরা পান করে ফেলে আমার অন্য সখী মধুবন। এবং, পলকের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। আমার অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি যে, আমার পানীয়ে বিষ প্রয়োগ করে কেউ বা কারা আমায় হত্যার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেই সুরা আমার পরিবর্তে মধুবন পান করার কারণে সেই বিষে তার মৃত্যু হয়েছে।'

জীবসিদ্ধি একবার সকলের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। জীমূতবাহনের মুখ 'হাঁ' হয়ে গিয়েছে এবং তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা দাসটি কেঁপে উঠেছে। মলয়কেতুর মুখের ভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না এই দূরত্ব থেকে। এ ছাড়া কারুরই ভাবভঙ্গিতে বিশেষ পরিবর্তন নজরে পড়ল না।

চাণক্য পুনরায় রাজকুমারীর উদ্দেশেই বললেন,

'আপনার কক্ষে একে একে যে তিন অতিথি এসেছিলেন তাঁদের নামগুলো সকলের জ্ঞাতার্থে আরও একবার দয়া করে বলে দেবেন।'

'আমার পিতা, আর্য কাত্যায়ন এবং মলয়কেতু।'

'হুম। এটা কি সত্যি যে খাদ্যনিরক্ষক এবং মগধের কর্মচারী ব্যতীত, আপনার খাদ্যে বিষ মেশানোর সুযোগ সেই অতিথিদেরও সমানরূপে ছিল?'

রাজকুমারী কিছুটা দ্বিধাভরে উত্তর দিলেন,

'হ্যাঁ।'

'এবং, আপনার দুই সখীরও সেই সুযোগ ছিল।'

‘হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যেখানে নিজেই সেই বিষের শিকার হয়েছে, অতএব তাকে আশা করি আপনি সন্দেহের তালিকা থেকে অব্যাহতি দেবেন?

দুর্ধরার কণ্ঠে তার ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি স্পষ্ট। চাণক্য উত্তর দিলেন,

‘অবশ্যই। কিন্তু এ ছাড়াও আরও একজনের পক্ষে আপনার পানীয়ে বিষ মেশানোর সুযোগ ও যথেষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। তাই নয় কি?’

প্রমাদ গনল জীবসিদ্ধি।

দুর্ধরার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

‘আরও একজন? কার কথা বলছেন আপনি?’

‘আপনার কথা বলছি, রাজকুমারী। অস্বীকার করতে পারবেন, যে, আপনার পক্ষে এই কাজ সহজেই করা সম্ভব? খাদ্যের দায়িত্বে থাকা জীমূতবাহন মহাশয়ের কাছে যে তালিকা আপনাদের পক্ষ থেকে এসেছে, সেটিতে স্পষ্টভাবে ‘সোম’-এর পরিবর্তে ‘সুরা’ লেখা রয়েছে আপনার খাদ্যতালিকায়। আমি যদি বলি যে, এটি অজান্তে ঘটে যাওয়া বিচ্যুতি নয় বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটি করা হয়েছে?’

‘আপনি কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন, আচার্য?’

‘এই বিবাহে আপনি বাধ্য হয়ে মত দিয়েছেন। এবং, এই আজীবনের ‘পাশ’ থেকে মুক্তি পেতে আপনি যেকোনো মূল্য দিতে পারেন। যদি আমি বলি, আপনিই নিজের সুরায় বিষ দিয়ে নিজের বাল্যসখীকে হত্যা করেছেন? এবং, এই কাণ্ডটি করতে আপনাকে আপনার দ্বিতীয় সখী কৃষ্ণকলি দেখে ফেলেছিল। তাই সে কাউকে কিছু বলতে পারেনি। ভয়ে পেয়ে পলায়ন করে। কিন্তু আপনি তাকেও হত্যা করলেন নিজস্ব বিশ্বস্ত সৈনিকের সাহায্যে। তাহলে আপনি কী বলবেন?’

কক্ষের অন্যদিক থেকে গর্জন শোনা গেল,

‘ব্রাহ্মণ! মুখ সামলে, ব্রাহ্মণ! ভুলে যাস না কার সঙ্গে কথা বলছিস! ও ধনানন্দর একমাত্র পুত্রী রাজকুমারী দুর্ধরা!’

বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই হুংকার স্বয়ং ধনানন্দর। জীবসিদ্ধি সতর্ক হয়ে নিজের কোমরে লুকোনো কৃপাণটির হাতলে আঙুল ছোঁয়াল। দু-জন রক্ষীও সতর্ক হয়েছে। কক্ষের প্রত্যেকে সোজা হয়ে বসেছে।

রাজকুমারী দুর্ধরার মুখে রক্তিমাভাব ফুটেছে। প্রবল ক্রোধমাখা দৃষ্টি হেনে চলেছেন চাণক্যর প্রতি।

চাণক্য বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, রাজকুমারীর চোখে চোখ রেখে পুনরায় প্রশ্ন করলেন,

‘বলুন, রাজকুমারী। আমি যদি বলি আপনিই দুইটি হত্যা করেছেন, তবে আপনি কী বলবেন আত্মপক্ষ সমর্থনে?’

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জোরে হেসে উঠলেন রাজকুমারী। বললেন,

‘তাহলে আমি বলব আপনি উন্মাদ! না না! উন্মাদ নয়। আপনি একটি নীচ শয়তান! আপনি একটি ধূর্ত শেয়াল! আমি মূর্খ যে, একমুহূর্তের জন্যে হলেও আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে, আপনি নিজের কথা রাখবেন এবং নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত দোষীকে খুঁজে বের করবেন। আমি ভুল ভেবেছিলাম! আপনি সত্যোদ্ঘাটনের নামে শুধুই প্রহসন করবেন তা আমার বোঝা উচিত ছিল। বাহ্, আচার্য কৌটিল্য! বাহ! আমি নিশ্চিত এরপর আপনি এটাও প্রমাণ করে দেবেন যে, আমিই সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর আহারেও বিষ দিয়েছি। আপনি নিজেও জানেন যে, কী অসম্ভব সুপরিকল্পিতভাবে আপনি সম্পূর্ণ কাহিনি সাজিয়েছেন। আপনি ভালোই জানেন যে, আমি এর বিরুদ্ধে কোনোই প্রমাণ দিতে পারব না। সম্পূর্ণ ঘটনার সময় কক্ষে আর কেউ ছিল না। আমার কথার সমর্থন করার মতো কেউ নেই জীবিত!’

‘ঠিক তাই। আপনার প্রতি সহজেই সন্দেহ গিয়ে পড়ে রাজকুমারী। আপনার বর্ণনা করা সম্পূর্ণ ঘটনার সত্যতার প্রমাণ দেওয়ার মতো কোনো সাক্ষী নেই। এবং, ঠিক সেই কারণেই আমি নিশ্চিত হতে পেরেছি যে, আপনি নির্দোষ!’

১৬.

চাণক্যর শেষ কথাটা শুনে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন রাজকুমারী। প্রশ্ন করলেন,

‘কী বললেন? কী বললেন আপনি?’

স্মিত হেসে চাণক্য বললেন,

‘আমি জানি আপনি নির্দোষ, রাজকুমারী।’

শুধু রাজকুমারী নন, হতচকিত হয়েছে সকলেই। তবে সবচেয়ে হতবাক হয়েছে জীবসিদ্ধি। তার ভ্রূ যুগল ললাটের পথে অনেকখানি উত্থিত। মুখ হতেও বিস্ময়সূচক শব্দ নির্গত হয়েছে তার।

এ কী বলছেন আচার্য চাণক্য? রাজকুমারী নির্দোষ? কিন্তু এই ধারণায় তিনি কীভাবে পৌঁছালেন?

চাণক্য জীবসিদ্ধির দিকে একবার চাইলেন। মৃদু হেসে সভার সকলের উদ্দেশে ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গিতে শুরু করলেন,

‘পরিস্থিতি বিচারে আমার মনে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল রাজকুমারী দুর্ধরার প্রতি। প্রথমে সন্দেহ ছিল হয়তো তিনি নিজেই বিষ মিশিয়েছেন নিজের সুরায়। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি নিশ্চিত হই যে, বিষ অন্য এক ব্যক্তি মিশিয়েছে। কে সেই ব্যক্তি এবং কীভাবে সেই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হলাম, সেকথায় আমি আসছি। কিন্তু তাতেও রাজকুমারীকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারছিলাম না। কারণ হতে পারে তিনি নিজের হাতে বিষ দেননি, কিন্তু তিনি যে হত্যাকারীর একজন অনুসঙ্গী নন তার নিশ্চয়তা কী? হতেই পারে যে, তিনিও এই চক্রান্তে অংশীদার। বিষ প্রয়োগকারীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা যে প্রবল!’

দুর্ধরার দিকে চেয়ে চাণক্য বললেন,

‘রাজকুমারীকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে, প্রকৃত অপরাধীকে আমি তাঁর সম্মুখে হাজির করবই। সেই অপরাধী তিনি স্বয়ং হলেও আমি সেই কথা রাখতাম। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম যখন কথোপকথনের মাঝেই জীবসিদ্ধি উল্লেখ করে যে, রাজকুমারীর জবানবন্দির কোনো সাক্ষী নেই। তিনি আমাদের যে ঘটনাসমূহের কথা বলেছেন, তা ঘটার সময়ে কক্ষে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না। আর সেখানেই আমি আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই।’

ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি ফুটেছে চাণক্যর। জীবসিদ্ধির মনে পড়ে যায়, ঠিক এই ভঙ্গিতেই তিনি তক্ষশিলায় ছাত্রদের পড়াতেন। এভাবেই তাদেরকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্রর কঠিন থেকে কঠিনতম বিষয়ও জলবৎ সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন।

চাণক্য বললেন,

‘আপনারা ভেবে দেখুন। যদি রাজকুমারী পূর্বেই জেনে থাকেন যে, তাঁর পানপাত্রে বিষ আছে এবং তিনি সেটি ব্যবহার করে নিজের সখীকে হত্যা করতে চলেছেন, তবে তাঁর পক্ষে কি এটাই স্বাভাবিক নয় যে, তিনি কক্ষে সেই মুহূর্তে সাক্ষী উপস্থিত রাখবেন? এবং, তা তিনি অতি সহজেই করতে পারতেন। তাঁর দ্বিতীয় সখী কৃষ্ণকলি কক্ষ ত্যাগ করলেও, তাঁর দ্বারের বাইরেই বেশ কয়েক জন সৈনিক ও দাস-দাসী উপস্থিত ছিল সেই সময়ে। যেকোনো অজুহাতে, তাদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে তিনি নিজের কক্ষে

সেই সময়ে ডেকে নিতেই পারতেন অনায়াসে। তাতে পুরো ঘটনাটি তৃতীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির চোখের সামনে সংঘটিত হত। পরবর্তীকালে সে রাজকুমারীর কথার সত্যতার প্রমাণ দিত। এবং, তাতে রাজকুমারী অতি সহজেই নিজের উপর থেকে সমস্ত সন্দেহের মেঘ সরিয়ে দিতে পারতেন।'

বিষয়টা সকলের মস্তিষ্কে প্রবেশ করার জন্যে কয়েক মুহূর্ত থামলেন চাণক্য। তারপর বললেন,

'কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার কোনো চেষ্টাই করেননি। অথচ, তিনি দোষী হলে সর্বপ্রথম তিনি সেটাই করতেন না কি? যেকোনো অপরাধীর সাধারণ প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে সাক্ষী রাখা। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে, যেখানে এত গভীর একটি ষড়যন্ত্র সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে, সেখানে এই সাধারণ সতর্কতা তিনি অবশ্যই অবলম্বন করতেন। নিঃসন্দেহে রাজকুমারী দুর্ধরা যেখানে একজন অসম্ভব বুদ্ধিমতী এবং স্থিরমস্তিষ্ক নারী। তাঁর পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনে যাবতীয় ব্যবস্থা সহজেই করে ফেলা সম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি সেরকম কিছুই করেননি। তাঁর কথার সত্যতার কোনো প্রমাণ নেই, কোনো সাক্ষী নেই। কেন? উত্তর সহজ। তার কারণ তিনি সত্যিই জানতেন না যে, পাত্রে বিষ আছে। কারণ তিনি নিরপরাধ।'

কক্ষের সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে চাণক্যর দিকে। পলক ফেলতেও ভুলে গিয়েছে সকলে।

চাণক্য পুনরায় বললেন,

'এখানে তর্ক করা যেতেই পারে, সে রাজকুমারী হয়তো সময় পাননি কাউকে ডাকার। বা, তাড়াহুড়োয় এটা হয়তো তাঁর নিছক ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি তা মনে করি না। তার কারণ, রাজকুমারীর পানীয়ে বিষ অনেক আগেই মেশানো হয়েছিল। বিষ মেশানোর পরেও বহুক্ষণ সময় সেই পানীয় এবং অন্যান্য আহারাদি অস্পৃষ্ট পড়ে ছিল। অর্থাৎ, রাজকুমারী এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত থেকে থাকলে, তাঁর কাছে যথেষ্ট সময় ছিল চিন্তাভাবনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার। আপনাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জানি, যে, আমি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছি যে, পানীয়ে বিষ অনেক আগেই মেশানো হয়েছে। সে-বিষয়েই আসছি এইবার।'

চাণক্য বললেন,

'এইবার আসা যাক সন্দেহের তালিকার দ্বিতীয় ব্যক্তির কথায়। রাজকুমারীর দ্বিতীয় সখী কৃষ্ণকলি। তার আচরণ পুরো ঘটনায় সবচেয়ে সন্দেহজনক এবং অস্বাভাবিক। রাজকুমারীর থেকেই আমরা জানতে পারি যে, কৃষ্ণকলি আজ সকালে হঠাৎ অন্যমনস্ক

হয়ে পড়েছিল। সকাল থেকে স্বাভাবিক থাকলেও, এর মধ্যেই তার সঙ্গে কোনো একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে সে চিন্তিত হয়ে গিয়েছিল। এবং, এও জানতে পারি যে 'সোম'-এর পরিবর্তে নিজের পানপাত্রে 'সুরা' দেখে রাজকুমারী প্রথমে মধুবনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর জন্যে সোমরস আনতে। কিন্তু, কৃষ্ণকলি নিজে থেকেই সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয় এবং দ্রুত স্থানত্যাগ করে। সেই মুহূর্ত থেকেই সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, অর্থাৎ ইচ্ছে করে পালিয়ে যায়। আমি কি সঠিক বলছি, রাজকুমারী?'

প্রশ্ন করে রাজকুমারীর দিকে চাইলেন চাণক্য। তাঁকে সমর্থন করে দুর্ধরা ঘাড় নাড়লেন।

চাণক্য পুনরায় সকলের দিকে ফিরে বলতে শুরু করলেন,

'বেশ, বেশ। অর্থাৎ, কৃষ্ণকলির আচরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে, সে জানত রাজকুমারীর পানীয়ে বিষ আছে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তবে কি সে-ই হত্যাকারী? তাতে আমার উত্তর: অবশ্যই নয়। যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ করা যাক একবার। তার উদ্দেশ্য যদি রাজকুমারীকে হত্যা করাই হত, তবে সে কখনোই পানপাত্রের 'সুরা'য় বিষ প্রয়োগ করত না। কারণ সে রাজকুমারীর বাল্যসঙ্গী। রাজপ্রাসাদেই তার জীবনের বেশিরভাগ অংশ কেটেছে এবং রাজ রীতি-নিয়ম, বিশেষ করে রাজকুমারী দুর্ধরার স্বভাবচরিত্র তার অজানা নয়। নিশ্চিতভাবেই কৃষ্ণকলির জানা ছিল যে, রাজকুমারী সুরাপান করেন না। অতএব, জেনেশুনে সে কখনোই সুরাভরা পানপাত্রে বিষ মেশাবে না। রাজকুমারীকে হত্যার উদ্দেশ্য থাকলে সে সহজেই বিষ পানীয়ের পরিবর্তে অন্যান্য যেকোনো আহারে মিশিয়ে দিত।'

আরও একবার বিরতি নিয়ে চাণক্য বললেন,

'কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায়, সে রাজকুমারীকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ দেয়নি? সে যদি এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে? হয়তো অন্য কারুর নির্দেশে সে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই পানপাত্রে বিষ মিশিয়েছিল, যাতে সেই বিষে মধুবনেরই মৃত্যু হয়? কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে সে ভয় পেয়ে পলায়ন কেন করবে? তাতে তো তার উপর সন্দেহ এসে পড়ছে! বরং, সে যদি সেইসময়ে রাজকুমারীর আশেপাশেই থাকত, তবে তো তার উপর সন্দেহ কম হত। তাকে তো রাজকুমারী নিজেও সন্দেহ করেনি। তবে সে পলাতকা হল কেন?'

চাণক্য থামতেই চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করল,

'আরও একটা প্রশ্ন আসছে। সে যদি নির্দোষ হয়েই থাকে, তবে পানীয়ে বিষ আছে জেনেও, সেই কথা কাউকে বলেনি কেন?'

‘যথাযথ প্রশ্ন, সম্রাট! তার এই আচরণের একটাই ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কৃষ্ণকলি হত্যাকারীকে পানীয়ে বিষ মেশাতে দেখে ফেলেছিল। এবং, সে-ব্যক্তি এমন কেউ যার নামে সে অভিযোগ করতে ভয় পেয়েছিল। এমনকী সে এই কথাটা রাজকুমারীকেও বলতে পারেনি। এই কারণেই আমার প্রাথমিকভাবে সন্দেহ হয়েছিল রাজকুমারীর উপর। কারণ কৃষ্ণকলি যদি রাজকুমারীকেই নিজের পাত্রে বিষ মেশাতে দেখে থাকে, সে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করবে রাজকুমারী আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে সে বাধা দিত। তাই না? কিন্তু কৃষ্ণকলি সেইরকম কিছুই করেনি। অর্থাৎ, পানীয়ে বিষ এমন কোনো ব্যক্তি মিশিয়েছে যার বিরুদ্ধে স্বয়ং রাজকুমারীর কাছেও মুখ খুলতে সে ভয় পেয়েছে। এবং, তারপরই যখন সেই পানীয় রাজকুমারী পান করতে অস্বীকার করেন, তখন সম্ভবত আমারই মতো তারও মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তারও মনে বিশ্বাস জন্মায় যে, রাজকুমারী নিজেই সেই বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই কৃষ্ণকলি ভয় পায় এবং পলাতকা হয়। কারণ সেই পরিস্থিতিতে কাউকেই সে আর বিশ্বাস করতে পারে না। এবং, কৃষ্ণকলি যে তাকে বিষ মেশাতে দেখে ফেলেছিল, এ তথ্য হত্যাকারীর অজানা ছিল না। সেই কারণেই সুযোগ বুঝে, কৃষ্ণকলিকে আমরা খুঁজে পাওয়ার পূর্বেই হত্যা করা হয়।’

কক্ষের প্রতিটা ব্যক্তির মুখে-চোখে উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছে। জীবসিদ্ধি নিজেও নিশ্বাস বন্ধ করে শুনে চলেছে আচার্যর বিশ্লেষণ।

চাণক্য একে একে উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন,

‘এইবার প্রশ্ন আসে, কে সেই ব্যক্তি?’

১৭.

বুকের উপর এসে পড়া দীর্ঘ কেশশিখায় হস্তচালনা করলেন চাণক্য। কক্ষে উপস্থিত একজন ব্যক্তিও সামান্যতম নড়ছেন না। শুধু উপরের ঝাড়বাতির আলোয়, শ্বেতপাথরের মেঝেতে তৈরি হওয়া দীর্ঘ ছায়াসমূহ মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে।

আরও একবার উপস্থিত প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চাণক্য শুরু করলেন,

‘এখানে উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তি সন্দেহের আওতায় পড়ে। আমরা একে একে প্রত্যেককে হত্যাকারী হিসাবে বিবেচনা করব এবং পরিস্থিতি তথা হাতে থাকা তথ্যের তদনুসারে বিশ্লেষণ করব। প্রথমেই আসি জীমূতবাহন মহাশয় এবং ভৃত্য ভুবনের কথায়।

তারা দু-জনই রাজকুমারীর খাদ্য ও পানীয়ের সংস্পর্শে এসেছে আজকে। তাদের দু-জনেরই সুযোগ ছিল বিষ প্রয়োগের। কিন্তু, তাদের মধ্যে জীমূতবাহন মহাশয় রাজকুমারীর কক্ষে প্রবেশই করেননি। অতএব, কৃষ্ণকলি তাকে বিষ মেশাতে নিজের চোখে দেখে থাকতে পারে না। অপরদিকে, ভৃত্য ভুবন রাজকুমারীর কক্ষে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু তার পক্ষেও কক্ষে এসে বিষ মেশানোর চেয়ে সহজ ছিল পাকশাল থেকে রাজকুমারীর কক্ষ অবধি আহার্য আনার পথে বিষ মেশানো। তাই নয় কি? তা ছাড়া, যদি ধরেও নিই যে, তাদের দুজনের মধ্যে কাউকে কৃষ্ণকলি বিষ মেশাতে কোনোভাবে দেখেও থাকে, তাহলে তার সে-বিষয়ে চুপ করে থাকার কোনো যুক্তি থাকে পারে না। সে তৎক্ষণাৎ এই কথা সকলকে জানিয়ে দিত নিঃসন্দেহে। অতএব যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ করলেই এই দু-জন ব্যক্তিকে সহজেই সন্দেহের তালিকা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া চলে।

জীবসিদ্ধি একবার জীমূতবাহন এবং ভুবনের দিকে দেখল। তাঁরা সম্ভবত আচার্যর কথা শুরুর পর থেকে এই প্রথমবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তাদের দুর্দশা দেখে, এই পরিস্থিতিতেও মনে মনে কৌতুক অনুভব করল জীবসিদ্ধি। এই দুই হতভাগ্য কিছুই না জেনে, নিজেদের অজ্ঞাতেই রাজ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। চাণক্য না থাকলে, তারা এত সহজে নিষ্কৃতি পেত কি না তা বলা কষ্টকর। কারণ রাজকীয় অপরাধের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়েই নির্দোষ কোনো এক সামান্য ব্যক্তির বলি হয়ে থাকে। কারণ বিনা বিচারে দুর্বলদের দণ্ড দেওয়ার রীতি সুপ্রাচীন।'

চাণক্য বলে চলেছেন,

'তাহলে বাকি রইল তিনজন। সকালে রাজকুমারীর কক্ষে আসা তিন অতিথি। প্রত্যেকেই একে একে কক্ষে এসেছিলেন আহার দিয়ে যাওয়ার পর। তাঁদের প্রত্যেকেই রাজকুমারীর পালঙ্কর সম্মুখের আসন গ্রহণ করেছিলেন। এবং উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক সেই আসনের পাশেই, মেজের উপরে আহার এবং পানীয় রাখা ছিল। রাজকুমারী নিজের প্রসাধন কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। অতএব প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ ছিল, রাজকুমারীর পানপাত্রে বিষ মিশিয়ে দিয়ে যাওয়ার।'

কক্ষের প্রত্যেকের দৃষ্টি এই মুহূর্তে তিন ব্যক্তির উপর পড়ল। চাণক্য কথা শুরু করতেই আবার প্রত্যেকের চোখ তাঁর দিকে ঘুরে গেল।

'প্রথমেই কক্ষে এসেছিলেন অমাত্য কাত্যায়ন। আমি পুনরায় একবার রাজকুমারীকে একটি প্রশ্ন করব। রাজকুমারী, আপনি দয়া করে আরও একবার স্মরণ করে বলুন যে, কাত্যায়ন আপনার কক্ষে থাকাকালীন আপনার সখীদের মধ্যে কোনজন আপনার কেশচর্চা করছিল এবং কোনজন আপনার মুখোমুখি বসে অঙ্গে প্রসাধন করছিল।'

দুর্ধরার দিকে চাইতে সে উত্তর দিল,

‘এ প্রশ্ন আপনি আমাকে আগেও করেছেন। যদিও এই প্রশ্নের গুরুত্ব আমি অনুধাবন করতে অক্ষম, কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি আরও একবার দিচ্ছি। আমার কেশ পরিচর্যা করছিল মধুবন এবং আমার সম্মুখে বসে ছিল কৃষ্ণকলি।’

‘হুম। আপনি নিশ্চিত তো?’

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ। আর্য কাত্যায়ন কক্ষে থাকাকালীন পুরো সময়টাই তাই অবস্থান ছিল দু-জনের।’

‘অতি উত্তম। এইবার তবে আমি সকলকে অনুরোধ করব, এই সময়ে রাজকুমারীর কক্ষে প্রত্যেকের অবস্থান মানসপটে চিত্রিত করুন। পালঙ্কে বসে আছেন রাজকুমারী, তাঁর পশ্চাতে বসে তার কেশচর্চা করছে মধুবন। তাদের মুখোমুখি, কিছুটা দূরত্বে রাখা আসনে বসে আছেন অতিথি এবং রাজকুমারীর একদম সম্মুখে, মেঝেতে বসে আছে কৃষ্ণকলি। অর্থাৎ, অতিথির দিকে পিছন ফিরে আছে কৃষ্ণকলি। আমি কি সঠিক বলছি, রাজকুমারী?’

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ।’

‘আর্য কাত্যায়ন, আমি কি সঠিক বলছি?’

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন রাক্ষস।

তাঁর সম্মতি পেয়ে চাণক্য বললেন,

‘অতি উত্তম। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কাত্যায়নের উপস্থিতির সম্পূর্ণ সময়টাই কৃষ্ণকলি তাঁর দিকে পিছন ফিরে ছিল। অর্থাৎ, যদি তিনি পানীয়ে বিষ মিশিয়ে থাকেন, তবে তা মধুবন বা রাজকুমারীর চোখে পড়ার সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু সে-ঘটনা কৃষ্ণকলির দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ, প্রায় অসম্ভব।’

প্রত্যেকের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। একমাত্র রাক্ষসের মনের ভাব তাঁর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই।

চাণক্য বলে চলেছেন,

‘এইবার আরও একবার আমায় স্মরণ করিয়ে দিন, রাজকুমারী। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অতিথি যখন আপনার কক্ষে ছিল, সেইসময়ে কি কৃষ্ণকলি এবং মধুবনের অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছিল?’

প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পেরেই উত্তর দেওয়ার পূর্বে দুর্ধরার ঠোঁট কেঁপে উঠল।

‘হ-হ্যাঁ!’

‘অর্থাৎ, ধনানন্দ এবং মলয়কেতু যে সময়ে আপনার কক্ষে ছিল, সেসময়ে কৃষ্ণকলি ছিল আপনার পশ্চাতে। তার দৃষ্টি বরাবর দু-জন অতিথি একে একে বসে ছিল। এবং, নিঃসন্দেহে এই দু-জন অতিথির মধ্যেই কোনো একজনকে সে রাজকুমারীর পানপাত্রে বিষ মেশাতে দেখেছিল।’

‘এ মিথ্যে! আ-আমি কিছুই জানি না! আমি কিছু করিনি!’

কক্ষের কোণ থেকে কথা, বা, বলা ভালো, আর্তনাদ ভেসে এল মলয়কেতুর।

চাণক্য বলে উঠলেন,

‘অতি উত্তেজনা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়, মহারাজ। আসন গ্রহণ করুন।’

‘আমি… আমি…’

‘আসন গ্রহণ করুন, মলয়কেতু!’

শেষ আদেশটা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর কণ্ঠ থেকে ভেসে এল। তাঁর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা মলয়কেতুর নেই। সে প্রায় ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডর মতোই খসে পড়ল আসনে। তার জীবনের শেষ আশার জ্যোতিটাও যেন কেউ ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছে।

তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চাণক্য পুনরায় মুখ খুললেন,

‘কিন্তু আবার একই প্রশ্ন এসে যায়। কুমার মলয়কেতুকে রাজকুমারীর পানীয়ে বিষ মেশাতে দেখলে, কৃষ্ণকলি কেন চুপ থাকবে? তা ছাড়া মলয়কেতুর কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে সে আমাদের পূর্বে জানিয়েছে যে, কৃষ্ণকলি বার বার তার দিকে ভীত দৃষ্টিতে চাইছিল। আসলে কুমারের বুঝতে সামান্য ভুল হয়েছে। কৃষ্ণকলি ভীত দৃষ্টিতে মলয়কেতুকে দেখছিল না। আসলে সে বারংবার ভয় মেশানো চোখে মলয়কেতুর পাশের মেজে রাখা রাজকুমারীর পানীয়ের স্বর্ণ-পেয়ালার দিকে চাইছিল। অর্থাৎ, এই সময়ে কৃষ্ণকলি জানত যে, পানীয়ে বিষ মেশানো আছে। কিন্তু, সব জেনেও তাকে চুপ থাকতে হয়েছে। ভয়ে এবং বিভ্রান্তিতে! একটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সে এতটাই হতচকিত হয়ে গিয়েছিল যে, তার করণীয় কী সেটাই সে বুঝে উঠতে পারেনি। কারণ কৃষ্ণকলি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে, একজন পিতা তার আদরের পুত্রীকে বিষ দিয়ে হত্যার চেষ্টা কেন করবে?’

১৮.

কক্ষের প্রতিটি চোখের দৃষ্টি এই মুহূর্তে ধনানন্দর উপর গিয়ে আটকেছে। ধনানন্দ নিজের আসনে বসে আছেন নিশ্চুপ। এই পুরো সময়টা তিনি অন্যদিকে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু, এইবার তিনি সোজাসুজি চাণক্যর চোখে চোখ রাখলেন।

আচমকা হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি। হাসি থামিয়ে বললেন,

'খল ব্রাহ্মণ! আমার পুত্রীকে নিজের কথার জালে জড়াতে না পেরে, এইবার আমাকে খুনি বলে নিজেদের পিঠ রক্ষার চেষ্টা? আমি আমার নিজের আদরের কন্যাকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছি? আরে, কেউ এই ব্রাহ্মণের চিকিৎসা করাও! রাজবৈদ্যকে ডেকে একে কিছু জড়িবুটি দিতে বলো। এর তো মস্তিষ্কবিকৃতি আছে। এ ব্রাহ্মণ যা খুশি বলে চলেছে যে!'

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

'নিজের কন্যাকে হত্যার উদ্দেশ্য তোমার কখনোই ছিল না, ধনানন্দ। সেই কারণেই তোমারই আদেশে রাজকুমারী দুর্ধরার পানীয়ের স্থানে 'সোম'-এর পরিবর্তে 'সুরা' লেখা হয়েছিল। কারণ ভালোভাবেই তোমার এ তথ্য জানা ছিল যে, ক্ষত্রীয় তথা রাজপরিবারের সদস্যরা সুরা পান করে না। রাজকুমারী দুর্ধরাও কখনোই এই পানীয় নিজে পান করতেন না এবং নিশ্চিতভাবেই তা তিনি নিজের কোনো এক সখী বা দাস-দাসীকে তা পান করতে দেবেন। সেই অন্য ব্যক্তি, সে যে-ই হোক না কেন, তার বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হতেই সকলেই ধরে নেবে যে, রাজকুমারীকে বিষ প্রয়োগের দ্বারা হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। দৈবাৎ তালিকায় পানীয়ের স্থানে ক্ষুদ্র একটু ভুলের কারণে তার প্রাণ রক্ষা হয়েছে। কেউ সন্দেহ করবে না যে, বিষ এই কারণেই 'সুরা' ভরতি পানীয়ে মেশানো হয়েছে, যাতে তা কোনোপ্রকারেই রাজকুমারী পান না করেন।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নিজের কেশশিখায় হস্তচালনা করে চাণক্য বললেন,

'রাজকুমারীর কক্ষে থাকাকালীন তুমি রাজকুমারীর চোখ এড়িয়ে তাঁর জন্যে সাজিয়ে রাখা বিশেষ স্বর্ণ পানপাত্রে বিষ ঢেলে দাও। কিন্তু রাজকুমারী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলেও, সেই মুহূর্তে রাজকুমারীর পশ্চাতে বসে তাঁর কেশসজ্জা করতে থাকা কৃষ্ণকলি তোমায় দেখে ফেলে। তুমিও তাকে দেখলে এবং ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বললে। সে বুঝতে পারল না কী ঘটছে! তবে কি ধনানন্দ তাঁর কন্যাকে হত্যা করতে চলেছেন? কিন্তু, তা যে অসম্ভব! কৃষ্ণকলি ভালোভাবেই জানে যে, রাজকুমারী দুর্ধরা তার



পিতার কতটা প্রিয়পাত্রী। তবে? কী মেশালেন তিনি? নিশ্চয়ই বিষ? কিন্তু, কেন? তাকে কেন চুপ থাকতে বললেন ধনানন্দ? সে মুখ খুললে কি তবে তার বিপদ হবে? সব মিলিয়ে কৃষ্ণকলি সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার কারণে ভুল করে ফেলে কাজে। ভীত দৃষ্টি বারংবার তার চলে যাচ্ছিল সেই সাজিয়ে রাখা পানপাত্রর দিকে। তার মনের অবস্থা সহজেই আমি অনুমান করতে পারছি। কিন্তু এরপরেই যখন রাজকুমারী নিজের পানপাত্রে সোমের পরিবর্তে সুরা দেখে তা বদলে দেওয়ার কথা বলে, তখন তার মনে সন্দেহ ঢোকে। তবে কি রাজকুমারী আর তার পিতা মিলে কোনো গূঢ় ষড়যন্ত্র রচনা করছেন? কিন্তু সে মুখ খুললে তো তারই বিপদ! অতএব সে কক্ষ ত্যাগ করার সুযোগ পেতেই দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে। আর সেখানেই সে করে ফেলে মস্ত ভুল!’

চাণক্য পুনরায় ধনানন্দর দিকে চেয়ে বললেন,

‘ধনানন্দর মুখেই শুনেছি আজকে দুপুরে, যে, তাঁর নিজের বিশ্বস্ত সৈনিকরা রাজকুমারীর কক্ষের বাইরে প্রহরারত ছিল। আমার ধারণা, ধনানন্দ রাজকুমারীর কক্ষ থেকে নিজে বেরিয়েই তাঁর বিশ্বস্ত সৈনিকদের নির্দেশ দেন যে, কক্ষ থেকে কৃষ্ণকলি বের হলেই যেন তাকে গোপনে হত্যা করা হয়। কৃষ্ণকলি নিজে লুকিয়ে থাকতে উত্তর মহলে গিয়েছিল, নাকি, ধনানন্দর সৈনিকরা তাকে ভয় দেখিয়ে জোর করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। অথবা, এও সম্ভব যে, কৃষ্ণকলি ধনানন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই নিজের মনের সন্দেহ দূর করার আশায় কক্ষ ত্যাগ করেছিল। কিন্তু, ধনানন্দর পক্ষে যে কোনোভাবেই তাকে জীবিত রাখা সম্ভব নয়! কারণ সে তার চক্রান্তের একমাত্র সাক্ষী। কৃষ্ণকলি মুখ খুললেই তার সমস্ত ষড়যন্ত্রের উপর থেকে পর্দা উঠে যাবে। তাই এমনই ব্যবস্থা নেওয়া হল, যাতে সে কোনোভাবেই না মুখ খুলতে পারে। তাকে সরিয়ে ফেলা হল এই পৃথিবী থেকে। একটি নয়, গত কয়েক প্রহরে দু-দুটি হত্যা করেছে ধনানন্দ। প্রথমটি নিজের হাতে, দ্বিতীয়টি নিজের বিশ্বস্ত সৈনিকের মদতে।’

ধনানন্দ পুনরায় বলে উঠলেন,

‘বাহ্ রে, কুটিল ব্রাহ্মণ! বাহ্! তুই যে এত দুর্দান্ত মনগড়া কাহিনি রচনা করতে পারিস তা তো জানা ছিল না। আমি মুগ্ধ! কিন্তু কী জানিস রে, কৌটিল্য? এগুলো শুধুই মনগড়া কাহিনিমাত্র! এর সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই! সব আমাকে ফাঁসানোর চক্রান্ত। হে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত! আমি তো আপনার হবু শ্বশুর, আমার এই অপমান আপনি মেনে নেবেন? এই ব্রাহ্মণ হতে পারে আপনার গুরু, আপনার কোনো এককালের শিক্ষক। কিন্তু আমাকে আপনার সম্মুখে, বিনা প্রমাণে, এভাবে অপমান করার অধিকার কি তার আছে?’

চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

‘গুরুদেব। ক্ষমা করবেন, কিন্তু একথা সত্য। আপনি এখনও অবধি যা যা বলেছেন তা পুরো ঘটনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয় বটে। কিন্তু সমস্তটাই আপনার ধারণামাত্র। এর থেকে প্রমাণ কি করা যায় কিছু?’

চাণক্য ফিরলেন চন্দ্রগুপ্তর দিকে। বললেন,

‘ধারণা নয়, সম্রাট। এ হল যুক্তিনির্ভর অনুধাবন। যে তত্ত্ব সকল ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে, সেটি নিঃসন্দেহে সত্য। তবে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রমাণ বিনা কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। এবং, আমি আপনাদের সকলের সামনে যে ব্যাখ্যা তুলে ধরেছি, তার যথাযথ প্রমাণ দেব।’

পুনরায় ধনানন্দ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলে উঠলেন,

'তাই নাকি? বেশ, বেশ। দেখি মান্যবর পণ্ডিত কী প্রমাণ দেন। আজকে সারাদিন তাঁর যে এই বৃথা ভাবনায় গিয়েছে এটা ভেবেই আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। সারাদিন এত কুটিল ব্যাখ্যা ভেবেও শেষ পর্যন্ত আমাকে অপরাধী প্রমাণ করা সম্ভব হল না কৌটিল্যর পক্ষে! হায় হায়!'

ঠোঁটের কোণে একটি কুটিল হাসি ফুটে উঠল চাণক্যর। ধনানন্দর দিকে চেয়ে বললেন,

'ভুল হচ্ছে তোমার, ধনানন্দ। তোমাকে আমি প্রথমবার কথা বলেই হত্যাকারী বলে শনাক্ত করতে পেরেছিলাম। আমার অনেকটা সময় লেগেছে রাজকুমারীর ভূমিকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে। তুমিই যে হত্যাকারী সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। আমার মনে একমাত্র দ্বিধা ছিল যে, তোমার কুকর্মের সঙ্গে রাজকুমারী যুক্ত কি না। বিষ যে তুমি মিশিয়েছ এ তথ্য আমার বহু আগেই জানা ছিল। তোমার সঙ্গে আজ দুপুরে কথা বলার মাঝে নিজের অজান্তেই সে তথ্য তুমি নিজে আমাকে দিয়ে ফেলেছ। ওহে, জীবসিদ্ধি!'

জীবসিদ্ধির দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন চাণক্য,

'তুমি কি স্মরণ করতে পারো এক প্রহর পূর্বে, আমার ও ধনানন্দর কথোপকথন? আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলার মাঝে 'বিষপ্রয়োগ' শব্দটি ব্যবহার করলেও, একবারও আমি উচ্চারণ করিনি যে, সেই বিষপ্রয়োগ কীসের মাধ্যমে করা হয়েছিল। রাজকুমারীর সঙ্গেও অন্য কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি এই ঘটনার পর। বিষপ্রয়োগ কীভাবে বা কীসের মাধ্যমে করা হয়েছে সে-তথ্য আমাদের কয়েক জন ব্যতীত নন্দদের কেউ জানত না। তাই নয় কি, রাজকুমারী?'

দুর্ধরা সম্মতি জানিয়ে বললেন,

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমার সঙ্গে আজ সকালের পর এই প্রথম পিতা, কাত্যায়ন মহাশয় বা আর্য মলয়কেতুর সাক্ষাৎ হচ্ছে। আমি আপনি ও জীবসিদ্ধি ব্যতীত কারুর সঙ্গেই এই বিষয়ে কোনো কথা বলিনি।'

'বেশ, বেশ। আর্য কাত্যায়ন, আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বিষ প্রয়োগের বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য আপনারই জানা ছিল না। সম্পূর্ণ বিষয়টা আপনি প্রথম জানতে পারেন পরীক্ষাগারে গিয়ে। তাই তো?'

শুধু উপর-নীচে ঘাড় নাড়লেন রাক্ষস।

চাণক্য পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলেন,

‘এবং, আপনার সঙ্গে তার পূর্বে ধনানন্দরও সাক্ষাৎ হয়নি। তাই নয় কি? আরও একবার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন রাক্ষস।’

চাণক্য বললেন,

‘বেশ, বেশ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, আমার সঙ্গে আজ দুপুরে প্রথমবার কথোপকথনের সময়েই ধনানন্দ কীভাবে জানলেন যে, বিষ প্রয়োগ পানীয়ের মাধ্যমেই করা হয়েছে? ওহে জীবসিদ্ধি, একবার স্মরণ করো তো। ধনানন্দ কথার মাঝে, মগধের প্রতি অভিযোগ জানাতে গিয়ে ঠিক এই উক্তিটি বলেছিলেন কি না: ‘মগধের পাচক পানীয় বানাল। মগধের ভৃত্য তা কক্ষ পর্যন্ত নিয়ে এল।’

চকিতে ধনানন্দর কথাগুলো মনে পড়ে গেল জীবসিদ্ধির। উত্তেজিত হয়ে বলল,

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঠিক! তাই তো! ঠিক এই কথা বলেছিল ধনানন্দ।’

আবার ধনানন্দর দিকে ফিরলেন চাণক্য। বললেন,

‘হুম। তিনি কীভাবে এই তথ্য জানলেন যে, বিষ পানীয়তেই মেশানো হয়েছিল? এ তথ্য রাজকুমারী, তুমি, আমি এবং সম্রাট বাদে কেউ জানত না। পরবর্তীতে কাত্যায়ন জেনেছিলেন। কিন্তু, ধনানন্দ নিজেই সেইসময় স্বীকার করেছিল যে, কাত্যায়নের সঙ্গে তার তখনও সাক্ষাৎ হয়নি। অতএব আমরা ব্যতীত একমাত্র একজন ব্যক্তিরই এটা জ্ঞাত থাকা সম্ভব, যে খাদ্যে নয়, পানীয়ে বিষ ছিল। আর সেই ব্যক্তি আর কেউ নয়, হত্যাকারী স্বয়ং!’

এই প্রথমবার ধনানন্দকে কিছুটা বিবর্ণ লাগল। তার ঠোঁটের থেকে তার আত্মবিশ্বাসী হাসিটা মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়েছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবছেন তিনি। কিন্তু পরমুহূর্তে বললেন,

‘এও মিথ্যে কথা! আমি অস্বীকার করছি। গুরুর তালে যে তার শিষ্য তাল মেলাবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে? এতে কিছুই প্রমাণ হয় না!’

চাণক্য বললেন,

‘যথার্থ বলেছ, ধনানন্দ। এটা প্রমাণ নয়। এটা তো শুধুমাত্র তোমাকে বোঝালাম যে, তুমি নিজেকে যতটা বুদ্ধিমান মনে কর, তা তুমি নও। বরং, তুমি একজন মূর্খ, যে নিজের অপরাধের প্রমাণ নিজেই উত্তেজনার বশে আমার হাতে তুলে দিয়েছ আজকে প্রথম সাক্ষাতেই। যদিও এই তথ্য এবং আমার ও জীবসিদ্ধির সাক্ষী তোমায় অপরাধী প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট। তবুও আমি আরও একটি প্রমাণ এইবার সকলের সম্মুখে আনব। এবং, তাতেই প্রশ্নাতীতভাবে তোমার অপরাধ প্রমাণিত হবে, ধনানন্দ!’

১৯.

বাইরে থেকে ঢোল, বাঁশি আরও অনেক ধরনের শব্দ মিলিয়ে এক মধুর সুর ভেসে আসছে। এই সুর প্রেম-রসের। এই মুহূর্তের কক্ষের পরিবেশের সঙ্গে তা এক চরম বৈপরীত্য সৃষ্টি করছে।

চাণক্য কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্ভবত তিনি ধনানন্দর থেকে প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ আশা করছিলেন। কিন্তু ধনানন্দ এইবার কিছুই বললেন না। তাঁর দুই চোখের তারার স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য বর্তমানে আর ফুটে উঠছে না। বরং জীবসিদ্ধির মনে হল তাতে এইবার দেখা দিচ্ছে ভীতি।

খানিকটা নিজের মনেই চাণক্য বলতে শুরু করলেন,

‘এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠানের মধ্যে, বিশেষ করে যেখানে এত অতিথির সমাগম, সেখানে বিষ নিয়ে প্রবেশ করা কঠিন নয়। কিন্তু তবুও, যেখানে শত্রুপক্ষর ঘরে ঢুকে আঘাত হানার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, অতএব বিষটিকেও গোপনে নিজের সঙ্গে আনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। বিষ এমনভাবেই রাজমহলে প্রবেশ করানো হবে যাতে তা কোনোভাবেই খুঁজে না পাওয়া যায়।’

চাণক্য ধনানন্দর চোখে চোখ রেখে বললেন,

‘ধনানন্দ, আজ তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকেই লক্ষ করেছি একটি সামান্য বিষয়। তোমার হাতের দশ আঙুলে দশটি সুদৃশ্য স্বর্ণ অঙ্গুরীয় শোভা পাচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে তোমার বাম হাতের মধ্যমার রত্নখচিত অঙ্গুরীয়টি অন্য নয়টির থেকে আলাদা। কারণ সেটি তোমার আঙুলের সঠিক মাপে বসেনি আজ বারংবার খেয়াল করেছি তোমায় সেটি খোলা-পরা করতে। খানিক পূর্বেও করছিলে। লক্ষ করলেই ওই আঙুলে তোমার অন্য একটি অঙ্গুরীয়র দাগ চোখে পড়ে। অর্থাৎ, সাধারণত ওই আঙুলে অন্য একটি ছোটো অঙ্গুরীয় শোভা পেয়ে থাকে, এই পীতাম্বর রত্ন বিশিষ্ট অঙ্গুরীয়টি নয়। এটি নূতন। তাই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এটি কি শুধুই আজকের দিনের বিশেষ সাজ? নাকি...’

মুহূর্তে মনে হল ধনানন্দর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন কেউ শুষে নিয়েছে। কিছুক্ষণ কোনো কথা না বলে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন শুধু। এরপর যখন মুখ খুললেন, তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে পূর্বের সমস্ত তেজ বিদায় নিয়েছে।

‘দুর্ধরা, তুমি নিজের কক্ষে যাও। এ সভায় তোমার উপস্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই।’

দুর্ধরার দিকে না তাকিয়েই বলে উঠলেন ধনানন্দ।

দৃঢ়কণ্ঠে দুর্ধরা উত্তর দিলেন,

‘না! আমি সবটা শুনতে চাই!’

‘ভিতরে যাও, দুর্ধরা! তোমার পিতা তোমায় আদেশ দিচ্ছে! যাও! যাও, এখান থেকে!’

‘ধনানন্দ!’

বরফ শীতল অথচ ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল স্বয়ং সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর মুখ থেকে,

‘আপনি ভুলে যাবেন না যে, যাঁর সঙ্গে আপনি কথা বলছেন, তিনি মগধের হবু মহারানি। তাঁকে আদেশ দেওয়ার অধিকার আপনার নেই। অতএব, সেই ধৃষ্টতা আপনি পুনরায় করবেন না।’

ধনানন্দ একবার চন্দ্রগুপ্তর দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত আবার বললেন,

‘এই কক্ষে সম্পূর্ণ সত্য জানার অগ্রাধিকার যদি কারুর থেকে থাকে, তবে আমি মনে করি তা নিঃসন্দেহে রাজকুমারী দুর্ধরার।’

জীবসিদ্ধি লক্ষ করল রাজকুমারী এই প্রথমবার তাকালেন চন্দ্রগুপ্তর দিকে। তাঁর মুখে মুহূর্তের জন্যে রক্তিমাভাব ফুটল।

চাণক্য দুর্ধরার দিকে চাইলেন তাঁর অনুমতি নেওয়ার ভঙ্গিতে। দুর্ধরা মৃদু মাথা ঝোঁকালেন চাণক্যর উদ্দেশে।

চাণক্যর চোখের দিকে চোখ পড়ল জীবসিদ্ধির। তাতে অন্তর্ভেদী উজ্জ্বল দৃষ্টি। শিকারকে ফাঁদে ফেলার পর শ্বাপদ শিকারির চোখে অনেকটা এই দৃষ্টি থাকে।

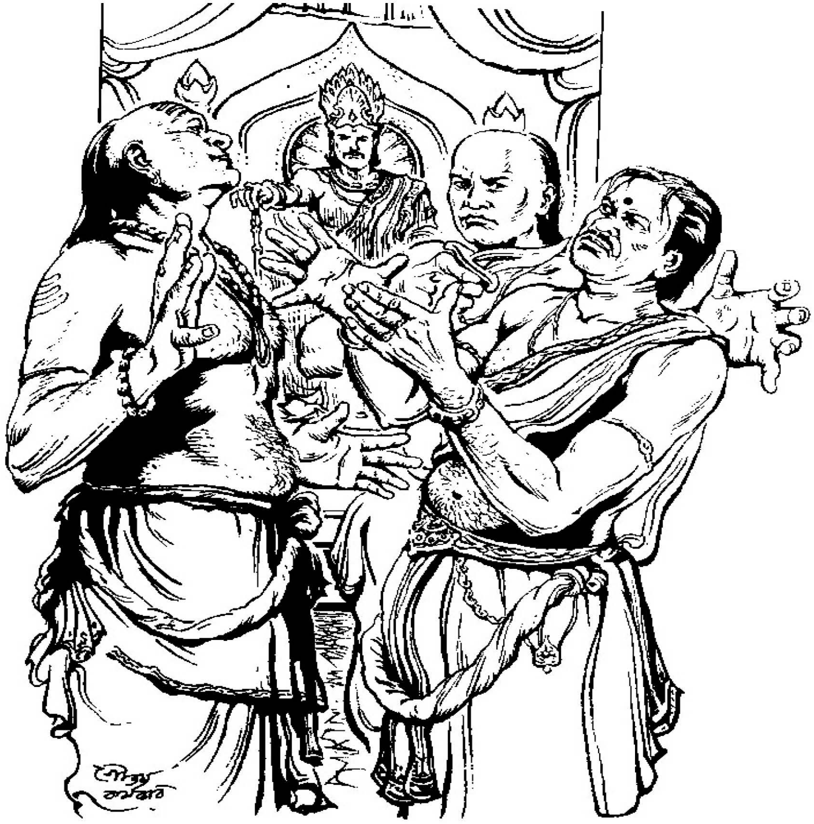
দু-পা এগিয়ে, আসনে উপবিষ্ট ধনানন্দর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন চাণক্য। ডান হস্ত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

‘তোমার ওই অঙ্গুরীয়টি একবার দাও।’

চোখ তুলে চাণক্যর চোখে চোখ রাখলেন ধনানন্দ। তাতে তীব্র আক্রোশ!

‘সর্বনাশ হোক তোর কুটিল ব্রাহ্মণ!’

পরমুহূর্তে তিনি দু-হাত সামনে বাড়িয়ে চাণক্যের কণ্ঠ লক্ষ করে আসন ছেড়ে লাফিয়ে পড়লেন।



কিন্তু তাঁর হাত চাণক্যর কণ্ঠ অবধি পৌঁছানোর পূর্বেই তাঁকে থামতে হল। কারণ ধনানন্দর নিজের কণ্ঠে ততক্ষণে স্পর্শ করেছে একটি ছোটো কৃপাণের ধারালো ডগা।

সদাসতর্ক জীবসিদ্ধি এরকম একটি প্রতিক্রিয়া আশা করেই চাণক্যর পেছন পেছনেই এগিয়ে এসেছিল। কোমরে লুকোনো গোপন ছুরিটা বের করে তার আচার্য আর ধনানন্দর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে তার বেশি সময় লাগেনি।

চন্দ্রগুপ্তর ইশারায় দু-জন সৈনিক এগিয়ে এসে ধনানন্দকে বল প্রয়োগ করে পুনরায় বসিয়ে দিল তার আসনে। তার দুপাশেই দাঁড়িয়ে থাকল তারা।

চাণক্য এক পা নড়েননি নিজের স্থান থেকে। তাঁর ঠোঁটে বিদ্রুপাত্মক হাসি। আরও এক পা এগিয়ে এসে নিজেই ধনানন্দর বাম হাতের মধ্যমা থেকে বড়ো অঙ্গুরীয়টি সহজেই খুলে নিলেন। ধনানন্দর কণ্ঠে তখনও ধারালো ফলাটা ধরে রেখেছে জীবসিদ্ধি।

ধনানন্দর দিকে একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে অঙ্গুরীয় নিয়ে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। ধনানন্দর কণ্ঠে তার হাতের কৃপাণটি চালিয়ে দেওয়ার তীব্র ইচ্ছা দমন করে, কৃপাণটি খাপে চালান দিয়ে আচার্যর পিছনেই ফিরে গেল জীবসিদ্ধি।

অঙ্গুরীয়টি সকলের দেখার নিমিত্ত চাণক্য একবার তুলে ধরলেন। মাথায় বসানো বড়ো পাথরটি একদিকে ঘোরাতেই সেটি একদিকে খুলে গেল অনেকটা ঢাকনা খোলার মতো। রত্নের নীচে একটি গুপ্ত কোটর দেখা গেল।

চাণক্য সেটি খোলা অবস্থায় আরও একবার সকলের উদ্দেশে প্রদর্শন করলেন। বললেন,

'এই হল প্রমাণ। এই বিশেষ অঙ্গুরীয়টির এই গুপ্ত কোটরেই মারণ বিষ রেখেছিল ধনানন্দ। রাজকুমারীর দৃষ্টি এড়িয়ে এভাবেই উপরের রত্নটি সরিয়ে সেই বিষ তার পানীয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই বিষেই মৃত্যু হয়েছে মধুবন নামক যুবতীর। এবং, ধনানন্দকে বিষ মেশাতে দেখে ফেলায়, নিজের বিশ্বস্ত সৈনিকদের দিয়ে কৃষ্ণকলি নামের দ্বিতীয় যুবতীকেও হত্যা করা হয়। এই অঙ্গুরীয়টির বাইরের স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে এই কোটরের ঔজ্জ্বল্য তুলনা করলেই দেখা যাচ্ছে যে, কোটরের স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ক্ষীণ। অর্থাৎ, এই স্বর্ণ দীর্ঘ সময় বিষের সংস্পর্শে ছিল।'

চন্দ্রগুপ্তর পাশের মেজে আংটিটি রেখে দিয়ে চাণক্য তাঁকে বললেন,

'আমার আর কোনো বক্তব্য নেই, সম্রাট। বাকি নির্ণয় আপনার।'

প্রথমে চন্দ্রগুপ্ত এবং তারপর দুর্ধরার দিকে চেয়ে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে, নিজের আসনে এসে উপবিষ্ট হলেন আচার্য চাণক্য।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্রগুপ্ত। বললেন,

'ধনানন্দ, আচার্য চাণক্যর কথায় কয়েক বর্ষ পূর্বে আমি তোমায় জীবনদান করেছিলাম। তার জন্যে এই মুহূর্তে আমার আফশোস হচ্ছে। সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করার অভিপ্রায় আমার নেই। আমি দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ। কিন্তু...।'

কথা থামিয়ে চন্দ্রগুপ্ত তাকালেন দুর্ধরার দিকে। দু-হাতে মুখ ঢেকে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

চন্দ্রগুপ্ত পুনরায় মুখ খুললেন,

'কিন্তু, এই কক্ষে সবচেয়ে বেশি যিনি আঘাত পেয়েছেন, তাঁর শোকের সম্মুখে আমার ক্রোধ অতি তুচ্ছ। তাই ধনানন্দ, তোমার ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে বলে আমি মনে করি। রাজকুমারী দুর্ধরা এ বিষয়ে যা নির্ণয় নেবেন, আমি তাই মেনে নেব। তাঁর নির্ণয়ই আমার নির্ণয় হবে।'

অশ্রুভেজা চোখে চন্দ্রগুপ্তর দিকে চাইলেন দুর্ধরা। এতগুলো বছর যাঁকে ঘৃণা করে এসেছেন তিনি, তাঁকে আজ সম্পূর্ণ অন্যরূপে চিনতে পারছেন দুর্ধরা। কে এই পুরুষ? যিনি নিজের ক্রোধকেও বশ করতে সক্ষম? কে এই বিস্ময় তরুণ সেনানায়ক?

দুর্ধরার অশ্রুসিক্ত চোখ দুটির দিকে চাইতেই হৃদয়ে একটি মোচড় অনুভব করলেন চন্দ্রগুপ্ত। গভীর একটি বিষণ্ণতা আচ্ছন্ন করল তাঁর মন। আহা! কীইবা দোষ এই মেয়েটির? অথচ কত ঝড়ের মধ্যেই না তাঁকে এনে ফেলা হয়েছে। বারংবার তাঁকে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর পিতা তাঁকে ব্যবহার করেছে। আর তিনি নিজে? তাঁরাও কি এই মেয়েটিকে ব্যবহার করেননি? জোর করে পরিস্থিতির চাপে তাঁকে বিবাহে বাধ্য করেছেন তাঁরা। হায়! না না! এই অন্যায় তিনি করতে পারেন না। এই কোমল নারীর চোখের জল তিনি সহ্য করতে পারবেন না। দরকারে চাণক্যর বিরুদ্ধে গিয়েও তিনি এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করবেন। মনে মনে নির্ণয় নিলেন চন্দ্রগুপ্ত।

দু-চোখের অশ্রু মুছে উঠে দাঁড়ালেন রাজকুমারী দুর্ধরা। এগিয়ে গেলেন ধনানন্দর দিকে। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,

'পিতা, আমি লজ্জিত। আমি ব্যথিত। আপনি কী করে এই ঘৃণ্য কার্য করতে পারলেন?'

চোখ তুলে চাইলেন ধনানন্দ। তাঁকে বৃদ্ধ, দুর্বল লাগছে। বললেন,

'তোমার জন্যে! আমি যে তোমারই জন্যে করেছি, দুর্ধরা! কী করে তোমায় তুলে দিতে পারতাম আমি এই এদের হাতে? তুমি যে আমার জীবনের চেয়েও দামি।'

মুহূর্তের জন্যে কি দুর্বল হলেন দুর্ধরা? পিতার প্রতি তাঁর হৃদয়ে সহানুভূতি জাগল? রাজকুমারীর মুখ দেখে অনুমান করতে পারল না জীবসিদ্ধি।

তবে তার পরের শব্দগুলি বলার সময় তাঁর কণ্ঠ সামান্য কাঁপল,

'আর কৃষ্ণকলি ও মধুবন? তারা আপনার কন্যাসমা ছিল না? তাদের হত্যা করেছেন আপনি। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকেও হত্যার চেষ্টা করেছেন। ধিক্কার আপনাকে।'

চিৎকার করে প্রতিবাদ করলেন ধনানন্দ,

'না! আমি চন্দ্রগুপ্তকে বিষ দিয়ে হত্যার চেষ্টা করিনি! বিশ্বাস করো আমার কথা!'

উত্তর ভেসে এল চাণক্যর মুখ থেকে,

'বিশ্বাস করলাম। সম্রাটের পানীয়ে তুমি বিষ মেশাওনি। তা আমি জানি।'

'তবে? তবে কে?'

সে-প্রশ্নের উত্তর তোমার জানা নিষ্প্রয়োজন।

আর কোনো ব্যাখ্যা দিলেন না চাণক্য।

পরবর্তী কথাগুলো বলার পূর্বে একবার শ্বাস নিলেন দুর্ধরা। তাঁর কণ্ঠের দৃঢ়তা ফিরে এসেছে,

‘আমি আদেশ দিচ্ছি। এই মুহূর্তে আপনি পাটলিপুত্র ত্যাগ করবেন। ভোরের আলো ফোটার পূর্বে আপনি মগধের সীমানা পার করবেন এবং ভবিষ্যতে কোনোদিন মগধের ভূমিতে আপনি পা রাখবেন না। আমার সঙ্গে কোনোভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করলে আপনার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব আমার নয়। জানবেন আপনার কন্যাকে আপনি আজকে তার অন্য দুই সখীর সঙ্গেই হত্যা করেছেন।’

নিজের আসনে ফিরে এলেন দুর্ধরা। দ্বিতীয়বার পিছন ফিরে তাকালেন না।

বিস্মিত হয়েছে জীবসিদ্ধি। তবে তার চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়েছেন চন্দ্রগুপ্ত। কে এই নারী? তাঁকে একটু আগে কোমল, দুর্বল ভেবেছিলেন তিনি। ভুল করেছিলেন!

উঠে দাঁড়ালেন ধনানন্দ। একবার চাইলেন কন্যার দিকে। মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন দুর্ধরা। ধনানন্দ চাইলেন তাঁর বিশ্বস্ত অমাত্যর দিকে। রাক্ষস তাঁর দিকে একবার চোখে চোখ রেখে তা নামিয়ে নিলেন। এই অবস্থায় তিনি কন্যাসমা দুর্ধরাকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। রাজকুমারীর যে এখন তাঁকে বড়ো প্রয়োজন। এই অচেনা মানুষের মধ্যে তিনিই যে তাঁর একমাত্র আপন মানুষ রয়ে গেলেন।

চন্দ্রগুপ্ত ইশারা করতে দু-জন সৈনিক ধনানন্দকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান করল।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চাণক্য। সেটি স্বস্তির না আফশোসের, তা জীবসিদ্ধি অনুমান করতে পারল না।

---

*বিষের সংস্পর্শে এলে স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়। এই তথ্য অর্থশাস্ত্রে লেখা আছে। যে কারণে অতীতে রাজাদের সোনার থালা বাসনে খাবার খাওয়ার নিয়ম ছিল। যাতে আহারে বিষ থাকলে তা বোঝা যায়।

২০.

জীবসিদ্ধি উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রণাম জানিয়ে বলল,

‘আপনাদের ব্যস্ততার মধ্যে কিছুটা সময় নেওয়ার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে, আপনারা আসতে পারেন যদি আপনাদের আর কোনো প্রয়োজন না থাকে।’

জীমূতবাহন, মলয়কেতু এবং ভুবন বেরিয়ে গেলেও অন্যরা নিজের নিজের আসনে বসে রইলেন। মহামাত্য কৃষ্ণনাথকে খুবই ক্লান্ত লাগছে। রাক্ষসও বসে আছেন নিজের জায়গায়। তিনি কিছু ভাবছিলেন। বাকিরা কক্ষ ত্যাগ করতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চাণক্যর উদ্দেশে বললেন,

'আচার্য, সব কিছুরই যখন উত্তর দিলেন তখন আমার মনের সংশয়ও দূর করুন। যদিও, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি না সেটা আপনার অভিরুচি।'

চাণক্য অনুমান করতে পারছিলেন কী সেই প্রশ্ন। তবুও বললেন,

'কোন প্রশ্ন, আর্য রাক্ষস?'

'সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর পানীয়ে কে বিষ মেশাল? তবে কি রাজমহলে দ্বিতীয় কোনো হত্যাকারী আছে?'

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

'না, আর্য। আপনাকে আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, রাজমহলে আর কোনো হত্যাকারী নেই।'

'তবে? আমি যে নিজে দেখেছি যে, সম্রাটের পানীয়ে বিষ ছিল?'

চন্দ্রগুপ্ত বলে উঠলেন,

'এই রহস্যের উত্তর সম্ভবত আমি অনুমান করতে পারছি। বোধ হয় আমি জানি যে, আমার পানীয়ে কে বিষ দিয়েছে।'

তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসি।

'কে? কে সম্রাট?'

রাক্ষসের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চন্দ্রগুপ্ত জীবসিদ্ধির দিকে তাকিয়ে, কৌতুকের ভঙ্গিতে নিজের ভ্রূ জোড়া তুললেন।

জীবসিদ্ধি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল,

'আপনার অনুধাবন সঠিক। আমায় ক্ষমা করবেন সম্রাট। আপনার পানীয়ে আমিই বিষ মিশিয়েছিলাম।'

রাক্ষস, রাজকুমারী এবং কৃষ্ণনাথ, তিনজনের মুখ থেকেই বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল একইসঙ্গে। তাঁদের দৃষ্টিতে অপার বিস্ময়। যদিও চন্দ্রগুপ্তর ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই রয়েছে।

উৎসাহিত ভঙ্গিতে তাঁর আসনের হাতলে মুষ্টির আঘাত করে বললেন,

'আহ্! আমি জানতাম! আজকে দুপুরে আমার কক্ষে যখন আচার্য অন্য কোনো দাসের পরিবর্তে তোমায় আমার অভুক্ত খাদ্য এবং পানীয় নিয়ে যেতে বললেন, সেই

মুহূর্তেই আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তার বিশেষ কোনো তাৎপর্য অনুমান করতে পারিনি। কিন্তু খানিক পূর্বেই যখন আচার্য ধনানন্দকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন, তখনই আমার মনে পড়ে গেল। আমার কক্ষে আচার্য গোপনে তোমায় কিছু একটা নির্দেশ দিচ্ছিলেন।'

হার মানার ভঙ্গিতে দু-হাত তুলে জীবসিদ্ধি হেসে বলল,

'যথার্থ অনুমান করেছ, ভ্রাতা। তোমার অনুধাবন ক্ষমতা শীঘ্রই গুরুদেবকে অতিক্রম করবে, আশা রাখি।'

নাসিকা থেকে একটি শব্দ নির্গত হল চাণক্যর। অনেকটা যেন তিনি বলতে চাইলেন, 'আশা থাকা ভালো। দুরাশা নয়!'

রাক্ষস বললেন,

'কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না! এর অর্থ কী?'

চাণক্য ডান হস্ত উঠিয়ে বললেন,

'আমারই আদেশে জীবসিদ্ধি সম্রাটের পানপাত্রের অবশিষ্ট পানীয়ে বিষ মিশিয়েছিল।'

'কিন্তু, কেন?'

'ক্ষমা করবেন, আর্য কাত্যায়ন। এই সামান্য ছলনার সাহায্য আমায় নিতেই হয়েছে। এই নির্দেশ এই কারণেই দিয়েছিলাম যাতে আপনার উপস্থিতিতে রাজকুমারী এবং সম্রাট, উভয়েরই পানীয় পরীক্ষার সময় তাতে বিষ পাওয়া যায়।'

মনে মনে চাণক্য ভাবলেন, সম্রাটের খাদ্যে এমনিতেই বিষ থাকে সাধারণত। কিন্তু আজকে বিশেষ দিনে তা দেওয়া হয়নি। অন্যথায় এমনিতেই বিষ পাওয়া যেত তাঁর উচ্ছিষ্ট খাদ্যে। জীবসিদ্ধিকে আলাদা করে আর বিষ প্রয়োগ করতে হত না।

রাক্ষস প্রশ্ন করলেন,

'কিন্তু, কেন?'

'পরিস্থিতি বাধ্য করেছে, আর্য। রাজকুমারী দুর্ধরার পানীয়ে বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে কেউ হত্যার চেষ্টা করেছে। আপনারা আমাদের, অর্থাৎ, মগধের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন। এবং, এই বিবাহ সেই মুহূর্তে স্থগিত করে পাটলিপুত্র ত্যাগ করতেন। অতিথিদের মধ্যে ধনানন্দ এই সংবাদ ছড়িয়ে দিলে আর কোনোভাবেই আমরা আপনাদের আটকাতে পারতাম না। সেই অভিলাষই ছিল ধনানন্দর। কিন্তু রহস্যের সমাধানের জন্যে আমার সময় প্রয়োজন ছিল, যা আপনারা আমাকে দিতেন না। তাই আমাকে বাধ্য হয়ে সেই মুহূর্তে এই ছলটি করতে হল। যদি সম্রাটের পানীয়েও বিষ

পাওয়া যায়, এবং, তার সাক্ষী যদি নন্দের বিশ্বস্ত অমাত্য থাকে, তবে পরিস্থিতিতে কিছুটা সমতা আসে। অর্থাৎ, আপনারা একতরফা আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ করতে পারবেন না। আমাদের কাছেও পালটা অভিযোগের অস্ত্র থাকবে। সম্রাটকে হত্যার চেষ্টা সাধারণ ব্যাপার নয়, অতএব আপনারাও ভেবেচিন্তে নির্ণয় নিতে বাধ্য হবেন। আপনারাও সেই কারণেই ঘটনাটি অতিথিদের মধ্যে রটিয়ে দেওয়ার সাহস করলেন না। এর ফলে আমি সময় পেয়ে গেলাম। এই সামান্য হল ব্যতীত আমি এই রহস্যের সমাধান করতে পারতাম না, আর্য। এই কারণে আমি আপনার এবং রাজকুমারীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।'

রাক্ষসের মুখে এই প্রথম একটি অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। সেটি অসন্তোষের না প্রশংসার তা অনুমান করা গেল না স্পষ্ট। ঠোঁটের ফাঁকে তিনি কিছু একটা শব্দ বললেন। তা স্পষ্ট শোনা না গেলেও, জীবসিদ্ধির মনে হল কথাটি 'কৌটিল্য'!

বাইরে থেকে প্রহর ঘণ্টার ধ্বনি ভেসে এল। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শুরু হয়েছে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সকলের মনেই প্রশ্নটা এল – 'এইবার কী?'

চন্দ্রগুপ্ত একবার দুর্ধরার দিকে দেখলেন। রাজকুমারী নিশ্চুপ বসে আছেন। তাঁর গাল বেয়ে এখনও অশ্রুধারা নামছে।

নারীর বিষয়ে অসহায় পুরুষমাত্রেই তার মিত্রদের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। চন্দ্রগুপ্তও তাই এই মুহূর্তে তার একমাত্র মিত্রস্থানীয় ব্যক্তির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরামর্শ চাইলেন। জীবসিদ্ধি তাকে নিঃশব্দে দুর্ধরার দিকে ইশারা করল।

আসন ছেড়ে দুর্ধরার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন চন্দ্রগুপ্ত। দুর্ধরা লক্ষ করেননি তাঁকে। তিনি ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন দেয়ালের দিকে।

'রাজকুমারী।'

চিন্তায় ছেদ পড়তেই নিজের সম্মুখে দাঁড়ানো চন্দ্রগুপ্তকে নজরে পড়ল দুর্ধরার। মুহূর্তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে। চন্দ্রগুপ্তর সম্মুখে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

'রাজকুমারী, আপনাকে যে দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, সেই কারণে আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার মানসিক অবস্থা আমি অনুমান করতে পারছি। তাই আমার মনে হয় আমাদের বিবাহ স্থগিত থাক। আপনাকে আর কেউ আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করতে জোর করবে না। একথা আজকে আপনাকে আমি দিলাম। আপনি চাইলে এই পাটলিপুত্রতেই আপনার নিবাসের ব্যবস্থা করতে পারি।

আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের মহলে থাকুন। কারুর রাজনৈতিক চুক্তির অংশ আপনি নন।'

শেষ কথাটি একটু জোরেই বললেন চন্দ্রগুপ্ত যাতে কথাটা চাণক্যর কান অবধি পৌঁছায়। চাণক্য অবশ্য এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গো একটি গুড়ের মধুদ্রব্যে মনোনিবেশ করেছেন। তবে জীবসিদ্ধি নিশ্চিত কথাটি তিনি শুনেছেন।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

'আপনি বিশ্রাম নিন, রাজকুমারী। আপনার কোনোরকম অসম্মান এই পাটলিপুত্রতে হবে না। আপনার দুই সখীর যথাযথ মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে, তা আপনাকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি। আমি মহামাত্যকে ঘোষণা করে দিতে বলেছি যে, বিবাহ হবে না।'

অবাক নয়নে দুর্ধরা চেয়ে রয়েছে তার সম্মুখে দাঁড়ানো মানুষটির দিকে। এই প্রথমবার দুর্ধরা লক্ষ করল যে, এই তরুণ অসম্ভব সুপুরুষ। তার দীপ্ত মুখে এবং চোখে এক অদ্ভুত মায়াভরা আকর্ষণ আছে।

দুর্ধরাকে নমস্কার জানিয়ে ফিরলেন চন্দ্রগুপ্ত। অমাত্য কৃষ্ণনাথের উদ্দেশে আদেশ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি, তখনই তাঁকে কেউ ডাকল,

'দাঁড়ান, সম্রাট।'

রাজকুমারী তাঁকে ডেকেছেন। মুহূর্তে এক অব্যক্ত আশায় চন্দ্রগুপ্তর হৃদয় লাফিয়ে উঠল কি?

'বলুন, রাজকুমারী।'

'এই বিবাহে কি আপনার মত ছিল?'

'না। ছিল না।'

পুরুষের মধ্যে প্রেমিককে চিনতে পারার ক্ষমতা প্রতিটি নারীর থাকে।

রাজকুমারী দুর্ধরা প্রশ্ন করলেন,

'আর এখন? আপনার কি আমায় বিবাহে আপত্তি আছে?'

'আমি...'

বাক্যহারা হয়েছেন চন্দ্রগুপ্ত। কী করেই-বা তিনি বলবেন যে, এই মুহূর্তে তিনি এই অপরূপ, প্রজ্ঞা নারীকে নিজের বাহুবন্ধনে জড়িয়ে নেওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছে দমন করে রয়েছেন।

তাই উত্তর দিতে পারলেন না চন্দ্রগুপ্ত। যদিও দুর্ধরার যা জানার তা তাঁর জানা হয়ে গিয়েছে। তাঁর মুখের রক্তিমাভাব তার প্রমাণ।

চোখ নামিয়ে তিনি বললেন,

‘এই বিবাহ আজকে স্থগিত হলে তাতে আমার পিতারই উদ্দেশ্য সফল হবে। আমি তা চাই না। বাকিটা আপনার বিচার্য।’

চন্দ্রগুপ্তর পক্ষ থেকে কোনো উত্তর আসছে না দেখে চোখ তুলে চাইলেন দুর্ধরা। দেখলেন তাঁর সামনে তরুণটি তাঁর দিকে মোহাবিষ্টর দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। এ দৃষ্টি সম্রাটের নয়। এ দৃষ্টি প্রেমিকের। দুর্ধরা অনুভব করলেন সেই দৃষ্টির দিকে তিনি বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারছেন না। কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

যুগলের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে উঠল জীবসিদ্ধি।

চাণক্যর দিকে তাকাতে সে লক্ষ করল চাণক্য অন্যদিকে চেয়ে আছেন। মুখে নির্লিপ্ত ভঙ্গি। তবে তাঁর ঠোঁটের কোণে এক ঝলক হাসি যেন দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

চন্দ্রগুপ্ত এবং দুর্ধরা এখনও একে অন্যের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁরা এই মুহূর্তে নিজেদের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত। জীবসিদ্ধি তাঁদের কাছে গিয়ে বলল,

‘ওহে, ভ্রাতা। নির্ণয় যখন তোমরা নিয়েই ফেলেছ, তখন আর দেরি কোরো না। বিবাহলগ্ন যে আসন্ন!’

জীবসিদ্ধি দ্রুত দাস-দাসীদের নির্দেশ দিয়ে সম্রাট ও রাজকুমারীকে যে যার নিজের কক্ষে তৈরি হতে পাঠিয়ে দিল। প্রসন্নচিত্তে ফিরে এল সে চাণক্যর পাশে। চাণক্য ততক্ষণে তাঁর পাত্রের সবক-টি মধুদ্রব্য শেষ করেছেন।

রাক্ষস উঠে দাঁড়িয়ে ধীরপায়ে এগিয়ে এলেন চাণক্যর দিকে। হাতজোড় করে বললেন,

‘মহামতি।’

পাত্রটি একদিকে সরিয়ে রেখে রাক্ষসের দিকে চেয়ে চাণক্য বললেন,

‘বলুন, আর্য।’

‘আপনি, আপনারা আরও একবার পরাজিত করেছেন আমায়। শুধু বুদ্ধিতে ও যুদ্ধে নয়, চন্দ্রগুপ্তর উদারতার কাছেও আমি পরাজিত। আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে চাই যে, আমার পক্ষ থেকে মৌর্যদের উপর কোনোরকম আঘাত বা বিরোধিতা ভবিষ্যতে আসবে না। কিন্তু তার বদলে আমিও আপনার থেকে একটি আশ্বাস চাই।’

‘কী আশ্বাস চান আমার থেকে, মহাশয়?’

‘দুর্ধরা আমার কন্যাসমা। আমি আশ্বাস চাই যে, তার কোনোরকম অসম্মান বা কষ্ট এই রাজমহলে হবে না! সে যেন তার যথাযথ সম্মান পায় এই পাটলিপুত্রে।’

উঠে দাঁড়ালেন চাণক্য। রাক্ষসের চোখে চোখ রেখে বললেন,

‘আপনি নিজেই সেটা নিশ্চিত করছেন না কেন?’

‘অর্থাৎ?’

‘আর্য, পূর্বেও আপনাকে আমি যে অনুরোধ করেছিলাম, তা আরও একবার করছি। তখন পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল, আমরা বিরোধী পক্ষ ছিলাম। কিন্তু এখন তো আর সে-পরিস্থিতি নেই। তাই আপনাকে আমি আরও একবার নিজের নির্ণয় বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি পুনরায় মগধের প্রধানামাত্য পদ গ্রহণ করুন।’

‘কিন্তু...’

ততক্ষণে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মহামাত্য কৃষ্ণনাথ। তিনি রাক্ষসের দু-হাত চেপে ধরে বললেন,

‘কোনো কিন্তু নয়, আর্য! আচার্য চাণক্য যে গুরুদায়িত্ব আমার স্কন্ধে দিয়ে নিজে অবসর নিয়েছিলেন, সে-দায়িত্ব নেওয়ার পক্ষে আমি বড়োই বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত। এ দায়িত্ব আপনি নিয়ে আমায় নিষ্কৃতি দিন!’

চাণক্য বললেন,

‘মগধের দায়িত্ব আপনি পুনরায় নিলে আমি এবং কৃষ্ণনাথ বড়োই নিশ্চিত হই। বয়োজ্যেষ্ঠ আর্য কৃষ্ণনাথের উপর আমি সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে নিজে অবসর নিয়ে বড়োই অন্যায় করেছিলাম তাঁর প্রতি। আমায় সেটি শুধরে নেওয়ার সুযোগ দিন।’

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রাক্ষস বললেন,

‘বেশ, আমি বিবেচনা করে দেখব।’

হাসি ফুটল চাণক্য এবং কৃষ্ণনাথের মুখে।

রাক্ষস প্রশ্ন করল,

‘কিন্তু আচার্য, আপনি নিজেই কেন এই দায়িত্ব নিচ্ছেন না?’

নিজের কেশশিখায় হস্তচালনা করতে করতে চাণক্য বললেন,

‘আহ্, আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি আজকাল, মহাশয়। আমি অর্থশাস্ত্রের প্রভূত সূত্র লিপিবদ্ধ করার মহাযজ্ঞে ব্রতী হয়েছি। তা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে... যাক গে! ওকথা আজকের দিনের জন্যে নয়। আসুন, এবার আমরা বিবাহের মঞ্চের দিকে এগোই। ওহে, জীবসিদ্ধি! চলো, চলো! বিলম্ব কোরো না হে।’

সকলে বেরিয়ে যেতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে তাদের পিছু নিল জীবসিদ্ধি। সে মনে মনে ভাবল, শেষপর্যন্ত তবে আচার্য চাণক্যর উদ্দেশ্যই সফল হল। আচ্ছা, আচার্য কতদূর পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন? এই বিবাহের উদ্দেশ্য কি তবে শুধুই চন্দ্রগুপ্তর আসন

মজবুত করা নয়? তবে কি তিনি পূর্বেই ভেবে রেখেছিলেন যে, দুর্ধরার বিবাহ হলেই তিনি রাক্ষসকেও তাদের পক্ষে টেনে নেবেন? রাক্ষস তাদের পথের কাঁটা বহুদিনের। আচার্যই বলেন, রাজনীতিতে কেউ চিরশত্রু বা চিরমি হয় না। এক বাণে আরও একবার একাধিক শিকার করলেন চাণক্য। পুরোটাই কি তাঁর পূর্বপরিকল্পিত?

কে জানে! চাণক্যকে বোঝা দুষ্কর।

সামনের থেকে আরও একবার ডাক দিলেন চাণক্য,

‘ওহে, জীবসিদ্ধি! পিছিয়ে রইলে যে? এসো, এসো! আজ যে আমাদের চন্দ্রগুপ্তর বিবাহ!’

***

শুভলগ্নে বর-বধূ অগ্নিকে সাক্ষী রেখে মালাবদল করল। পূজারি বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে ঘোষণা করতেই শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল চারিদিকে। সকলে নবদম্পতির উদ্দেশে পুষ্পবৃষ্টি করল।

বিবাহ সম্পন্ন করে বর-বধূ উঠে দাঁড়াল। তারা এগিয়ে এল এককোনায় দাঁড়িয়ে থাকা সন্ন্যাসীবেশী ব্রাহ্মণের দিকে।

দু-জনেই তাঁর সম্মুখে এসে তাঁর পদস্পর্শ করল।

চাণক্য নবদম্পতির মস্তকে দু-হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, — সদা সুখিনো ভবন্তু।

তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং মহারানি দুর্ধরা এগিয়ে গেলেন বারান্দার দ্বারের দিকে।

মহলের বাইরে কয়েক হাজার নাগরিক পাটলিপুত্রর রাস্তায় এই গভীর রাত অবধি অপেক্ষা করে আছে। তাদের সম্রাট এবং মহারানির দর্শন পেতে।

চন্দ্রগুপ্ত এবং দুর্ধরা বারান্দায় দেখা দিতেই প্রবল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল সম্পূর্ণ পাটলিপুত্র নগরী।

উপসংহার:

বিবাহ অনুষ্ঠানের পর দশদিন কেটে গিয়েছে। আজকেও একটি বিশেষ দিন ছিল কারণ আজকে মগধের মহামাত্য পদের দায়িত্ব নিয়েছেন অমাত্য রাক্ষস।

সন্ধ্যা নেমেছে পাটলিপুত্রে। রাজমহলের ঐশ্বর্য, বৈভব থেকে দূরে, নগরের এক নির্জন স্থানে, নিজের ছোট্ট কুটিরে সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করছিলেন আচার্য চাণক্য। তাঁর কানে ঘোড়ার খুরের শব্দ এল। দেখলেন কুটিরের বাইরে ঘোড়া থেকে নামছেন প্রধানামাত্য রাক্ষস। চাণক্য তাঁকে সম্ভাষণ করে বললেন,

'আসুন, অমাত্য।'

রাক্ষস কুটিরে প্রবেশ করে প্রণাম জানালেন চাণক্যকে। তাঁর মুখোমুখি বসে রাক্ষস প্রশ্ন করলেন,

'অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু কিছু কথা আপনার সঙ্গে বলা একান্তই প্রয়োজনীয়। তাই আজকে আমি নিজেই চলে এলাম।'

'খুব ভালো করেছেন, অমাত্য। আপনাকেও অনেক কিছু বলার আছে আমার। তিন বছর পূর্বে পাটলিপুত্রর রাজমহলের অন্দরে গান্ধারের দূতের হত্যা থেকে শুরু হয়ে, গত বছরে স্বর্ণমুদ্রা দেশে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা অবধি, সব কিছুই আপনাকে বুঝিয়ে বলার সময় এসেছে।'

'কিন্তু তার আগে আমায় বলুন আচার্য, কেন আপনি আমাকে এতটা বিশ্বাস করেন? কেন আমাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে এইবার আপনি মরিয়া ছিলেন?'

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

'ঠিক যে কারণে আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন, সেই একই কারণে আমিও আপনাকে বিশ্বাস করি। কারণ আমরা দু-জনই জানি যে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য এক। আমরা দেশের ভালো চাই। মগধকে আরও শক্তিশালী করতে চাই, যাতে ভবিষ্যতে অলকশেন্দ্রর মতো কোনো বিদেশি শক্তি পুনরায় আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করতে না পারে। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, আপনাকে রাজধানীর দায়িত্ব দিয়ে আমাকে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করতে হবে, অমাত্য। আমি নিশ্চিত এই মুহূর্তে মগধের সবচেয়ে বড়ো শত্রু দেশেরই কোনো এক স্থানে বসে আমাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার পরিকল্পনা করছে। কোনো-না-কোনো উচ্চাভিলাষী জনপদের রাজাকে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করছে, অথবা, আমার বা সম্রাটের

প্রাণহানি করার চক্রান্ত সাজাচ্ছে। অথচ আমাদের কাছে তাকে খুঁজে পাওয়ার একমাত্র সূত্র হল কয়েকটি শর।'

'শর? মানে, বাণ? কার কথা বলছেন আপনি? কে মগধের শত্রু?'

চাণক্য পাথর ঘষে একটা প্রদীপ জ্বেলে সেটা দু-জনের মাঝে রাখলেন। বললেন,

'আচার্য শকুনি!'

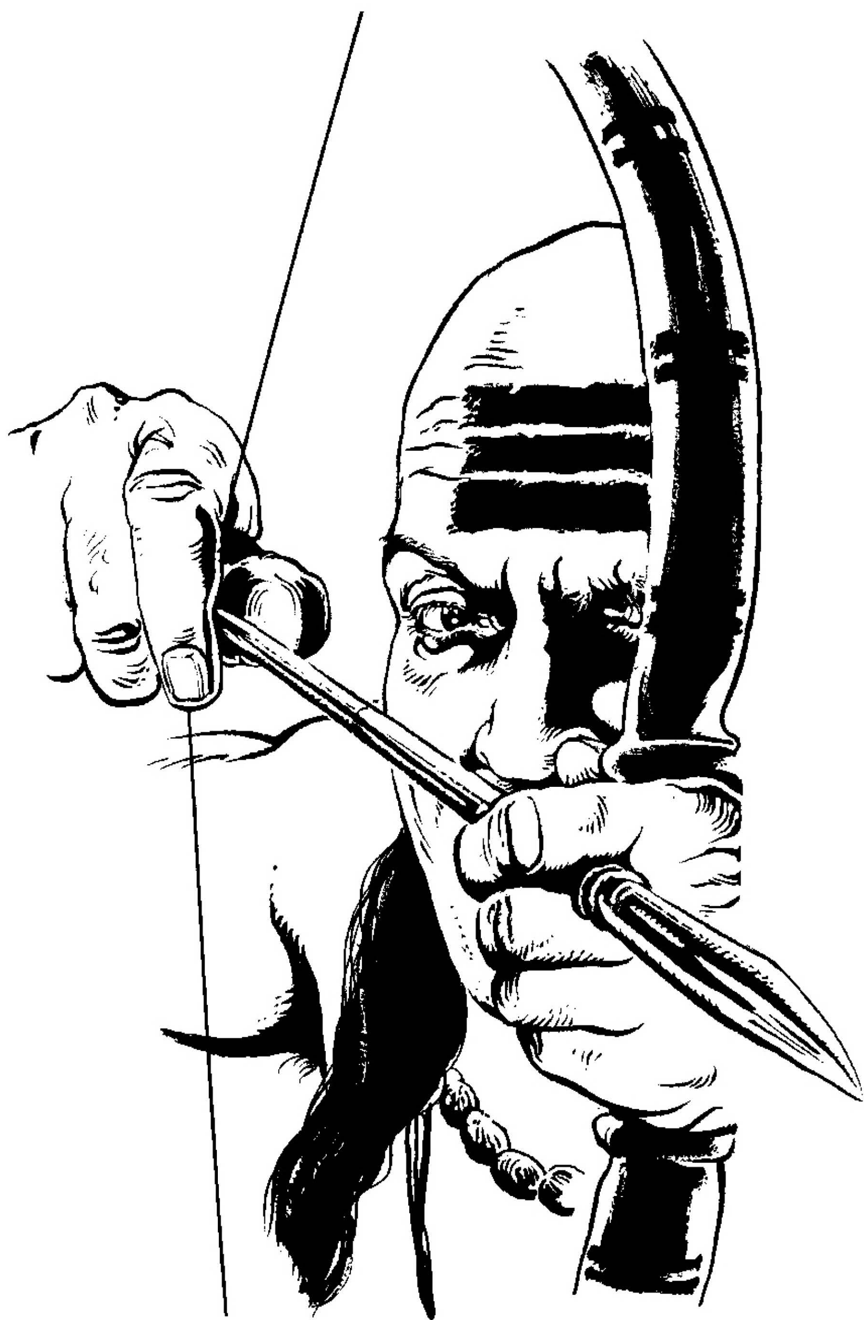
References:

1. T Ganapati Śāstri, Kouṭaliyam Arthaśā -stra Śrimulākhyaya vyākhyā, Raştriya Sanskrit Samsthān New Delhi, Edition 2002, Part 1 and 2. - "

2. P Sarkar, et.al. Traditional and ayurvedic foods of Indian origin, Journal of Ethnic Foods, Volume 2, Issue 3, September 2015, pages 97-109

3. Wine in Ancient India by D K Bose, K M Connor and Co., 1922.

4. History of Wine from Ancient India, malicethoughts. blogspot.com (http://malicethoughts blogspot com/2018/04/ history-of-wine-from-ancient-india.html)



শর-শাস্ত্র

১.

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর সভাকক্ষ। ভারী মখমল ও রেশমের পর্দায় সুসজ্জিত। মধ্যিখানের ছাদ থেকে সবচেয়ে বড়ো ঝাড়বাতিটি জ্বলছে। এর চেয়ে বেশি আলোর প্রয়োজন এই মুহূর্তে নেই কারণ এখন সন্ধ্যার সময় বলে দিনের ভিড় নেই। শুধুমাত্র তিনজন ব্যক্তি বসে আছেন। রাজসিংহাসনে আসীন স্বয়ং সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, তাঁর পাশের আসনেই বসে আছে জীবসিদ্ধি এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাঁদের গুরু আচার্য চাণক্য।

চাণক্য অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কী জানি ভাবছেন, চন্দ্রগুপ্ত এবং জীবসিদ্ধি নিজেদের মধ্যেই ফিসফিস করে হাস্যকর কিছু আলোচনা করছেন কারণ তাঁদের দু-জনেরই ঠোঁটে মিটমিটে হাসি। আলোচনা ফিসফিস করে করার কারণ যাতে তাঁদের আলোচনা চাণক্য শুনতে না পান।

'আচার্যর প্রেমিকা ছিল এটা বিশ্বাস করার চেয়ে, ভবিষ্যতে মানুষ আকাশে উড়তে পারবে এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সহজ।'

কথাটা বলে চন্দ্রগুপ্ত আরও একবার আড়চোখে তাঁদের গুরুর দিকে দেখে নিলেন। জীবসিদ্ধি হাসি লুকোতে মুখে হাত রেখে বলল,

'খবরটা কিন্তু সোজা গান্ধার থেকে আসছে, হে ভ্রাতা। আমার এক অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য সূত্র মারফত জানতে পেরেছি যে, পাষাণকঠিন চাণক্যর প্রতিও নাকি একজন নারী দুর্বল ছিলেন। এবং, সেই নারীকে আমরাও দেখেছি ছাত্রাবস্থায়।'

চন্দ্রগুপ্তর চোখ কৌতূহলে চকচক করে উঠল,

'সে কী হে? কে সেই নারী?'

'ভদ্রে, সুভাষীনিকে মনে আছে?'

চন্দ্রগুপ্তর মুখ অল্প খুলে গিয়েছে, চোখে বিস্ময়ের ছাপ। আরও একবার গুরুদেবের দিকে চোরাদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে উত্তেজনা চেপে প্রশ্ন করলেন,

'প্রধানাচার্য ভদ্রভট্টর ভগিনী সুভাষীনি?'

সবজান্তার মতো উপর-নীচে মাথা নাড়ল জীবসিদ্ধি। চন্দ্রগুপ্তকে চমকে দিতে পেরে সে প্রসন্ন হয়েছে। বলল,

'আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম নামটা শুনে। আসলে আমরা তখন কিশোর মাত্র, এত কিছু বুঝতাম না। কিন্তু তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে ভদ্রে, সুভাষীনি মাঝে মাঝেই আসতেন গুরুকুলে? আমাদের মতোই মুগ্ধ হয়ে আচার্যর পাঠ শুনতেন। আমরা ভাবতাম আমাদের মতোই হয়তো তিনিও আচার্যর একজন গুণমুগ্ধ। কিন্তু কে বলতে পারে, হয়তো তিনি আচার্যকে গুরুর চেয়েও বেশি কিছু ভাবতেন মনে মনে।'

চন্দ্রগুপ্ত ছাদের দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করলেন তাঁর কৈশোরের কথা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

'হতেই পারে। নারীর মন কেই-বা কবে বুঝেছে।'

সুযোগ পেয়ে জীবসিদ্ধি কটাক্ষ করে বলল,

'কেন? এখনও রানি দুর্ধরার মন বুঝতে পারলেন না, হে সম্রাট?'

চন্দ্রগুপ্ত মুখ ভার করে বললেন,

'তিনি আমার উপর রেগে আছেন গতকাল থেকে। কিন্তু কেন রেগে আছেন সে-বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই নেই। কৌতুক করে নাও ভ্রাতা সময় থাকতে। বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনিও শীঘ্রই তোমার কপালে দাম্পত্য সুখ প্রদান করেন। এমনিতেই তোমার এই সন্ন্যাসবেশ আমার দু-চোখের বিষ!'

জীবসিদ্ধি পালটা কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল তখনই চাণক্যর গলা শোনা গেল,

'তোমার প্রধানমন্ত্রীর আর কতক্ষণ বিলম্ব হবে হে, চন্দ্রগুপ্ত? আমার সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার সময় হয়ে গেল যে।'

কথা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে প্রহরীর কণ্ঠ শোনা গেল,

'প্রধানামাত্য মহোদয় সভায় পদার্পণ করছেন!'

রেশমের পর্দা সরিয়ে সভায় অমাত্য রাক্ষস প্রবেশ করলেন। তাঁর একহাতে একটি ভূর্জপত্র এবং অন্যহাতে লাল কাপড়ে মোড়ানো কিছু একটা রয়েছে। এগিয়ে এসে তিনি সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্যকে প্রণাম জানালেন। চন্দ্রগুপ্ত ইশারা করতে তিনি নিজের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসলেন সম্রাটের ঠিক ডান দিকে।

আপনাদের অপেক্ষা করানোর জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে আজকে রাজকোষে জমা পড়া রাজকরের হিসাবটা কোষাধ্যক্ষের থেকে আজকেই বুঝে না নিলে অকারণ

বিলম্ব হত। স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত শুধুমাত্র রৌপ্যমুদ্রা ও অন্যান্য ছোটো মুদ্রায় এরকম বিপুল অর্থের হিসাব রাখতে সমস্যা হচ্ছে সকলেরই।

চন্দ্রগুপ্ত ও জীবসিদ্ধি একে অন্যের প্রতি একবার শুধু অস্বস্তিসূচক দৃষ্টি বিনিময় করল। স্বর্ণমুদ্রার কথা উঠতেই তাঁদের দু-বছর আগের ঘটনার কথা স্মরণে এসে যায় বার বার। চাণক্য অবশ্য নির্বিকার। তাঁর মুখ দেখে তাঁর মনে কী চলে বোঝার উপায় নেই।

অমাত্য রাক্ষস বললেন,

'আপনাদের অযথা আর সময় নষ্ট না করে কী কারণে আজকের আলোচনা সভা, সেটা বলি। আজকে সকালে এই পত্র এসেছে উত্তরের পার্বত্য প্রদেশের আমাদের মিত্ররাজ্য কুলূতের রাজধানী নাগর থেকে। পত্রটি আগে আমি আপনাদের পাঠ করে শোনাই।'

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর জয়।

বড়ো বিপদে পড়ে কুলূত আজকে মগধের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে। আমাদের রাজা সুবর্মাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এই মুহূর্তে তিনি শয্যাশায়ী। প্রতিবেশী রাজ্য অর্থাৎ পর্বত্যকার রাজা মলয়কেতু আমাদের সীমানায় সৈন্যশিবির বসিয়ে অপেক্ষারত। রাজার এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সে আমাদের রাজ্য দখল করতে তৎপর। প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার মানুষের ভিড়ে ও কড়া সুরক্ষাবেষ্টনীর মধ্যেও কোন অলৌকিক উপায়ে আততায়ী মহারাজের উপর শর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হল এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই।

এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের মহামতি চাণক্যর বুদ্ধিমত্তা ও উপদেশ বড়োই প্রয়োজন। আমি প্রার্থনা করি তিনি যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের রাজ্যে পদার্পণ করে আমাদের এই সমূহ বিপদের থেকে উদ্ধার হওয়ার মার্গ নিদর্শন করুন।

আমাদের সেনাসংখ্যা সীমিত এবং আক্রমণ হলে পর্বত্যকার বিপুল সেনার প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। মগধের কাছে আমার অনুরোধ যেন অবিলম্বে তার সেনাবলে আমাদের সাহায্য করেন।

এক বিশেষ প্রয়োজনে আর্য জীবসিদ্ধির উপস্থিতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে ছদ্মবেশে আপনাদের এই রাজ্যে প্রবেশ

করার অনুরোধ রইল। আশা রাখি, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ইতি,

চিত্রবর্মা

পাঠ শেষ করে প্রধানামাত্য রাক্ষস সম্রাটের দিকে তাকালেন। মুখে তাঁর বরাবরের মতোই কোনো ভাব প্রকাশ পাচ্ছে না।

চন্দ্রগুপ্ত দু-দিকে ঘাড় নেড়ে বললেন,

'যেহেতু কুলূত মৌর্য সাম্রাজ্যের অঙ্গ অতএব সাহায্য আমি করব। আগামীকালই আপনি উত্তরে উপযুক্ত সংখ্যক সেনা পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। কিন্তু আচার্যকে মগধের সীমানার বাইরে পাঠানোর প্রশ্নই আসে না।'

কিছুটা থেমে চাণক্যর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রগুপ্ত আবার বললেন,

'গতবার আচার্যকে রাজ্যের বাইরে যেতে দিয়ে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। না না, এই পত্র যে কোনো ফাঁদ নয় তার কী নিশ্চয়তা আছে? আচার্যর অনুপস্থিতিতে মগধের উপর আবার কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসবে না তার নিশ্চয়তা কী?'

চাণক্য এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলেন, এইবার বললেন,

'গতবারের তুলনায় এইবার একটি গুরুত্বপূর্ণ তফাত আছে, সম্রাট। আমি নিশ্চিত যে, আমার অনুপস্থিতেও মগধ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। কারণ এখন মগধের প্রধানমন্ত্রী পদে আছেন মহামতি কাত্যায়ন। তাঁর বুদ্ধি এবং প্রশাসনিক দক্ষতার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে।'

নিজের প্রশংসা নিজেরই একদা প্রধান-শত্রুর মুখে শুনে তিনি খুশি হলেন কি না সেটা যথারীতি তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল না। চন্দ্রগুপ্ত এইবার তাঁর দিকে ফিরে বললেন,

'ক্ষমা করবেন প্রধানামাত্য, আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করবেন না। আমি আপনার কর্মনিষ্ঠা ও বুদ্ধির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখি। কিন্তু তবুও আপনিও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আচার্য চাণক্যর মগধ ছেড়ে যাওয়াটা বিপজ্জনক। এমনকী তাঁর প্রাণ সংশয়ও আছে।'

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে অমাত্য রাক্ষস বললেন,

'আমি সম্রাটের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। যতদিন না আচার্য শকুনি ধরা পড়ছে, ততদিন আপনার পাটলিপুত্র ছেড়ে বেরোনোও নিরাপদ নয়।'

চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

‘প্রসঙ্গত, আর্য জীবসিদ্ধি, আপনার গুপ্তচররা আচার্য শকুনির বিষয়ে কিছু সন্ধান পেয়েছে কি?’

জীবসিদ্ধি হতাশ ভঙ্গিতে বলল,

‘এখনও অবধি না। আসলে আমাদের হাতে সূত্র প্রায় কিছুই নেই। আমাদের কাছে একমাত্র সূত্র হল কয়েকটি বিষাক্ত বাণ যা দিয়ে আমাদের সৈনিকদের মগধে এবং ইন্দ্রজিৎকে তক্ষশিলায় হত্যা করা হয়েছিল। আমার কিছু বিশেষ গূঢ় পুরুষ সেই বিশেষ বাণ এবং তাতে ব্যবহার হওয়া বিষের সূত্র ধরে সারাদেশে খোঁজ করছে গত দু-বছর ধরে। কিন্তু গোটা আর্যাবর্তর এই বিশাল পরিধিতে মাত্র এই সূত্রের উপর নির্ভর করে কারুর সন্ধান পাওয়া কতটা কঠিন তা আপনারা অনুমান করতেই পারছেন।’

চাণক্য বললেন,

— কী বলছে তোমার পক্ষিরা?

ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ দিচ্ছে সকলে। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হল, আমার তিনজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত গূঢ়পুরুষ স্বতন্ত্র তিনটি সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আচার্য শকুনি গান্ধারে বিদ্রোহীদের হাতে চার বছর পূর্বেই নিহত হয়েছেন, যা আমরা জানি সত্য নয়।

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

— এগুলো রাজনীতির পরিচিত কৌশল। আমার নিশ্চিত মৃত্যুসংবাদও যে কতবার মগধ পেয়েছিল তার হিসাব কাত্যায়ন দিতে পারবেন।

জীবসিদ্ধিকে খুব একটা সন্তুষ্ট মনে হল না। নিজের মনেই একবার বলল,

কিন্তু আমার সূত্রগুলো এতটাই বিশ্বস্ত যে, তাঁদের এভাবে ভুল পথে কীভাবে শকুনি চালনা করতে সক্ষম হলেন সেটাই ভেবে আমি বিস্মিত। তাঁরা এর আগে কখনো বিফল হননি। প্রতিবার সঠিক খবর এনেছেন আমার কাছে। চন্দ্রগুপ্ত বললেন, -

আমি সম্পূর্ণ আস্থা রাখি জীবসিদ্ধির গুপ্তচর বাহিনীর উপর। আমিও নিশ্চিত যে, খুব শীঘ্রই আমরা কোনো একটা সূত্র পাবই। কিন্তু আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আচার্যকে বা জীবসিদ্ধিকে মগধের বাইরে যেতে দেওয়ার কারণ দেখি না। মগধের রাজসভায় বিচক্ষণ অমাত্যের অভাব নেই। তাঁদেরই কাউকে যেতে বলুন আপনি প্রধানামাত্য মহোদয়। -

অমাত্য রাক্ষস কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। সেটা লক্ষ করেই চাণক্য বললেন,

আপনার বোধ হয় আরও কিছু বলার ছিল, মাননীয়?

অমাত্য রাক্ষস একবার চাণক্য এবং একবার চন্দ্রগুপ্তর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন,

– পত্রের সঙ্গে আরও একটি বস্তু তারা পাঠিয়েছে। মহারাজ চিত্রবর্মা আততায়ী যে তিরের আঘাতে আহত হয়েছেন, সেই বাণটিও পাঠিয়েছেন।

কোলের উপর লাল কাপড়ে মুড়িয়ে রাখা জিনিসটা সাবধানে বের করলেন অমাত্য রাক্ষস।

তিরের মুখে একটুকরো কাপড় জড়িয়ে রাখা হয়েছে যাতে সেটার বিষাক্ত ফলার সংস্পর্শে কেউ না আসে। কিন্তু তবুও বোঝা যায় সেটার আকার সাধারণ তিরের চেয়ে আলাদা। পালক লাগানো অন্য মাথায় লাল সুতো অতি যত্নে পেঁচানো। এই বিশেষ ধরনের বাণ সকলের অতিপরিচিত।

জীবসিদ্ধি এবং চন্দ্রগুপ্ত একসঙ্গে বলে উঠল, শকুনি!

---

*কুলূত/ কিলিত – বিয়াস নদীর উপত্যকায় অবস্থিত রাজ্য, বর্তমানে যা হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত। ‘কুলূ’ নামটি সম্ভবত এখান থেকেই এসেছে।

২.

চাণক্যর কপালে চিন্তার ভাঁজ। একদৃষ্টিতে তিরটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, – মগধের কাছে জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য প্রার্থনার কারণটা বোধ হয় আমি অনুমান করতে পারছি। কুলূতরাজ সুবর্মা বোধ হয় ইহজগতে নেই। এই বাণের ফলায় থাকা বিষ মানুষের রক্তের সংস্পর্শে এলে সেই ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত। পত্রতে রাজার মৃত্যুসংবাদটি লেখা হয়নি কারণ সম্ভবত রাজার মৃত্যুর খবর তারা সাধারণের কাছে প্রকাশ করেনি এখনও।

জীবসিদ্ধি বলল,

পত্র মাঝপথে যদি শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে যায়, সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই পূর্ণ সত্য লেখা হয়নি। আমার কাছে খবর আছে যে, কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মহারাজ সুবর্মা তাঁর মহলের বারান্দা থেকে বসন্ত উৎসব পর্যবেক্ষণ করার সময়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

রাজমহলের বাইরে জমায়েত হওয়া অনেক মানুষই তা দেখেছে। তার মানে আসলে তাঁর উপর বাণ নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে।

চাণক্য বললেন,

কিন্তু এই বাণটি যে সম্পূর্ণ বিষয়টির গুরুত্ব অনেকটা বাড়িয়ে দিল, সম্রাট। বিষয়টা খতিয়ে দেখতে হচ্ছে।

অমাত্য রাক্ষস বললেন,

— কিন্তু আচার্য চাণক্য, এই সম্পূর্ণ বিষয়টা যদি ষড়যন্ত্র হয়? জীবসিদ্ধি বলল,

আমার মতে আচার্য পাটলিপুত্রতেই থাকুন। আমি সেখানে গিয়ে আগে অবস্থা বিচার করি।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

আরও একটা বিষয় বুঝতে পারছি না। হঠাৎ জীবসিদ্ধির নাম আলাদা করে উল্লেখ কেন করা হল? তাকে বিশেষভাবে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পত্রে। এর কারণ কী হতে পারে? -

এর উত্তর আমিও অনুমান করতে পারছি না। তবে আমি কুলূত না যাওয়ার কোনো কারণ দেখি না। আমাদের হাতে সূত্র কম তা বোঝাই যাচ্ছে। এদিকে জীবসিদ্ধির গুপ্তচরদের তদন্তও এখনও অবধি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। এহেন অবস্থায় সশরীরে একবার কুলূতে উপস্থিত হলে হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে আসতে পারে। এই সুযোগ নষ্ট করতে পারি না আমি। বরং, আমি ও জীবসিদ্ধি বরাবরের মতোই বেরিয়ে পড়ি গোপনে। আমাদের সঙ্গে থাকুক মুষ্টিমেয় কিছু সৈনিক। এভাবে আমরা দ্রুত পথ অতিক্রম করতে পারব। আমাদের পেছনে আসুক মগধের কয়েক হাজার সৈনিক।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে চাণক্যর কথা বিচার করলেন। জীবসিদ্ধি বলল,

- বেশ। তবে আমার একটি পরামর্শ আছে। সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে একটু ভিন্ন পন্থা নিতে পারি আমরা।

— কীরকম?

চন্দ্রগুপ্তর প্রশ্নে জীবসিদ্ধি মৃদু হেসে বলল,

আগে কয়েক হাজারের সৈন্যদল কুলূতের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাক। তাদের মধ্যে থাকবে একটি বিশেষ রাজকীয় ধ্বজাসমেত ঘোড়ার গাড়ি, যাতে যদি-বা শত্রুরা আমাদের গতিবিধি নজর করে, তাদের ধারণা হবে যে, ওই ঘোড়ার গাড়িতেই আমি আর গুরুদেব যাচ্ছি। আমরা, সঙ্গে ছদ্মবেশে থাকা কয়েক জন সৈনিক নিয়ে এর দু-দিন পর রওনা দেব। কয়েক হাজার সৈনিকের পথ চলতে সময় লাগবে। আমরা কয়েক জন ঘোড়ার

সফর করব, তাই কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের অতিক্রম করে যাব। নাগরে আমরাই আগে পৌঁছে যাব ছদ্মবেশে।

সাধু! সাধু হে, জীবসিদ্ধি! তোমার অন্তরের ঘুমন্ত সদাসতর্ক গুপ্তচরের সত্তাটি যে সম্পূর্ণ জেগে উঠেছে। -

চাণক্য হেসে বলে উঠলেন। পরিকল্পনাটি চন্দ্রগুপ্ত ও রাক্ষসেরও পছন্দ হয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

- - দারুণ পরিকল্পনা। তবে তাই হোক। কিন্তু, তবুও আমার মন সায় দিচ্ছে না আপনাদের দু-জনকে এতদূর পাঠাতে।

আহা! মহাপরাক্রমী জীবসিদ্ধি থাকতে আমার ভয় কী?

গুরুর এ জাতীয় বক্রোক্তিতে জীবসিদ্ধি শুধু নাক নিয়ে একটা 'হুফ' শব্দ করল।

রাক্ষস কিছুটা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন,

পর্বত্যক মলয়কেতুর কিছু একটা করতে হবে। শুনছি নাকি সে উত্তরের পার্বত্য প্রদেশের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে মিলে বিদ্রোহের পরিকল্পনা নিচ্ছে। কুলূতের সীমানায় তার সৈন্যের তাঁবু ফেলাটা কিন্তু সেইরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে। চন্দ্রগুপ্ত বিরক্তির সঙ্গে বললেন,

মলয়কেতুর পিতা পৌরবরাজ বাস্তবে একজন মহান রাজা ছিলেন। কিন্তু মলয়কেতু হঠাৎ আমার বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে?

চাণক্য বললেন,

- সম্ভবত তাকে অন্য কেউ সাহস দিচ্ছে আড়াল থেকে।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন,

এই কারণেই বলেছিলাম যে, আমার বিবাহে যখন বরাহটি এসেছিল, তখনই ওকে গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করিয়ে দিতাম। দোষ ধনানন্দর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যেত।

নিজের প্রাক্তন প্রভু ধনানন্দর প্রতি এমন অবিচারের কথা শুনে অমাত্য রাক্ষস মুখ থেকে একটা 'ঘোঁত্' শব্দ করলেন। যদিও মুখ গম্ভীর রাখলেন।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত,

- - আরে প্রধানামাত্য মহোদয়, আমি আপনার সঙ্গে কৌতুক করছি মাত্র! ক্ষমা করবেন আমায়।

চাণক্যর নিজের ঠোঁটেও হাসির রেখা একমুহূর্তে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। গলার স্বর গম্ভীর রেখে বললেন,

এমন কথাবার্তা সম্রাটের মুখে শোভনীয় নয়। বিশেষ করে যখন তিনি সম্রাটের শ্বশুরমশাই।

চন্দ্রগুপ্ত মিত্রর প্রতি একবার রোষের দৃষ্টি হেনে প্রসঙ্গ পালটে অমাত্য রাক্ষসের উদ্দেশে,

বাদ দিন। তাহলে জীবসিদ্ধির পরিকল্পনা মতোই আপনি ব্যবস্থা করুন। আজকের সভা তাহলে এখানেই ইতি করছি।

সকলেই একসঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চাণক্য ও জীবসিদ্ধি বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে চন্দ্রগুপ্ত পিছু ডাকলেন,

গুরুদেব।

দু-জন চলা থামিয়ে পেছনে ফিরলেন। চন্দ্রগুপ্ত আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন। বিদায়, আচার্য। বিদায়, ভ্রাতা।

উত্তর আর্যাবর্তর পার্বত্য প্রদেশের রাজা মলয়কেতুর রাজপ্রাসাদের অন্দরে এক গোপন সভা বসেছে। আজকে এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন উত্তরের চার রাজ্যের রাজা।

কক্ষে মলয়কেতু প্রবেশ করতেই অন্য চারজন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। মলয়কেতু নিজের আসন গ্রহণ করে সকলের উদ্দেশে বললেন,

আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আজকে এখানে, এই গুপ্তসভায় উপস্থিত হওয়ার জন্যে প্রথমেই আপনাদের সাধুবাদ জানাই। আজকের এই সভায় উপস্থিত থেকে আপনারা যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা আগামী দিনে শুধুমাত্র আমাদের পার্বত্য প্রদেশেরই নয়, গোটা আর্যাবর্তর ভবিষ্যৎ নির্মাণে উপযোগী প্রমাণিত হবে। আপনারা যদিও সকলেই সকলকে চেনেন, তবুও আমি পৌরবরাজ মলয়কেতু, এই সভার অনুসূচক হিসাবে আপনাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

মলয়কেতু নিজের বামদিক থেকে শুরু করলেন,

প্রথমেই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মলয়নগরের মহারাজ সিংহনাদ। উপস্থিত হয়েছেন কাশ্যপনগরের মহারাজা পুষ্করক্ষ, সিন্ধের শাসক সিন্ধুসেনা এবং সুদূর পারস্যের মহারাজ মেঘনন্দ। আমরা আজকে একই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছি, আমাদের একই শত্রু এবং সেই শত্রু আর কেউ নয় সেই শত্রু হল মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য!

কথা থামিয়ে একবার উপস্থিত চারজনের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন মলয়কেতু। তাঁর কথার যতটা প্রভাব মলয়কেতু ভেবেছিলেন তাঁর শ্রোতাদের উপর পড়বে, তা পড়েনি। রাজা সিন্ধুসেনা তো একবার 'হাই'-ও তুললেন। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে মলয়কেতু আবার বলা শুরু করলেন,

— আমার পিতা পৌরবরাজ পুরুর সঙ্গে মৈত্রী করে চন্দ্রগুপ্ত ও তার কুচক্রী গুরু কৌটিল্য মগধ বিজয় করে। তার এবং পিতার মধ্যে সাম্রাজ্য সমান দুভাগে ভাগ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওই কৌটিল্য। কিন্তু পিতার অসময়ে মৃত্যুর সঙ্গেই তাদের প্রতিশ্রুতি মগধ ভুলে যায়! চন্দ্রগুপ্ত একাই মগধের সিংহাসনে আসীন হয়! এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই অপমান কি আমরা, পার্বত্য রাজ্যরা মেনে নেব?

পুষ্করক্ষ মলয়কেতুর জ্বালায় নুনের ছিটে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন,

সেইসঙ্গে শুনলাম আপনার মনোবাসনায় জল ঢেলে চন্দ্রগুপ্ত রাজকুমারী দুর্ধরাকে বিবাহও করেছেন। -

এই কথায় অন্য তিনজনের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। মলয়কেতুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তার এই মুহূর্তে ইচ্ছে করছে চারজনেরই পেটে তরবারি চালিয়ে দিতে। এই উদ্ধত রাজারা কেন তার কথা মানবে না? সে পর্বত্যক পৌরবরাজ পুরুর সন্তান! তার পিতার সম্মুখে এরা মাথা নুইয়ে চলত, তবে তার বেলায় কেন এরকম অভদ্রতা?

বড়ো অসহায় লাগে মলয়কেতুর। আসলে সে এক মহান রাজার উত্তরাধিকারী হলেও পিতার কোনো গুণ বা সহজাত নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা পায়নি।

আজকের বক্তব্যের কথাগুলো তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই ব্রাহ্মণ যেভাবে শিখিয়েছে সে চেষ্টা করেছে সেভাবেই বলার, কিন্তু পারছে না। ওই ব্রাহ্মণকে ওর ভয় করে। লোকটার আশেপাশে থাকলেই অস্বস্তি হয় ওর। অথচ তাঁকে ছাড়া এতবড়ো ষড়যন্ত্র রচনা করার ক্ষমতাও মলয়কেতুর নেই। আজকের এই গুপ্তসভাও তারই পরামর্শে সে ডেকেছে। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। তবুও পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার জন্যে মলয়কেতু বলল,

আমি বিশ্বাস করি আমার পিতার মৃত্যুতেও ওই দুষ্ট চাণক্যর হাত আছে। আমরা একত্রিত হলে আমরা মগধকে পরাজিত করতে পারব।

সিন্ধুসেনা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর কিছুই নির্ভর করে না, মলয়কেতু অনেকে তো আবার এও বিশ্বাস করে যে, পৌরবরাজ পুরুর মৃত্যুর পেছনে আপনার হাত আছে। সে-প্রসঙ্গ থাক। আর আপনি যতটা সহজে বলছেন যে, মগধকে পরাজিত করা যাবে, তা আপনি কীসের ভিত্তিতে বলছেন? সকলেই জানে যে, আর্যাবর্তর যেকোনো প্রান্তে একটি কপোত ডানা ঝাপটা দিলেও সেই শব্দ চাণক্যর কানে যায়। তার উপর এই মুহূর্তে আবার তাদের মূল শত্রু অমাত্য রাক্ষসসহ নন্দর একদল সমর্থক এখন চন্দ্রগুপ্তর আনুগত্য স্বীকার

করেছে। নন্দকন্যাকে বিবাহের পশ্চাৎ মগধ এখন আরও শক্তিশালী। কে বলতে পারে হয়তো আজকের সভার খবরও ইতিমধ্যে ওই কৌটিল্যর কানে পৌঁছেও গিয়েছে। -

সেটা ঘটলে আমি জানব যে, আমাদের এই কক্ষেরই কেউ সেই ডানা ঝাপটানো কপোত। এবং, সেই কপোতের শুধু ডানা কেটেই আমি সন্তুষ্ট থাকব এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই, মহারাজ।

কথাটি কে বলল দেখার জন্যে প্রত্যেকের ঘাড় ঘুরে গেল যেদিক থেকে কণ্ঠস্বরটি ভেসে এসেছে সেদিকে। কক্ষের পর্দাঢাকা অন্ধকার কোণ থেকে একটি আকৃতি ধীরপায়ে আলোয় এসে দাঁড়াল। ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণ, কপালে তিলক, মুণ্ডিত মস্তকে কেশশিখা এবং বেশভূষা থেকেই বোঝা যায়। ঠোঁটের কোণে কুটিল হাসি এবং চোখের তাচ্ছিল্য প্রমাণ করে যে, একটু আগেই চারজন রাজাকে দেওয়া হুমকিটা নিতান্তই কথার কথা নয়। প্রয়োজনে তা করার ক্ষমতাও আছে এবং করবেনও।

ব্রাহ্মণকে দেখে খানিকটা একপাশে সিটিয়ে গেল মলয়কেতু। হঠাৎ তাঁকে দেখে বিস্মিত সে নিজেও হয়েছে কারণ ব্রাহ্মণের উপস্থিতির কথা তার নিজেরও জানা ছিল না।

— আপনি? আপনি কে? -

রাজা সিন্ধুসেনা প্রশ্নটা করে মলয়কেতুর দিকে তাকালেন উত্তরের আশায়। কিন্তু, উত্তর স্বয়ং নবাগত ব্যক্তিই দিলেন,

আমার নাম শঙ্কুমণি। পেশায় তক্ষশিলার শিক্ষক ছিলাম এবং গান্ধাররাজ অম্বির প্রাক্তন প্রধানামাত্য। আমার এই নাম সম্ভবত আপনাদের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, বিগত সময়ে মগধের দয়ায় আমার অপর নামটি আপনাদের সকলের কাছেই পরিচিতি পেয়েছে। আপনারা আমায় চিনবেন আচার্য শকুনি নামে। -

চারজন অতিথির মুখেই মৃদু গুঞ্জন উঠল নামটা শুনে। গত দেড় বছর ধরে গোটা আর্যাবর্তে যে ব্যক্তির সন্ধানে মগধের সেনা ও গুপ্তচররা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার নাম মৌর্য সাম্রাজ্য ও আশেপাশের সকল জনপদই জানে।

সকলেই শকুনির দিকে চাইল। নিজেদের মতামত জানানোর আগে এই ব্রাহ্মণের ভূমিকা জেনে নিতে চাইছে প্রত্যেকেই। আচার্য শকুনি প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,

আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হল চাণক্যকে পরাজিত করা। এবং, মগধের পরাজয় মানেই চাণক্যর পরাজয়। আপনারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন মানেই আপনারাও তাই চান। অতএব শত্রু যখন সকলেরই এক, তখন আমাদেরও এক হওয়াতেই সকলের লাভ। কিন্তু আপনারা ঠিকই বলেছেন, মগধ এই মুহূর্তে ঐরাবতসম শক্তিশালী। সেই হস্তীর

মুণ্ডচ্ছেদ করা এখনই সম্ভব নয়। যদিও একদিন আমরা সেটাও করব। কিন্তু তার পূর্বে মগধকে পঙ্গু অবশ্যই করতে হবে। মগধের অন্যতম শক্তির জায়গায় আমরা আঘাত করতে চলেছি শীঘ্রই।

---

*মলয়নগর – মলয়গিরি অঞ্চল/মালব্য

**কাশ্যপনগর নামকরণ হয়েছিল। কাশ্মীরের প্রাচীন নাম। কথিত আছে কাশ্যপঋষির নামে এই জায়গার

***পারস্য — পারশিয়া।

৪.

দু-সপ্তাহেরও বেশি টানা পথ চলার পর অবশেষে কুলূতের রাজধানী নাগর প্রবেশ করলেন চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি। মূল ফটকে অভিজ্ঞান মুদ্রা দেখিয়ে প্রবেশ করতে হল তাঁদের। সুরক্ষার বেশ কড়াকড়ি চলছে বোঝা যায়। চাণক্য ও জীবসিদ্ধি দু-জনেই নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখল। চাণক্যর পরিচয়পত্রে তাঁকে অবন্তির পণ্ডিত দেখানো হয়েছে আর জীবসিদ্ধিকে একজন মগধের বণিক। চাণক্য চাপাস্বরে জীবসিদ্ধিকে বললেন,

- বসন্ত উৎসবের ঘটনার পর থেকেই সুরক্ষা ব্যবস্থা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সম্ভবত।

জীবসিদ্ধি আর চাণক্য প্রবেশ করে ততক্ষণ অপেক্ষা করল যতক্ষণ না তাদের সঙ্গের আটজন ছদ্মবেশী সৈনিকও নগরের দ্বার পার করল। জীবসিদ্ধির নির্দেশমতো প্রত্যেকে একে অন্যের থেকে সামান্য ব্যবধান রেখে চলছে, যাতে তাদের দখলে কেউ এটা না বুঝতে পারে যে, এরা একসঙ্গে একটি দল।

নাগর নগরের মাঝখানে অবস্থিত রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের মূল ফটকে নিজেদের মগধের রাজমুদ্রা দেখিয়ে প্রবেশ করল দু-জন এবং তারপর একে একে তাদের আট অঙ্গরক্ষক সৈনিক। চাণক্য কুলূতের সৈনিকদের বললেন,

- আমাদের দয়া করে আর্য চিত্রবর্মার কাছে নিয়ে চলুন। এবং, আমাদের ঘোড়াগুলো দীর্ঘ পথযাত্রায় ক্লান্ত। এদের আস্তাবলে নিয়ে যান।

চাণক্য এবং জীবসিদ্ধিকে সভাকক্ষে অপেক্ষা করতে বলে সৈনিক চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই কক্ষে প্রবেশ করলেন এক সৌম্যকান্তি যুবক এবং এক মধ্যবয়সি ব্যক্তি। দু-জনেরই বেশভূষা থেকে বোঝা যায় তাঁরা রাজপুরুষ। যুবক প্রণাম জানিয়ে বললেন,

মহামতি চাণক্য এবং তাঁর সু-শিষ্য জীবসিদ্ধিকে নাগরে স্বাগত জানাই। আমি রাজা সুবর্মার ভ্রাতা চিত্রবর্মা। আপনাদের হয়তো মনে নেই কিন্তু আমাদের পূর্বেও সাক্ষাৎ হয়েছে। আর ইনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীশৈল।

চাণক্য লক্ষ করলেন শ্রীশৈল জীবসিদ্ধির দিকে তাকিয়ে আছেন স্থিরদৃষ্টিতে। মুখ কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে তাঁর। চাণক্য বললেন,

আমার সত্যিই আপনাকে স্মরণে নেই। কোথায় আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল বলুন তো? -

চিত্রবর্মা বললেন,

-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর বিবাহ অনুষ্ঠানে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ সুবর্মা যেতে না পারায়, কুলূতের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমিই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। যদিও এত অতিথিদের মধ্যে আপনাদের স্মরণে থাকার কথাও নয়। তা ছাড়া সেই অনুষ্ঠানে যা কাণ্ড হয়েছিল...। আচার্য, আপনি যেভাবে সমস্যার সমাধান করেছিলেন তা আমার জানা। আর সেই কারণেই আমাদের বর্তমান সমস্যাকালে আমার প্রথমেই আপনার কথা স্মরণে এসেছিল। আমি তো আশঙ্কায় ছিলাম যে, হয়তো আপনি আসবেন না। আপনি আসায় যে আমি অন্তত কতটা বুকে বল পেয়েছি তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আপনারা নিজেদের আগমনের সংবাদ পূর্বেই কেন আমাদের পাঠালেন না, মহামতি? তাহলে আমরা আপনাদের যথাযোগ্য সম্মানে নাগরে স্বাগত জানাতে পারতাম।

– তাতে ঝুঁকি ছিল, আর্য। আপনিও জানেন যে, এই মুহূর্তে মগধ ও কুলূত দুই রাজ্যকেই শত্রুদের আক্রমণের থেকে সাবধানে থাকতে হবে। তাই আমরা যতটা সম্ভব গোপনে এসেছি।

- – আপনার এই বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের জন্যে ধন্যবাদ, আচার্য।

জীবসিদ্ধিও লক্ষ করেছে যে, প্রধানমন্ত্রী এখনও তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কেউ একটানা নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে সকলের যেমন অস্বস্তি হয়, জীবসিদ্ধিরও তাই হচ্ছে এখন। তার অস্বস্তির পরিমাণ সাধারণের থেকে একটু বেশিই হচ্ছে, কারণ বহু বছরের অভ্যাসে সে নিজেকে অদৃশ্য রাখতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। চাণক্যই

তাকে শিখিয়েছেন যে, একজন প্রকৃষ্ট গুপ্তচর সে-ই যে পরিবেশের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। যে সকলের সম্মুখে থেকেও অদৃশ্য। যে এতটাই সাধারণ, যাকে আর পাঁচজন নাগরিকের থেকে আলাদা করে মনে রাখা যায় না। জীবসিদ্ধি নিজেকে সেভাবেই আজীবন প্রস্তুত করেছে।

জীবসিদ্ধির অস্বস্তিভাব লক্ষ করেই চিত্রবর্মা সহাস্যে বললেন,

প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে ক্ষমা করবেন। আসলে তিনি বিস্মিত, যেমন পাটলিপুত্রে প্রথমবার আর্য জীবসিদ্ধিকে দেখে আমিও হয়েছিলাম।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীশৈল লজ্জিত হয়ে চোখ সরিয়ে বললেন,

আমি দুঃখিত, আর্য জীবসিদ্ধি। আমাদের বিস্ময়ের কারণটা জানলে আপনিও উপলব্ধি করতে পারবেন।

চিত্রবর্মা বললেন,

সে-প্রসঙ্গ আজকে তোলা থাক। আমি নিশ্চিত কালকে সকালে মহারাজ সুবর্মার প্রতিকৃতি দেখে আর্য জীবসিদ্ধিও আমাদের মতোই বিস্মিত হবে। আজ সূর্যাস্তের দেরি নেই, আপনারাও দীর্ঘ পথ সফরে ক্লান্ত। আপনারা আজকে বিশ্রাম করুন, আপনাদের সঙ্গের সৈনিকদেরও আপনাদের কক্ষের নিকটেই বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। খালি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করি, আচার্য।

- হুম। বলুন?

মগধের সেনা কতদিনে নাগরে প্রবেশ করবে বলে আপনাদের অনুমান? এবং, তাদের সংখ্যা কত?

চাণক্য খানিক ভেবে বললেন,

আমরা মগধ ছেড়ে রওনা দেওয়ার দু-দিন পর সেনারা মগধ ছেড়েছে। তাই, অনুমান করি আগামী সাতদিনের মধ্যে তারা পৌঁছে যাবে। পার্বত্য এলাকার সংকীর্ণ পথ দিয়ে আমরা এসেছি বলে আমাদের সময় অনেকটাই কম লেগেছে। দেড় হাজার সেনাবাহিনী ওই পথে আসতে পারবে না। তাই তারা তুলনামূলক সমতল পথ ধরে কুলূতে প্রবেশ করবে। যদিও তাদেরও পথে পাহাড় পড়বেই। তবুও সেই পথ অনেকটাই প্রশস্ত।

চিত্রবর্মা এবং শ্রীশৈল একে অন্যের দিকে তাকাল। মনে হল চাণক্যর কথায় তাঁরা কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। চিত্রবর্মা বললেন,

আমরা খুবই নিশ্চিন্ত হলাম, আচার্য। দশদিন বাদে আমাদের কুলূত রাজ্যের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। তার আগে মগধের সেনা এখানে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কেন, সে-প্রশ্নের

উত্তর আগামীকাল আপনাদের সবিস্তার বলব। আজ আর আপনাদের ধরে রাখব না। আপনারা বিশ্রাম করুন। শুভসন্ধ্যা।

— সুপ্রভাত, আচার্য। -

চাণক্য তাঁর অভ্যাসমতো ভোরবেলা উঠে পূজাপাঠ সেরে ধ্যান করছিলেন। নিজের কক্ষের দরজায় করাঘাত শুনে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতে জীবসিদ্ধি প্রবেশ করল।

জীবসিদ্ধি ভেতরে ঢুকে জানতে চাইল

— চিত্রবর্মা বা শ্রীশৈল এসেছিল নাকি?

নাহ্। এখনও না।

- তাঁদের কাউকেই আমার সুবিধার লাগছে না। আপনার কী ধারণা? -

জীবসিদ্ধি, কোনো তথ্য ছাড়াই কারুর সম্বন্ধে আমার ধারণা জন্মায় না। আগে তো শুনি তাঁদের বক্তব্য কী। রাজা সুবর্মাকে কীভাবে হত্যা করা হল সেটা জানি আগে। -

আবার দরজায় করাঘাত হতে জীবসিদ্ধি উঠে গিয়ে দ্বার খুলে দিল। চিত্রবর্মা ও শ্রীশৈল দু-জনেই প্রবেশ করে প্রণাম জানালেন চাণক্যকে।

আপনাদের প্রাতঃভোজ, পূজা আদি সম্পূর্ণ হয়েছে? এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? কোনো অসুবিধা হলে নির্দ্বিধায় আমাকে স্মরণ করবেন মহামতি।

চাণক্য উত্তর দিলেন,

হুম। আমরা নিজেদের আহারের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছি, আর্য। আমরা স্বপাক আহার করি সাধারণত। আর আপনাকে জানাই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমাদের।

— তবে আপনাদের যদি অনুমতি থাকে আমরা কি আপনাদের সঙ্গে এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতে পারি?

অবশ্যই। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন আপনারা।

চিত্রবর্মা ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীশৈল চাণক্যর মুখোমুখি বসতে চাণক্য জিজ্ঞেস করলেন,

— এইবার বলুন আমাদের থেকে আপনি কী পরামর্শ আশা করছেন?

প্রশ্নের উত্তর শ্রীশৈল দিলেন,

প্রথমত আপনাদের কাছে আমাদের একটি স্বীকারোক্তি আছে। আমরা পত্রে একটি অসত্য কথা লিখেছিলাম, সেটা এইক্ষণে জানিয়ে রাখি। আপনার স্মরণে আছে নিশ্চয়ই যে, পত্রে জানিয়েছিলাম, আমাদের রাজা সুবর্মা গুরুতর আহত হয়ে শয্যাশায়ী। কথাটা মিথ্যা।

- - হুম, তিনি মৃত। বাণের আঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

শ্রীশৈল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

আমি জানতাম আপনি এই কথাটা অনুমান করতে পারবেন। কারণ, আসল পরিস্থিতির গম্ভীরতা সঠিক অনুমান না করলে আপনি এখানে সশরীরে আসতেন না। আশা করি, এইবার বুঝতে পারছেন আচার্য কেন আপনার পরামর্শের আমাদের প্রয়োজন। গত একমাস যাবৎ আমাদের রাজ্য শাসকহীন হয়ে রয়েছে। এই গোপন কথা আমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন ব্যতীত আর কেউ জানে না।

— হুম। কিন্তু, কেন? রাজসিংহাসনে বসতে আর্য চিত্রবর্মার আপত্তি কোথায়? উত্তরে চিত্রবর্মা বললেন,

আচার্য, যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর সমাধান হওয়ার আগেই আমি রাজসিংহাসনে বসি, তবে জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগবে যে, তাঁকে হত্যা করার পেছনে আমার হাত আছে। আমি এই অপবাদ নিয়ে সিংহাসনে বসতে পারব না, আচার্য।

— তাহলে আপনারা আমাদের কাছে কী সাহায্য চাইছেন?

— আমি চাই আপনি মহারাজ সুবর্মার হত্যারহস্যের সমাধান করুন।

- কিন্তু আমি যে সেই রহস্যের সমাধান করতে পারবই তার নিশ্চয়তা কী? তা ছাড়া তাতে সময় লাগবে। ততদিনের মধ্যে যে পর্বত্যক মলয়কেতু আক্রমণ করবে না, তাই-বা কে বলতে পারে? আমি নিশ্চিত ইতিমধ্যে প্রজাদের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, হয়তো তাঁদের রাজা মৃত। আমার কিন্তু মনে হয় না শত্রুরা আগামী দশদিন অপেক্ষা করবে। তারাও নিশ্চিতভাবে সন্দেহ করছে যে, সম্ভবত তাদের আক্রমণ বৃথা যায়নি।

আপনি ঠিকই বলেছেন, আচার্য। আর সেই সমস্যার একটি সমাধানও আছে। আর সেই সমাধান আমাদের দিতে পারেন, আর্য জীবসিদ্ধি। জীবসিদ্ধি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল,

— আমি?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাশয়। আপনি।

ক্ষমা করবেন, আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। সত্যি বলতে আপনার পত্রে আমাকে বিশেষ করে আসতে অনুরোধ করার কারণও আমার অনুমানের বাইরে।

চিত্রবর্মা ও শ্রীশৈল একে অপরের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন। চিত্রবর্মা বললেন,

আমার সঙ্গে আসুন আপনারা। আপনাদের আমি কিছু দেখাতে চাই। -

চিত্রবর্মা ও মন্ত্রী শ্রীশৈল তাঁদের দুই অতিথিকে নিয়ে কয়েকটি কক্ষ পেরিয়ে একটি বড়ো কক্ষে নিয়ে এল। সেই কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে ভেষজ রঙে আঁকা বেশ কিছু রাজপুরুষের প্রতিকৃতি। একটি বিশেষ ছবির সামনে এসে চিত্রবর্মা বললেন,

— এই হলেন আমাদের রাজা সুবর্মা।

ছবিটা দেখতেই চাণক্য ও জীবসিদ্ধির মুখ থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ নিজে থেকেই বেরিয়ে এল। কারণ চিত্রতে যে রাজপুরুষটিকে দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে জীবসিদ্ধির আশ্চর্য চেহারাগত মিল। মাথায় শির পরিবর্তে কুঞ্চিত ঘন কেশ ও রাজবেশ বাদে আর কোনো পার্থক্য নেই।

চাণক্য ও জীবসিদ্ধির বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চিত্রবর্মা বললেন, - সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর বিবাহের অনুষ্ঠানে পাটলিপুত্র গিয়ে আমিও জীবসিদ্ধিকে দেখে একইরকম বিস্মিত হয়েছিলাম। আশা করি, এইবার আপনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর গতকালের ব্যবহারের জন্যে তাঁকে ক্ষমা করবেন, জীবসিদ্ধি মহাশয়। তিনিও একই কারণে কালকে আপনাকে দেখে বিস্মিত হয়ে চেয়ে ছিলেন আপনার দিকে।

শ্রীশৈল বললেন,

আমি সত্যিই খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম কাল। এই মিলের কথা রাজকুমার চিত্রবর্মা কয়েক মাস পূর্বে পাটলিপুত্র থেকে ফিরে এসেই বলেছিলেন মহারাজ ও আমাকে। কিন্তু অস্বীকার করব না, আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি যে, এরকম ঘটতে পারে। আমি ভাবছিলাম যে, হয়তো সামান্য মিল আছে, রাজকুমার একটু বেশিই বলছেন। কিন্তু কালকে জীবসিদ্ধি মহাশয়কে দেখেই বুঝতে পারি যে, রাজকুমার কিছু ভুল বলেননি। -

তাঁর কথার রেশ ধরেই মৃদু হেসে চিত্রবর্মা বললেন,

- যদিও এই চিত্রটি দশ বছর আগের। অতএব জীবসিদ্ধিকে মহারাজ সুবর্মার ভূমিকায় উত্তীর্ণ হতে গেলে খানিকটা অতিরিক্ত ছদ্মবেশের প্রয়োজন পড়বে। সেব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছি।

- — মহারাজের ভূমিকায় মানে? আপনি চান আমিই স্বর্গীয় মহারাজ সুবর্মার ছদ্মবেশ ধরি?

জীবসিদ্ধির ভ্রূ কপালে উঠেছে। চিত্রবর্মা বললেন,

হ্যাঁ, মহাশয়। অন্তত প্রতিষ্ঠা দিবস অবধি আপনাকে এই কষ্টটুকু কয়েক বার সইতে হবে। শত্রুরা অপেক্ষা করে আছে নিশ্চিত হতে যে, রাজা সুবর্মা মৃত। দশদিন বাদে যদি প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজা জনসমক্ষে না আসেন তবে তারা নিশ্চিত হবে যে, তাদের বাণ বিফল হয়নি এবং তৎক্ষণাৎ রাজ্যে হামলা হবে। কিন্তু যদি জীবসিদ্ধি রাজার রূপে একবার দেখা দেন, তবে শত্রুরা দ্বন্দ্বে পড়বে এবং আমরা হাতে আরও সময় পেয়ে যাব। ততদিনে মগধের সেনাও এসে পড়বে। তাঁদের সাহায্যে আমরা রাজ্যের সুরক্ষাব্যবস্থা

গুছিয়ে নিতে পারব। অন্তত কুলূতের কথা ভেবে আপনি দয়া করে আমায় নিরাশ করবেন না, আর্য জীবসিদ্ধি। অনুরোধ রইল।

চাণক্য এতক্ষণ শুনছিলেন এই কথোপকথন। এইবার বললেন,

হুম। আপনাদের পরিকল্পনা হল জীবসিদ্ধিকে রাজা সাজিয়ে প্রজাদের সম্মুখে উপস্থিত করা, যাতে শত্রুদের কাছেও এই বার্তা পৌঁছায় যে, মহারাজ সুবর্মা জীবিত। তাতে তাদের কুলূত আক্রমণের পরিকল্পনা দোলাচলে পড়ে যাবে, আক্রমণ করতে বিলম্ব করবে। মগধের সেনাবাহিনী ততদিনে কুলূত প্রবেশ করবে। উত্তম পরিকল্পনা। কিন্তু যদি কেউ চিনে ফেলে যে, এ আসল রাজা নয়?

তা হওয়া সম্ভব না। কারণ আমরা জীবসিদ্ধিকে রাজবেশে দর্শন করাব রাজমহলের তৃতীয়তলার বারান্দা থেকে। সেখান থেকেই মহারাজ সুবর্মা উৎসবের দিনে অনুষ্ঠান দেখতেন। বারান্দা অনেকটা উচ্চতায় ও জনগণের ভিড় থেকে অনেকটাই দূরে থাকার কারণে কেউই স্পষ্ট দেখতে পাবে না জীবসিদ্ধি মহাশয়ের মুখ।

চাণক্য খানিকটা ভেবে জানতে চাইলেন,

যদি আমি খুব ভুল না করে থাকি, তবে সেই বারান্দাতেই কি মহারাজ শরবিদ্ধ হয়েছিলেন?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

– সেক্ষেত্রে কখনোই আপনার এই পরিকল্পনায় আমি সম্মতি দিতে পারছি না, আর্য। ক্ষমা করবেন।

চিত্রবর্মা ও শ্রীশৈল দু-জনেই অসহায়ের মতো প্রশ্ন করলেন, কেন? -

কারণ সেক্ষেত্রে প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাজার উপর পুনরায় আঘাত হানা হবে। আবারও হত্যার চেষ্টা করবে গুপ্ত ঘাতক একই উপায়ে। এবং, সেই কারণে জেনেশুনে আমি জীবসিদ্ধিকে প্রাণ সংশয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারি না। যদি না...

যদি না?

শ্রীশৈলর প্রশ্নের উত্তরে চাণক্যর কথার শেষটুকু জীবসিদ্ধি করল,

যদি না তার আগেই আচার্য মহারাজ সুবর্মার হত্যারহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারেন।

আমিও সেটাই চাই, আচার্য। সেই কারণেই তো সর্বপ্রথম আপনার কথাই আমার মাথায় আসে এই সংকটকালে।

চিত্রবর্মা উৎসাহী ভঙ্গিতে জীবসিদ্ধির কথার সমর্থন করল। চাণক্য একমুহূর্ত ভেবে শ্রীশৈলর উদ্দেশে বললেন,

মহাশয়, আমি প্রথমেই মহারাজ যে স্থানে শরবিদ্ধ হয়েছিলেন সেই স্থান দেখতে চাই।

মহামন্ত্রী চাণক্য এবং জীবসিদ্ধিকে পথ দেখিয়ে মহলের অন্যপ্রান্তে নিয়ে চললেন।

সেগুন কাঠের বড়ো একটি দরজা ঠেলে চারজন একটি প্রশস্ত খোলা বারান্দায় এসে পড়ল। শ্রীশৈল বললেন,

এই সেই বারান্দা, আচার্য। বারান্দা থেকে নীচে তাকালে দেখতে পাবেন মহলের সামনের বিশাল খোলা প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের দ্বার বিশেষ কিছু উৎসবের দিনে জনসাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। নাগরিকরা এই প্রাঙ্গণে একত্র হয়ে উৎসব পালন করে এবং রাজা একই বারান্দা থেকে তা প্রত্যক্ষ করেন। এটাই বরাবরের রীতি। সেদিনও দোল উৎসবে মেতে ছিল সকলে। তখনই অঘটন ঘটে গেল।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মহামন্ত্রী।

চাণক্য জানতে চাইলেন,

আমায় সেদিনের দৃশ্য আপনারা দু-জন বর্ণনা করুন। সর্বপ্রথমেই বলুন মহারাজ সুবর্মা ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে ছিলেন সেই সময়ে। উত্তর চিত্রবর্মা দিলেন,

ওই আপনি যেখানে এখন দাঁড়িয়ে, ঠিক সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মহারাজ। ওখানেই দাঁড়িয়ে দোল খেলা শেষের প্রতিযোগিতা দেখছিলেন।

- আর আপনারা? আপনারা কোথায় ছিলেন?

পিছিয়ে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চিত্রবর্মা বললেন,

কিছুটা ঠিক এইখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর ওই বারান্দার ডান দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর্য শ্রীশৈল।

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে চিত্রবর্মার কথা সমর্থন করলেন মন্ত্রী।

তারপর?

চিত্রবর্মা উত্তর দিলেন,

আমি মহারাজের দিকেই দেখছিলাম। হঠাৎই খেয়াল করলাম কালো মতো কিছু একটা ছুটে এল মহারাজের দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ছুটে গেলাম সঙ্গেসঙ্গে তাঁর কাছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছে গিয়ে বসে পড়তেই দেখতে পেলাম তাঁর গলায় বিদ্ধ হয়ে থাকা বাণটা! বুঝতে বাকি রইল না যে, একটু আগে মুহূর্তের জন্যে ধেয়ে আসা বস্তুটি কী!

হুম। তারপর?

বিমর্ষ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝুলিয়ে চিত্রবর্মা উত্তর দিলেন,

— তারপর আর কী? কিছুই করার সুযোগ পেলাম কই, আচার্য? মহারাজ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। রাজবৈদ্য বলেছিলেন যে, তিরের আঘাত থেকে যদি-বা মহারাজের প্রাণ বেঁচেও যেত, তীব্র বিষক্রিয়ার থেকে কোনোভাবেই রক্ষার কোনো উপায় ছিল না তাঁর।

রাজবৈদ্য মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে একবার। তাঁর মতামত জানা প্রয়োজন। যাই হোক, এবার আপনি বলুন, অমাত্য শ্রীশৈল। সেদিন কী ঘটেছিল? মহামন্ত্রী খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললেন,

আর্য চিত্রবর্মা যা বললেন, তাই। আমি আর আলাদা কী বলব, চাণক্য মৃদু হেসে বললেন, আচার্য?

— একই ঘটনা আলাদা আলাদা দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কতটা ভিন্ন হতে পারে তা আপনার ধারণার বাইরে, আর্য। তক্ষশিলায় এক দর্শনশাস্ত্রের গুণী আচার্য বলতেন যে 'বাস্তব' ব্যাপারটাই নাকি আপেক্ষিক এবং সেটি দর্শকদের উপর নির্ভরশীল। আমি আপনার জায়গা থেকে সেইদিন আপনি যা যা প্রত্যক্ষ করেছেন, সেটা জানতে চাই। কৃপা করে আপনি আরও একবার আমাদের বলুন যে, সেইদিন কী ঘটেছিল।

একটু ভেবে নিয়ে শ্রীশৈল বললেন,

আমি ওই যে... বারান্দার ওখানটায় দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতা দেখছিলাম। হঠাৎই মহারাজের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম উনি কেমন জানি টলমল করছেন এবং পরমুহূর্তে মাটিতে পড়ে গেলেন কাটা গাছের মতোই। আমি ছুটে গেলাম, ততক্ষণে চিত্রবর্মা মহারাজের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন, ঝুঁকে মহারাজকে সোজা করতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন। আমি প্রথমে দেখতেই পাইনি, কাছে যেতেই দেখলাম মহারাজের নিথর দেহ আর তাঁর গলা থেকে বেরিয়ে আছে একটি বাণ! উফ! বড়ো ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য!

তার মানে মহারাজের কাছে চিত্রবর্মাই আগে পৌঁছেছিল, তারপর আপনি?

হ্যাঁ।

চাণক্য চিত্রবর্মার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন,

— মহারাজ কীভাবে মাটিতে পড়েছিলেন? মানে, মুখের উপর নাকি পিঠ মেঝেতে ছিল?

— যেমন মন্ত্রী মহাশয় বললেন, ঠিক তাই। জ্যেষ্ঠ উলটে পড়েছিলেন। তাই প্রথমেই আমি তাঁর গলায় লেগে থাকা বাণটি দেখতে পাইনি। মেঝেতে বসে পড়ে তাঁকে সোজা করে শোয়াতেই তিরটা দেখতে পেলাম।

আশেপাশে তখন আপনারা দু-জন বাদে আর কেউ ছিল না?

দরজার পাশে দু-জন রক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের করার কিছুই ছিল না। তারাও মহারাজকে তিরবিদ্ধ হতে দেখেই ছুটে আসে সঙ্গেসঙ্গেই। নীচের প্রাঙ্গণে উপস্থিত অনেক দর্শকও সম্ভবত রাজাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখতে পেয়েছিল। কারণ প্রতিযোগিতা তখনই থামিয়ে দেওয়া হয়।

– হুম। আচ্ছা, দোল উৎসব শেষে কীসের প্রতিযোগিতা চলছিল?

– অনেক ধরনের প্রতিযোগিতাই চলছিল, আচার্য। ঘোড়ার দৌড়, মল্লযুদ্ধ, তিরন্দাজি...

চাণক্য হাত — কী বললেন? তিরন্দাজি? সেইসময়ে এই প্রাঙ্গণে তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা চলছিল?

তুলে কথার মাঝখানেই থামিয়ে দিলেন চিত্রবর্মাকে। বললেন,

শ্রীশৈল উত্তর দিলেন,

অঘটনের মুহূর্তে তিরন্দাজি প্রতিযোগিতাই চলছিল বটে। আপনি যা সন্দেহ করছেন সেটা আমরাও ভেবেছি। কিন্তু কিছুতেই ব্যাপারটা মিলছে না। প্রতিযোগিতায় আমাদের রাজ্যসহ অন্য রাজ্যের অনেক তিরন্দাজও অংশগ্রহণ করেছিল ঠিকই; কিন্তু একজন যত ভালো ধনুর্ধরই হোক না কেন, কয়েকশো লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে মহারাজের ওপর বাণ নিক্ষেপ করা কীভাবে সম্ভব?

অনেক কিছুই প্রাথমিকভাবে অসম্ভব মনে হয়, যতক্ষণ না সেটার উপায় বোঝা যাচ্ছে। যতই অসম্ভব হোক, সেই প্রতিযোগীদের মধ্যেই কেউ যে ছদ্মবেশী আততায়ী হতে পারে সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না পুরোপুরি। কিন্তু সেই প্রতিযোগীরা কি বর্তমানে এখানে আছেন এতদিন পরেও? তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা গেলে খুব ভালো হত।

উত্তর চিত্রবর্মা দিলেন,

আছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই এখানেই আছেন এই নাগরে। মহারাজের মৃত্যুর সংবাদ কেউ না জানলেও তাঁর ওপর তির চালিয়ে প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে, এটা সকলেই জানে। অতএব সেইসময়ে প্রাঙ্গণে উপস্থিত কাউকে গত একমাসে নাগর ছাড়তে দেওয়া হয়নি। সেইসময়েই উপস্থিত প্রত্যেকের তল্লাশি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই বিশেষ ধরনের বিষাক্ত তির কারুর কাছ থেকেই পাওয়া যায়নি। তাই আপনাদেরই অপেক্ষায় আমি ঘোষণা করিয়ে দিই যে, মহারাজ সুস্থ হয়ে ওঠা অবধি কেউ যেন রাজধানী ছেড়ে না যায়। প্রতিযোগীদের রাজ্যের খরচে ততদিন অতিথিগৃহে রাখার ব্যবস্থা হবে।

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

- আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন, আর্য। এই প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলব আমি। তবে তার আগে একবার দয়া করে রাজবৈদ্যকে উপস্থিত হতে বলবেন কি? মানে, যিনি মহারাজ সুবর্মার মৃতদেহ পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর মতামত জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিশ্চয়ই, আচার্য। এখুনি তাঁকে খবর দিচ্ছি। -

৭.

মধ্য আর্যবর্তর কোনো এক স্থান।

হে মাতা। শুনছেন?

মাথায় করে এক ঝুড়ি শুকনো কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল মসিন্দা। তার সংসারে সে আর তার রুগ্ণ স্বামী ছাড়া আর কেউ নেই। তাই কাঠ জোগাড় করতে তাকেই যেতে হয় জঙ্গলে। কিছু কাঠ নিজের বাড়ির রান্নার জন্যে রেখে বাকি কাঠ অন্য কারুর কাছে বিক্রি করে চাল কেনে সে। এভাবেই রোজকার অভাবের সংসার চলে তাদের দুটি মানুষের।

মসিন্দার শরীরে এখনও যৌবন ধরা পড়ে। তাই মসিন্দার স্বামী রুগ্ণ বলে অনেক পুরুষই সুযোগ খোঁজে তার কাছে আসার। মসিন্দা যে কাউকে সুযোগ দেয় না, তাও নয়। অভাব আর খিদে বড়ো বালাই। তাই সে সাধারণত পুরুষদের চোখে তাচ্ছিল্য বা কাম দেখতেই অভ্যস্ত; প্রায় সব নারীই তাতেই অভ্যস্ত। তাই 'মাতা' সম্বোধন উপেক্ষা করা কোনো নারীর পক্ষেই কোনোদিন সম্ভব নয়।

মসিন্দা দাঁড়িয়ে দেখল তাকে যে ডেকেছে সেই ব্যক্তির পোশাক অতি সাধারণ। বণিকও হতে পারে, আবার সৈনিকও। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ভদ্রগোছের এক যুবক।

আমাকে বলছেন?

যুবক উত্তর দিল,

আজ্ঞে, হ্যাঁ। আসলে আমি একজন পথিক। একজনের সন্ধানে আছি। আমার নাম অক্ষয়। আসছি অঙ্গরাজ্য থেকে। -

– হ্যাঁ, আমি এখানকার সবাইকেই চিনি। আপনি যে এই জায়গার মানুষ নন তা বুঝতেই পারছি। কার সন্ধান চাইছেন আপনি?

শুনেছি এই গ্রামে এক অত্যন্ত গুণী কামার থাকেন? তাঁর সন্ধান দিতে পারেন?

মসিন্দা এইবার সন্দেহের দৃষ্টিতে লোকটিকে আপাদমস্তক দেখে বলল,

— আপনি একজন কামার খুঁজতে এতদূর এসেছেন?

লোকটি হেসে উত্তর দিল,

আসলে অঙ্গের রাজা নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তুলছেন। তাঁর প্রয়োজন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, ঢাল ইত্যাদির। সেই কারণে সারাদেশ জুড়েই আমার মতো অনেক অনুচর পাঠিয়েছেন গুণী কামারদের খুঁজে নিযুক্ত করতে।

— ওহ্, আচ্ছা।

সন্দেহের মেঘ দূর হল মসিন্দার মন থেকে। বলল,

আমার সঙ্গে আসুন। আমি গ্রামেই ফিরছি। ওখানে বল্লভ আমাদের কামার। আমি তার কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

বলে মসিন্দা হাঁটতে শুরু করল খেতের মাঝের সরু আল ধরে। পেছন পেছন অক্ষয়ও আলের পথ ধরল। যেতে যেতে মসিন্দা বলতে লাগল,

বল্লভের হাতে জাদু আছে। ও দারুণ কাজ জানে লোহার। আপনি যেমন খুঁজছেন ঠিক সেইরকম কাজ পাবেন ওর কাছে দেখবেন।

কিছুক্ষণ চলার পর একটি ছোটো কুটির দেখিয়ে মসিন্দা বলল,

ওই যে, বল্লভের বাড়ি। ওই আওয়াজ শুনুন লোহার, সকাল সকাল কাজ শুরু করে দিয়েছে।

হাসিমুখে অক্ষয় বলল,

অনেক ধন্যবাদ, মাতা।

মসিন্দা বিদায় নিতে অক্ষয় কামারের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

লোহায় বার বার একই ছন্দে ভারী লোহার আঘাতের শব্দের কারণে একটু জোর কণ্ঠেই অক্ষয় ডাক দিল,

বল্লভ আছেন নাকি?

কে?

— আমি অক্ষয়, কামার বল্লভের খোঁজে এসেছি।

ভেতরে আসুন।

কুটিরের একটিই ঘরের এক কোণে কামারশাল বানানো হয়েছে। সেখানেই বসে একটি কুড়ুলের ফলা ঠুকে ঠুকে কাঠের হাতলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বল্লভ। অক্ষয়ের দিকে একবার দেখে নিয়ে জানতে চাইল,

- কী প্রয়োজন বলুন?

অক্ষয় তার অঙ্গাবস্ত্রের ভাঁজ থেকে একটি কাপড়ে মোড়া তির বের করে সেটা বল্লভের দিকে এগিয়ে দিয়ে জানতে চাইল,

এই বাণ কি আপনার বানানো?

বল্লভ একবার সেদিকে দেখেই বলল,

- না। এরকম অদ্ভুত তির আমি জন্মে দেখিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোল অক্ষয়। তিরটা সে আবার রেখে দিতে যাচ্ছিল, তবুও একবার প্রশ্ন করল,

কেউ এরকম তির বানায় কি না, জানেন?

বিরক্তির ভঙ্গিতে বল্লভ বলল,

এই সকাল সকাল কাজের মধ্যে কী অকারণ ব্যাপার নিয়ে পড়লেন, মহাশয়? আমার অনেক কাজ আছে।

অক্ষয় সঙ্গেসঙ্গে বলল,

— আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার সময়ের দাম হিসাবে এই সামান্য মুদ্রা রাখলাম। বল্লভ এইটা আশা করেনি। কিন্তু লোকটি সত্যিই একটি তাম্রমুদ্রা রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল দেখে পিছু ডাকল বল্লভ,

— দাঁড়ান, দাঁড়ান। একবার দেখি ওটা, দিন তো।

কামারের বাড়িয়ে দেওয়া হাতের দিকে তিরটি এগিয়ে দিল অক্ষয়। বল্লভ সেটি হাতে নিয়ে নাড়িয়েচাড়িয়ে দেখে বলল,

এটা তো একদম অন্য ধরনের তির। ফলা সূক্ষ্ম, ছোটো, খুব কম ধাতু ব্যবহারে বানানো। খুবই দক্ষ হাতের কাজ। এরকম তির আমাদের এদিকে কেউ বানায় না। তবে...

তবে?

তক্ষশিলায় একজন আছেন যিনি এরকম তির বানান বলে শুনেছি।

— কে? তাঁর নাম জানেন?

- বাবাক। সে ভিনদেশি এক অস্ত্র কারিগর। বহুদিন আগে তার কাছে কয়েকমাস আমি শিক্ষা নিয়েছিলাম। বাণটি তো পুরোনো বলে মনে হচ্ছে না। এটা কোথায় পেলেন? এটা আপনার কী প্রয়োজন?

প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই অক্ষয় আরও একটি মুদ্রা বের করে প্রথম মুদ্রাটির পাশে রাখল। তিরটি ফেরত নিয়ে আবার অঙ্গাবস্ত্রের মধ্যে ঢেকে ধন্যবাদ

জানিয়ে আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না। কুটির থেকে বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গালের ধারের উঁচু একটি টিলার দিকে হাঁটা দিল।

টিলার উপরে পৌঁছে মুখে দু-আঙুল দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করতেই জঙ্গাল থেকে একটি পারাবত উড়ে এসে তার সামনে বসল। বোঝা যায় পাখিটি প্রশিক্ষিত। অক্ষয় কোমরের কাপড়ের ভাঁজ থেকে একটি ফাঁকা মাদুলি, মোম, একটুকরো ভূর্জপত্র এবং একটি পাখির পালকের কলম বের করে আনল। খানিকটা কালো কালিও সঙ্গো ছিল। ভূর্জপত্রে অদ্ভুত বঙ্কিম ভঙ্গিতে অক্ষয় লিখল কয়েকটি ছাড়া ছাড়া শব্দ—

শর, কামার, বাবাক, তক্ষশিলা।

এরপর একটি অদ্ভুত কাণ্ড করল সে। কাগজের উপরের বাম কোণ আর নীচের ডান কোনা সামান্য ছিঁড়ে দিল লেখা বাঁচিয়ে। সোজা ভাঁজ না করে প্রথমে আড়াআড়ি, তারপর উপর-নীচের কোনাকুনি ভাঁজ করে সেটাকে ফাঁকা মাদুলির মধ্যে ভরে ফেলল। দুটি চকমকি পাথর ঘষে আগুন ধরিয়ে গলা মোম দিয়ে মাদুলির মুখ আটকে সেটি পারাবতটির পায়ে বেঁধে দিয়ে উড়িয়ে দিল উত্তরের আকাশে। পাখিটি আকাশে উড়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল অক্ষয়। এরপর আরও একবার একই শব্দ করে দ্বিতীয় একটি পাখি ডেকে আগের কাজেরই পুনরাবৃত্তি করল। তবে দ্বিতীয় পারাবতটিকে সে পূর্বের দিকে উড়িয়ে দিল।

প্রথমটির গন্তব্য তক্ষশিলা এবং দ্বিতীয়টির গন্তব্য পাটলিপুত্র। কারণ সকল গূঢ়পুরুষের উপরেই জীবসিদ্ধির নির্দেশ আছে যে, জরুরি গুপ্ততথ্য যেন কোনোভাবেই হারিয়ে না যায়। সব গুপ্ততথ্য, সংকেত ও সংবাদের একটি করে অনুলিপি যেন রাজধানীতে প্রেরণ করা হয় যাতে কোনোভাবে যদি প্রথম পারাবত তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে নাও পৌঁছায়, তবুও যেন সেই গুপ্ততথ্য মগধের গুপ্তচরদের প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছে যায় দ্বিতীয় পাখির মাধ্যমে। গুপ্তচর চক্রের, দেশের সকল গোপন তথ্যের কেন্দ্রীয়করণ কয়েক বছর আগেই জীবসিদ্ধি শুরু করেছে।

অক্ষয় যদিও মনে করে এধরনের বাড়তি ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু জীবসিদ্ধির সঙ্গো বহু বছরের পরিচয়ের কারণে অক্ষয় ভালোই জানে জীবসিদ্ধির সদাসতর্ক স্বভাবের কথা। জীবসিদ্ধির কাছে গুপ্ততথ্য সম্পর্কিত কোনো সতর্কতাই অতিরিক্ত নয়।

৮.

মাননীয় আচার্য চাণক্যর সাক্ষাতে আমি বড়োই আনন্দিত হলাম। আপনার অনেক নাম শুনেছি লোকমুখে, কিন্তু সম্মুখ সাক্ষাতে গর্বিত অনুভব করছি, মহামতি।

চাণক্য প্রতি-প্রণাম জানিয়ে রাজবৈদ্যকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। রাজবৈদ্য বলতে চাণক্য ও জীবসিদ্ধি যেমন অনুমান করেছিল যে, বৃদ্ধ কোনো ব্যক্তি হবে, তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কুলূতের রাজবৈদ্য চক্রাচার্য একজন বছর চল্লিশের যুবক। মেদহীন শরীরের কারণে তাঁকে দেখতে আরও বেশি যুবকের মতোই লাগে।

ইনিও কক্ষে ঢুকে জীবসিদ্ধিকে দেখে অবাক হলেন।

চাণক্য তাঁকে বললেন,

— আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমাদের জন্যেও বড়োই প্রয়োজনীয়, মহোদয়। বুঝতেই পারছি যে, একটি মস্ত গুপ্ততথ্যের বোঝা আপনাকেও গোপনে নিজের মধ্যে নিয়ে চলতে হচ্ছে গত একমাস ধরে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চক্রাচার্য বললেন,

হ্যাঁ, আচার্য। মহারাজ সুবর্মার মৃত্যুসংবাদ যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন মাত্র মানুষ জানেন, আমিও তাদের মধ্যে একজন। এতবড়ো একটি দুঃসংবাদ যে গোপন রেখে নির্বিকারে নিত্যকার কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া কতটা কঠিন তা বলে বোঝাতে পারব না।

- মহারাজকে সেইদিন বারান্দায় ঢলে পড়তে তো অনেকেই দেখেছিল।

-হ্যাঁ।

— আপনার কাছে কেউ জিজ্ঞেস করতে আসেনি যে, মহারাজের কী হয়েছে? কারণ সকলে নিশ্চয়ই জানে যে, আপনিই রাজার চিকিৎসা করছেন।

— হ্যাঁ, তা তো বটেই। রোজই জিজ্ঞেস করছে। আমি গত একমাসে এত মিথ্যে বলেছি, যা সম্ভবত আমার তিন পুরুষের বলা মিথ্যার চেয়ে বেশি। হুম। আর অচেনা কেউ আসেনি?

রাজার অচেনা? না, সেরকম তো কেউ আসেননি। যে কয়েক জন এখন অবধি আমার কাছে এসে সেদিনের কথা জানতে চেয়েছেন প্রত্যেকেই আমার পরিচিত। সন্দেহজনক কেউ তাহলে আপনার কাছে আসেনি?

নাহ্। কেউ না।

খোঁজ নিতে?

চাণক্য কী যেন ভাবলেন, তারপর অন্য মূল প্রসঙ্গে চলে গেলেন,

মহারাজের মৃতদেহ পরীক্ষা করে আপনার অভিমত জানতে চাই। একটু ভেবে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে দক্ষ ভঙ্গিতে বললেন,

— মহারাজ সুবর্মার মৃত্যু আমার ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই হয়ে গিয়েছিল। মহারাজকে ততক্ষণে যদিও সরিয়ে এনে ভেতরেই কক্ষে পালঙ্কে শুইয়ে দেওয়া

হয়েছিল। মহারাজের কণ্ঠে বিদ্ধ ছিল একটি বাণ, তাঁর কণ্ঠনালির বামদিকে। বাণটির ফলা যেখানে শেষ হয়েছে, তার পর থেকে কিছুটা লাল সুতো বাঁধা ছিল। তিরটি এতটাই তীব্রগতিতে কণ্ঠে আঘাত করেছে যে, ফলা ছাড়িয়ে সুতো বাঁধা কিছুটা অংশও ঢুকে ছিল গলায়। বাণটির অবস্থান দেখে মনে হয়েছিল যে, রাজার সম্মুখের দিক থেকেই শর নিক্ষেপ করা হয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে সেটা কণ্ঠনালির বামদিকে এমনভাবে বিদ্ধ হয়েছিল যাতে মনে হয় যেন হত্যাকারী সামান্য বামদিকে ছিল। কণ্ঠের আঘাতটি প্রাণঘাতী ছিল, তবে মহারাজের মৃত্যু সেই শরের আঘাতে হয়নি। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বিষক্রিয়ার ফলে।

চাণক্য প্রতিটা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। প্রশ্ন করলেন,

— আপনি নিশ্চিত?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। মহারাজের শরীর কালচে, দাঁত, নখ কালচে নীল হয়ে গিয়েছিল। যদি বাণের আঘাতেই মহারাজের মৃত্যু হয়ে থাকত, তবে তাঁর হৃদ্‌গতি থেমে যেত। এর ফলে রক্তের চলাচল বন্ধ হয়ে যেত এবং বিষ শরীরে রক্তের সঙ্গে মিশে ছড়িয়ে পড়তে পারত না। নখ কালচে হয়ে যাওয়ার মানে বিষ আগে ছড়িয়েছে, তারপর মহারাজের মৃত্যু হয়েছে।

— তিরের ফলায় বিষ ছিল?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। খুবই ভয়ঙ্কর ও দ্রুত কার্যকরী বিষ। আমি নিজে তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছি। গলার ক্ষতর কালচে রক্তের দাগ থেকেও নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ক্ষতে বিষক্রিয়া হয়েছে।

- শরীরে আর কোনো ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন ছিল?

— আজ্ঞে, না আচার্য। আমার অন্তত চোখে পড়েনি।

— মৃতদেহের সর্বাঙ্গে তৈল লেপন করে পরীক্ষা করেছিলেন কি?

সামান্য চমকে উঠে বৈদ্যর ঠোঁটে হাসি ফুটল। একবার জীবসিদ্ধি এবং তারপর চাণক্যর দিকে তাকিয়ে বললেন,

আমার সত্যিই জানা ছিল না যে, এই বিষয়েও আপনার এতটা জ্ঞান আছে, আচার্য। মৃতের শরীরে তেল মাখিয়ে পরীক্ষা করলে যে ছোটোখাটো আঘাত বা ক্ষতচিহ্নও সহজেই চোখে পড়ে, এই পদ্ধতি খুব বেশি মানুষের জানা নেই। আমি তো জানতাম আপনার বিষয় অর্থশাস্ত্র।

চাণক্য ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে উত্তর দিলেন,

অর্থশাস্ত্র একটি গোটা দেশকে সুশাসনে রাখার উপায় বলে, মহাশয়। দেশ মানে শুধুই অর্থনীতি, কর, রাজা, প্রজা নয়। এর সঙ্গেই থাকে অপরাধ, হত্যা এবং তদন্ত। এইসবের জ্ঞান ছাড়া অর্থশাস্ত্র অসমাপ্ত। আমি গত কয়েক বছর ধরে অর্থশাস্ত্রর একটি সম্পূর্ণ পুস্তক লেখার কাজে নিমজ্জিত আছি। তাতে শাসনব্যবস্থা ছাড়াও এই সকল বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব।

এ তো অতি উত্তম উদ্যোগ! আমার শুভকামনা রইল। এবং, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, আমি মহারাজ সুবর্মার মৃতদেহ তৈল লেপন করেই পরীক্ষা করেছি। কণ্ঠে বিষাক্ত তিরের ক্ষতটি ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

চাণক্য নিজের বুকের উপর পড়ে থাকা লম্বা কেশশিখায় আনমনে হাত বুলিয়ে শুধু বললেন,

হুমম। আর, শবব্যবচ্ছেদ? -

চক্রাচার্য সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন,

গোপনীয়তার স্বার্থে মহারাজের শবব্যবচ্ছেদও আমি নিজেই করেছি, আচার্য। শুধুমাত্র বিষক্রিয়ার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

চাণক্যকে বেশ কিছুটা সন্তুষ্ট মনে হল জীবসিদ্ধির। বোঝাই যাচ্ছে রাজবৈদ্যর পরীক্ষা পদ্ধতির বিবরণ শুনে তিনি খুশি হয়েছেন। চাণক্য বললেন,

— হুমম। আপনি খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে মহারাজের প্রতি নিজের শেষ দায়িত্বটি পালন করেছেন, মহাশয়। আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনার সঙ্গে কথা বলতে আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়ে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আশা করি আমাদের ক্ষমা করবেন। আপনি বিচক্ষণ মানুষ তাই নিশ্চয় বুঝতেই পারছেন যে, এইসব তথ্য আমার জানা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, আপনি কি পাকস্থলীতে অবশিষ্ট খাদ্য অগ্নিতে দিয়েও পরীক্ষা করেছিলেন?

এই প্রথমবার খানিকটা থতোমতো খেলেন বৈদ্য। উত্তর দিলেন,

– না, তা করিনি। কিন্তু, কেন?

আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে, অগ্নিতে 'চিট চিট' শব্দ ও অগ্নিশিখায় এবং ধোঁয়ায় রঙের পরিবর্তন লক্ষ করা গেলে, তা বিষক্রিয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অপ্রতিভ দেখাল চক্রাচার্যকে। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,

না, আচার্য। তা আমি করিনি। আসলে তীব্র বিষের উপস্থিতি যেখানে কণ্ঠের ক্ষতস্থান ও তিরের ফলায় প্রমাণিত, সেখানে আবার আলাদা করে বিষ খোঁজার প্রয়োজন বোধ করিনি। তা করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, মহামতি?

তা হয়তো নেই। আসলে দেখছিলাম আপনি কতটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজ করেছেন। আসলে এতে গোটা ব্যাপারটা একটা সম্পূর্ণতা পেত। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

হাতজোড় করে চক্রাচার্য বললেন,

আমায় লজ্জা দেবেন না, আচার্য। আমার সৌভাগ্য যে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আজকে। যদিও এই সাক্ষাতের কারণটা বড়োই দুঃখজনক। আমি প্রার্থনা করি যেন মহারাজের হত্যাকারী ধরা পড়ে এবং চরম শাস্তি পায়। প্রয়োজনে আমায় নির্দ্বিধায় আবার স্মরণ করবেন। আজকে তবে আজ্ঞা দিন। প্রণাম।

---

*এই অধ্যায়তে উল্লিখিত সকল মৃতদেহের শরীরে বিষ বা আঘাত চিহ্নের পরীক্ষা করার পদ্ধতির উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে করা আছে।

মৃতের পাকস্থলীতে পাওয়া খাবারে বিষ থাকলে সেই খাদ্যের অংশ আগুনের সংস্পর্শে আনলে 'চিট চিট' জাতীয় শব্দ হয় বা আগুনের মধ্যে রামধনুর মতো রং দেয়।

শরীরে আঘাত বা ক্ষত খোঁজার জন্যে মৃতদেহে তেল মাখিয়ে পরীক্ষা করার পদ্ধতিও অর্থশাস্ত্রে চাণক্য লিখে গিয়েছেন।

৯.

— ওহে জীবসিদ্ধি, এত একাগ্রচিত্তে কী ভাবছ?

নাগরের রাজমহলে চাণক্যর কক্ষে বসে জীবসিদ্ধি প্রদীপের শিখার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে কিছু ভাবছিল। চাণক্য তাঁর সন্ধ্যাকালীন আহ্নিকে চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হয়ে ছিলেন এতক্ষণ। জীবসিদ্ধির থাকার ব্যবস্থা চাণক্যর কক্ষের মুখোমুখি কক্ষেই করা হয়েছে। জীবসিদ্ধির নির্দেশে তাদের দ্বারের বাইরে দু-জন প্রহরী সর্বক্ষণ পালা করে প্রহরা দিচ্ছে। না, কুলূতের প্রহরীদের উপর জীবসিদ্ধি ভরসা করে না, তাই তাঁদের সঙ্গেই আসা মগধের সৈনিকদেরকেই প্রহরার দায়িত্ব দিয়েছে সে।

রাতের আহার দু-জনেরই শেষ। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যেতে ইচ্ছা করছে না জীবসিদ্ধির। তাই আচার্যকে বিরক্ত না করে তাঁরই কক্ষে চাণক্যর আহ্নিক সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা করছিল। চিন্তায় ডুবে থাকার জন্যে সে খেয়ালই করেনি কখন আচার্য চাণক্য চোখ খুলে ধ্যানভঙ্গ করেছেন ইতিমধ্যে।

চাণকর প্রশ্নে তাঁর দিকে ফিরল জীবসিদ্ধি। হঠাৎই তার গুরুর সঙ্গে খানিকটা কৌতুক করার ইচ্ছা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। চাণক্যর প্রতি ছদ্ম আহ্বান জানানোর ভঙ্গিতে জীবসিদ্ধি উত্তর দিল,

- আপনি তো বলেন আপনি নাকি মানুষের মনের কথা পড়তে পারেন। তবে নিজেই বলুন দেখি, কী ভাবছিলাম।

এ তোমার মিথ্যা অভিযোগ, জীবসিদ্ধি। মনের কথা পড়ে ফেলার ক্ষমতা আমার নেই এবং এ দাবি আমি কোনোদিন করিনি। আমি বলি যে, মানুষের অভিব্যক্তি, মুখের ভাব, শারীরিক ভাষা অভ্যস্ত চোখে পাঠ করা সম্ভব, যা থেকে অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিনির্ভর অনুমান করা সম্ভব যে, তার মনে কী চলছে।

ওই একই হল। তা আপনার 'যুক্তিনির্ভর অনুমান' আমার ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য তা বলুন দেখি।

চাণক্য তার ছাত্রের এহেন স্পর্ধায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। গত কয়েক বছরে তাঁদের সম্পর্ক গুরু-শিষ্য স্তর পার করে এখন অনেকটাই পিতা-পুত্রের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জীবসিদ্ধিও আজকাল সাহস করে তার আচার্যকে অনেক কিছুই বলে ফেলে যা ছাত্রাবস্থায় তার পক্ষে ভাবাও দুষ্কর ছিল। তারা উভয়েই জানে যে, জীবসিদ্ধি তার আচার্যের প্রতি কতটা অনুগত এবং তাঁকে নিজের মনে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনেই রাখে। তাই তাঁদের মধ্যে এহেন মশকরা চলে।

চাণক্যর ঠোঁটের একপাশে হাসির আভাস দেখা গেল। তিনিও ছদ্ম তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন,

- এইটা তো খুব সহজ। তুমি মগধের কথা ভাবছিলে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে তুমি পাটলিপুত্রর সুরক্ষার ব্যাপারে ভাবছিলে।

জীবসিদ্ধি কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে চাণক্যর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তর দিল,

একদম ভুল। আমি আজকে রাত্রের আহারে সুস্বাদু আপেলটির কথা ভাবছিলাম। -

- হুমম। এই যে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে না পারা, ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলা, এটাও কিন্তু ইঙ্গিতপূর্ণ। এর থেকে বোঝা যায় যে, সেই ব্যক্তি সত্য গোপন করার চেষ্টা করছে। নিজের গুরুকে মিথ্যা কথা বলা মহা পাপ হে, জীবসিদ্ধি। তাই স্বীকার করেই নাও যে, আমি ঠিক অনুমানই করেছি।

এইবার সশব্দে হেসে উঠল জীবসিদ্ধি এবং তার হাসিতে যোগ দিলেন চাণক্য। জীবসিদ্ধি হাসির মাঝেই বলল,

আপনার এই শারীরিক ভাষা পাঠের পদ্ধতিও সম্ভবত আপনি নিজের পুস্তকে নথিভুক্ত করতে চলেছেন?

অবশ্যই। কে বলতে পারে, হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। -

জীবসিদ্ধি পরাজিতর মতো দু-হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে বলল, - – বেশ, বেশ। আমি পরাজয় স্বীকার করছি। কিন্তু আপনি কীভাবে অনুমান করলেন যে, আমি মগধের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত?

সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? তুমি বরাবরই সাবধানী এবং সেই কারণেই তুমি এযুগের শ্রেষ্ঠ গূঢ়পুরুষ হতে সক্ষম হয়েছ। তাই রাজধানী ছেড়ে বেশিদিন আমাদের বাইরে থাকায় তোমার মনে আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া আজকে অন্তত দুবার আমি তোমাকে মগধের সৈনিকদের কাছে খোঁজ নিতে দেখেছি যে, পারাবত মারফত কোনো পত্র পাটলিপুত্র থেকে এসেছে কি না। অতএব আমার পক্ষে অনুমান লাগানো বেশ সহজ। -

—— আর-আপনি চিন্তিত নন?

নাহ্। রাক্ষস রাজ্য সামলে নেবে। -

কথাটা বলার সময়ে চাণক্য জীবসিদ্ধিকে নজর করছিলেন। প্রদীপের আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখলেন জীবসিদ্ধির মুখ গম্ভীর হল। চাণক্য সরাসরি প্রশ্ন করলেন,

– তুমি বোধ হয় এখনও অমাত্য রাক্ষসকে বিশ্বাস করে উঠতে পারোনি।

জীবসিদ্ধি আরও গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল,

না। আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না।

- আমায় করো তো?

-হ্যাঁ। -

- আর আমি রাক্ষসের উপর বিশ্বাস রাখি। তাই তোমারও কিছুটা রাখা উচিত। কিছুটা অধৈর্য ভঙ্গিতে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

– কিন্তু কেন? কেন তাঁর উপর আপনার এই আস্থা? সে কি এতগুলো বছর ধরে ধনানন্দর প্রতি অনুগত ছিল না? আমাদের প্রধান শত্রু তো আসলে সে-ই ছিল।

– ভুল করছ, জীবসিদ্ধি। আমি রাক্ষসের উপর নয়, নিজের মানুষের প্রবৃত্তি চেনার ক্ষমতার উপর আস্থা রাখি। আর অমাত্য রাক্ষসের নন্দের প্রতি আনুগত্য ছিল না, তার আনুগত্য ছিল মগধের প্রতি। সে জানে যে মগধকে রক্ষা করার উপায় হল চন্দ্রগুপ্তকে রক্ষা করা। এবং, সে তা করবেই।

জীবসিদ্ধি সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

- আমি জানি না, আচার্য। একথা সত্যি যে, রাক্ষস যেদিন থেকে আমাদের পক্ষে এসেছে সেদিন থেকেই তার প্রতিটি গতিবিধির উপর আমি নজর

রেখেছি। সন্দেহজনক কিছুর ইঙ্গিতই যে তার দিক থেকে দেখা যায়নি, সেটাও স্বীকার করি। কিন্তু এখন, আপনার বা আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যে সে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না, তার নিশ্চয়তা কই? যাই হোক। শুভরাত্রি, আচার্য।

জীবসিদ্ধি চাণক্যর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিক দরজা টেনে দিল। চাণক্য বন্ধ দরজার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদু হাসলেন। তারপর প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে মেঝের উপর গরম কাপড় পেতে করা বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

***

সিন্ধুপ্রদেশের রাজসভায় নিজের মদিরা প্রবর্তিত নিদ্রা ভেঙে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছেন মহারাজ সিন্ধুসেনা। এই গভীর রাত্রিতে এক দূত তাঁর কাছে একটি পত্র বয়ে নিয়ে এসেছে। পত্রের প্রেরকের নাম শুনে সিন্ধুসেনার নেশার ঘোর কাটতে সময় লাগেনি। যথাশীঘ্র এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে সেই দূতকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করার নির্দেশ দিয়েছেন সিন্ধুসেনা।

দু-জন সৈনিক তাঁর সামনে এক ব্যক্তিকে এনে হাজির করল। সেই ব্যক্তি মুখ ঢেকে এসেছে গোপনীয়তার স্বার্থে। মহারাজের সামনে এসে মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে অভিবাদন জানাল লোকটি,

-মহারাজ সিন্ধুসেনার জয় হোক। আমি নিপুণক, এসেছি মগধ থেকে। এই গভীর রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী, তবে গোপনীয়তা রক্ষার্থে অন্ধকারের চেয়ে সহজ মাধ্যম আর কীই-বা হতে পারে। আমি আপনার জন্যে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

– এই প্রস্তাব কি মগধের পক্ষ থেকে আসছে? -

- আজ্ঞে না। এবং, এটা অত্যন্ত জরুরি যেন মগধ কোনোভাবেই এই পত্রের কথা জানতে না পারে। আমার প্রভু এই প্রস্তাব গোপনে আপনার অবধি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন।

যদিও প্রভুর নামটা সিন্ধুসেনা আগেই শুনেছে, তবুও আরও একবার নিশ্চিত হতে জিজ্ঞেস করলেন,

– কে তোমার প্রভু?

- অমাত্য কাত্যায়ন!

দূত যুবকটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মহারাজ সিন্ধুসেনা। জিজ্ঞেস করলেন,

– এই পত্র যে সত্যিই অমাত্য রাক্ষ... মানে, অমাত্য কাত্যায়নের পক্ষ থেকে আসছে, তার প্রমাণ কী?

উত্তর না দিয়ে দূত নিজের কোমরে বাঁধা কাপড়ের ছোট্ট পুঁটলি থেকে একটি ভূর্জপত্র বের করে রাজার দিকে এগিয়ে দিল। সিন্ধুসেনা সেটি হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে প্রদীপের আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন।

পত্রের একদম শেষে দেখতে পেলেন তাঁর পরিচিত একটি চিহ্ন। অমাত্য রাক্ষসের অঙ্গুরীয় মুদ্রার সিলমোহর!

---

*সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে তার শারীরিক ভাষা, অভিব্যক্তি বা চোখের দৃষ্টি থেকে সে সত্য বলছে নাকি মিথ্যা তা বোঝার উপায়ের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে আছে।

**গূঢ়পুরুষ – গুপ্তচর/গোয়েন্দা/spy।

***অঙ্গুরীয় মুদ্রা – signet ring, নির্দিষ্ট ব্যক্তির চিহ্ন বা সিলমোহর খোদাই করা আংটি।

১০.

সকালে ঘুম ভেঙে সৈনিকদের থেকে জীবসিদ্ধি জানতে পারল যে চাণক্য অনেকক্ষণ আগেই উঠে পড়েছেন। প্রাতঃকালীন পূজাপাঠ আদি সেরে তিনি মহলের সম্মুখে বারান্দার দিকে গিয়েছেন।

আচার্যর সঙ্গে প্রহরী আছে?

প্রশ্ন করল জীবসিদ্ধি। তাকে আশ্বস্ত করে প্রহরী জানাল যে আচার্যর সঙ্গে একজন সৈনিক আছে।

কিছুটা স্বস্তিবোধ করল জীবসিদ্ধি। সে এখানে এসে থেকে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ওর বার বার মনে হচ্ছে বিপদ লুকিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। চাণক্যর প্রাণ সংশয় হওয়ার আশঙ্কা তার মাথায় সবসময় থাকে।

নিজের কাজকর্ম সেরে জীবসিদ্ধি মূল বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখল চাণক্য বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে আশপাশ পর্যবেক্ষণ করছেন। জীবসিদ্ধি ইশারায় মগধের সৈনিকটিকে চলে যেতে বলল। সে থাকতে আলাদা অঙ্গরক্ষকের প্রয়োজন চাণক্যর পড়বে না।

- সুপ্রভাত, আচার্য। -

তার দিকে চাণক্য ঘুরতে জীবসিদ্ধি দেখতে পেল চাণক্যর হাতে দু-টুকরো গুড়। একটুকরো জীবসিদ্ধির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চাণক্য বললেন,

সুপ্রভাত, জীবসিদ্ধি। এই নাও, আখের রস থেকে বানানো এই গুড়। খুব মধুর স্বাদের সঙ্গে একটা সুগন্ধও আছে। খাও, খাও। -

নাহ্। একদম না! এই সকাল সকাল ওই স্বাদ আমি সহ্য করতে পারব না। সবে কিছু ফল দিয়ে প্রাতরাশ সমাধা করেছি। আপনি কীভাবে যে সকালেই মধুরদ্রব্য খেতে পারেন তা আমার কাছে বরাবরের আশ্চর্য। -

চাণক্য নাসিকা দিয়ে একটা 'হুফফ' জাতীয় শব্দ করে বললেন,

জিভে মধুর স্বাদ না পেলে আমার মস্তিষ্ক কাজ করে না। তুমি কীভাবে যে এত কম মধুরদ্রব্য খেয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা করো তা বিষ্ণু জানেন।

– ঠিক যেভাবে আর পাঁচটা মানুষ থাকে, সেভাবে।

— হুমম। সেইজন্যেই তারা চাণক্য নয়, বুঝলে হে, জীবসিদ্ধি।

তর্কে গুরুকে হারানো তার পক্ষে অসম্ভব জেনেই জীবসিদ্ধি প্রসঙ্গ পালটাল। এই ঠান্ডা সকালে এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন আপনি, আচার্য?

আবার বারান্দা থেকে বাইরে ফিরে, দূরে চাইলেন চাণক্য। নাগর নগরীর শেষ সীমানায় দিগন্তরেখায় হিমালয় পর্বত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চাণক্য উদাস ভঙ্গিতে বললেন,

প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখছি হে, জীবসিদ্ধি।

জীবসিদ্ধি হাসি চাপার ভঙ্গিতে মুখে হাত দিল। চাণক্য সেটা খেয়াল করে গলায় কপট রাগ ফুটিয়ে বললেন,

হাসছ কেন? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কি আমার বোধগম্যের ঊর্ধ্বে?

নাহ। ঠিক উলটো। আপনি তো এইসব সৌন্দর্য ইত্যাদির ঊর্ধ্বে। তাই আপনার শিষ্য হিসাবে এইটা বিশ্বাস করতে পারলাম না যে, এই শীতের সকালে আচার্য চাণক্য প্রাকৃতিক শোভা দেখতে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ক্ষমা করবেন। কী দেখছেন এখানে দাঁড়িয়ে, আচার্য? -

চাণক্য এইবার গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,

মহারাজ সুবর্মা এই আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে শরবিদ্ধ হয়েছিলেন। নীচে ছিল একদল লোক, আর দুর্গের উঁচু প্রাচীরে দাঁড়িয়ে ছিল প্রহরীরা, কিছুটা করে তফাতে। ঠিক যেমন এখন দাঁড়িয়ে আছে। -

জীবসিদ্ধিও এগিয়ে গিয়ে চাণক্যর পাশে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল সত্যিই উঁচু, চওড়া প্রাচীরের উপরে কিছুটা ব্যবধানে এক-একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা গুড় ভেঙে মুখে দিয়ে চাণক্য বললেন,

- ধরে নেওয়া যেতে পারে উৎসবের দিন প্রহরী সংখ্যা আরও বেশি ছিল। এবং, এই চারদিক প্রাচীর ঘেরা বড়ো প্রাঙ্গণে ছিল অনেক সাধারণ নাগরিক এবং সৈনিক। এবার, এই নীচে ভিড় করা মানুষদের মধ্যে থেকেই একজন আততায়ী হতে পারে, অথবা বাইরের জনপদ থেকে আসা প্রতিযোগীদের কেউও হত্যাকারী হতে পারে। আবার, এও হতে পারে যে, এই সৈনিকদের মধ্যেই কেউ হত্যাকারী। হয় এই প্রাচীরের উপর থেকে অথবা নীচের প্রাঙ্গণ থেকে কেউ তির নিক্ষেপ করেছে।

সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলব প্রাচীরের উপর থেকেই বাণ নিক্ষেপ করা সহজ এবং সেই সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া, এই এখনও দেখুন বেশিরভাগ সৈনিকই বল্লমসহ তির-ধনুক অস্ত্রে সজ্জিত দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীরে। দূর থেকে আগত শত্রুর উপর আক্রমণ করার জন্যে ধনুর্বাণই সবচেয়ে কার্যকরী। তাই প্রাচীরে প্রহরা দেওয়া সৈনিকদের হাতে ধনুর্বাণ থাকবেই। তাদেরই মধ্যে কেউ হত্যাকারী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

-হুম।

– তবে প্রাঙ্গণে সেইসময়ে একদল দক্ষ ধনুর্ধরও উপস্থিত ছিল, সেটাও ভুললে চলবে না। নীচ থেকে উপরের দিকে বাণ নিক্ষেপ তুলনামূলকভাবে কঠিন হলেও, একজন দক্ষ ধনুর্ধরের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব নয়।

আর সাধারণ নাগরিক? তাদের মধ্যে থেকে কেউ ছদ্মবেশী হত্যাকারী নয় কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ?

সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে এই কাজ কীভাবে সম্ভব, আচার্য? একটি ছুরি বা সামান্য বিষ না-হয় কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখা সম্ভব, কিন্তু একটা গোটা ধনুক কি কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখা সম্ভব? প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে কি একটা ধনুক আর বাণ নিয়ে এই মহলের প্রাঙ্গণে ঢোকা সম্ভব? কখনোই নয়।

শেষ গুড়ের অংশটাও মুখে দিয়ে চাণক্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

- হুমম। সব যুক্তিই তো বুঝলাম, হে জীবসিদ্ধি। কিন্তু কোন জাদুবলে এতগুলো লোকের দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা রাজার দিকে তির মারা সম্ভব সেটাই তো বুঝতে পারছি না। কোনো যুক্তিতেই যে এই প্রশ্নের উত্তর হয় না।

একটু ভেবে জীবসিদ্ধি বলল,

প্রহরীরা নিশ্চয়ই প্রাচীরে দাঁড়িয়ে নীচের প্রাঙ্গণে খেলা দেখায় ব্যস্ত ছিল। এই অবস্থায় নীচে দাঁড়িয়ে থাকা কারুর পক্ষে সবার অলক্ষে ধনুকে বাণ চড়িয়ে সেটা নিক্ষেপ করা সত্যিই অসম্ভব। অতএব, আমার প্রথম যুক্তির দিকেই কিন্তু পাল্লা ভারী হচ্ছে, আচার্য।

অর্থাৎ, তুমি বলতে চাইছ যে প্রাচীরে সেইসময়ে প্রহরায় থাকা সৈনিকদের মধ্যে থেকেই কেউ হত্যাকারী? -

হ্যাঁ। ভেবে দেখুন, সকল সৈনিক নীচে প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিযোগিতা, উৎসব দেখতে মগ্ন। সেই সুযোগে যদি কোনো একজন সৈনিক বাণ নিক্ষেপ করে, হয়তো তার পাশেরজনও টের পাবে না।

চাণক্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,

-জীবসিদ্ধি, এই মুহূর্তে প্রাচীরে কতজন প্রহরী আছে গুনে দেখো তো

— ত্রিশজন। গুনে দেখেছি আগেই।

-বেশ। তাহলে উৎসবের দিন আরও বেশি সংখ্যক প্রহরী ছিল প্রাচীরে। অন্তত আরও কুড়িজন তো ছিল বলেই অনুমান। জিজ্ঞেস করলে সঠিক সংখ্যাটাও জেনে যাব সহজেই।

— হ্যাঁ, ঠিকই।

- তবে এবার বলো, যদি-বা এই নীচের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকশো মানুষের কথা বাদও দিই, ধরে নিই যে তাদের মধ্যে একজনও সেই মুহূর্তে উপরের দিকে দেখছিল না। তারপরেও প্রাচীরে সেই মুহূর্তে প্রহরায় থাকা পঞ্চাশ বা তারও বেশি সৈনিকদের মধ্যে কারুরই চোখে পড়ল না যে তাদেরই মধ্যে একজন ধনুকে বাণ চড়াল, সেটা বারান্দার দিকে তাগ করে নিশানা করল এবং তারপর শর নিক্ষেপ করল। অথচ একজন, মাত্র একজনও সেটা দেখতে পেল না? না হে জীবসিদ্ধি, এ হতেই পারে না।

জীবসিদ্ধি কোনো উত্তর দিতে পারল না। দু-জনই কিছুক্ষণ চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল। শেষে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

আচ্ছা দর্শক, প্রতিযোগী ও সৈনিক বাদেও কিন্তু আরও দু-জন এই বারান্দাতেই উপস্থিত ছিল। তাদেরই মধ্যে কেউ, বা, হয়তো দু-জনই একসঙ্গে ষড় করে মহারাজকে হত্যা করেছে। হতে পারে না?

চাণক্য আনমনাভাবে নিজের বুকের উপর এসে পড়া কেশশিখায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,

– সে-সম্ভাবনাও আমি আগেই বিবেচনা করে দেখেছি। হ্যাঁ, চিত্রবর্মা যেহেতু যুবরাজ তাই তাঁর পক্ষে মন্ত্রীর সঙ্গে মিলে রাজাকে হত্যা করার সম্ভাবনা প্রবল। হত্যাকারী হিসাবে তাঁর উদ্দেশ্য বা হেতুও যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু এই বারান্দায় না থাকলেও, দরজার কাছে ও আশেপাশে কিন্তু অন্য প্রহরীরা ছিল। চিত্রবর্মা বা শ্রীশৈল ধনুক থেকে বাণ নিক্ষেপ করলে তারা কেউ-না-কেউ দেখতে পেতই।

জীবসিদ্ধি পেছন ঘুরে বারান্দায় ঢোকার দরজার দিকে তাকিয়ে বলল,

– যদি সেই দরজার কাছে দাঁড়ানো রাজার অঙ্গরক্ষকও এই হত্যাকাণ্ডে যুক্ত হয়? তাহলে?

হুমম, কিন্তু তাহলেও কিছু সমস্যা থেকে যাচ্ছে। মনে রেখো রাজা সুবর্মা কণ্ঠে তিরবিদ্ধ হয়েছিলেন। সেইসময়ে তিনি এই বারান্দা থেকে প্রাঙ্গণের দিকে সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন; এই আমাদের মতো। সকলেই দেখেছে তাঁকে এই অবস্থাতেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে। কিন্তু চিত্রবর্মা ও শ্রীশৈল এই বারান্দাতেই উপস্থিত থাকলেও তাঁরা কিন্তু ছিলেন মহারাজের পেছনে। অর্থাৎ, মহারাজ সুবর্মা তাঁদের দিকে পিঠ করে ছিলেন। তাই কোনোভাবেই তাঁদের কারুর পক্ষেই মহারাজের সম্মুখ থেকে কণ্ঠে আঘাত করা সম্ভব ছিল না। তবে তাঁরা নিজের হাতে হত্যা না করলেও, তাঁদের মধ্যে কেউ যে রাজাকে হত্যা করতে আততায়ী নিযুক্ত করেনি সেই সম্ভাবনা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

— ঠিকই। আমার ওদের দু-জনকেই খুব সন্দেহজনক লাগছে।

– তোমার আজকাল বিশ্বের তিন চতুর্থাংশ মানুষকেই সন্দেহজনক লাগে, জীবসিদ্ধি।

গুরুর বক্রোক্তি গায়ে মাখল না জীবসিদ্ধি। প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে থাকল। প্রহরীদের পালাবদল হচ্ছে এখন। রাত্রি দু-প্রহর ধরে যারা প্রহরা দিয়েছে এখন তাদের বিশ্রাম, তাদের জায়গায় অন্য একদল প্রহরী আগামী দু-প্রহর প্রহরা দেবে।

জীবসিদ্ধি বলল,

– আজকে তাহলে আপনার পরিকল্পনা কী?

ওই তিরন্দাজি প্রতিযোগীদের সঙ্গে আজকে কথা বলব। তাদের নিয়ে আসতে বলেছি মন্ত্রী শ্রীশৈলকে।

একটু ভেবে জীবসিদ্ধি বলল,

- আচ্ছা আচার্য, এমনও তো হতে পারে যে, কোনো এক দুর্ধর্ষ ধনুর্ধর এমন কোনো যান্ত্রিক ধনুক নির্মাণ করেছে যা আকারে ছোটো এবং যা দিয়ে সহজেই নিশানা করা যায়?

- হুমম।

- – আপনার কী মনে হয়? এই হত্যাকারীই আমাদের কাঙ্ক্ষিত শকুনির সেই ধনুর্ধর? নাকি, অন্য কেউ এই একই ধরনের তির ব্যবহার করে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে?

একইভাবে উদাস ভঙ্গিতে দূরে হিমালয়ের দিকে তাকিয়েই চাণক্য উত্তর দিলেন, মোক্ষম প্রশ্ন, হে জীবসিদ্ধি। মোক্ষম প্রশ্ন।

১১.

গতকাল সারাদিন ভেবেছেন বৈদ্য চক্রাচার্য। একটা সম্ভাবনা গতকাল থেকেই তাঁকে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু এখন আর সেটা নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় তাঁর হাতে ছিল না। কিন্তু এটার প্রমাণ কোনোভাবে পাওয়া গেলে বড়ো সুবিধা হত।

আয়ুর-শাস্ত্র, শরীরবিদ্যা, শৈল-শাস্ত্রর বিস্তর পুস্তক তিনি পড়েছেন গতকাল। এবং, সবশেষে একটি উপায় তিনি পেয়েছেন। হ্যাঁ, একটা উপায় এখনও আছে। এই সংশয়ের মীমাংসা একজনই করতে পারবেন। তাঁর কাছেই এখন তিনি চলেছেন।

* * *

আরও একবার পত্রটি খুলে দিনের আলোয় মেলে ধরলেন রাজা সিন্ধুসেনা। তাঁর নিজের অক্ষরজ্ঞান নেই, তাই পত্র তিনি পাঠ করতে পারেন না। কিন্তু তাঁর প্রধান অমাত্য শিক্ষিত। তিনিই গতকাল রাত্রে তাঁকে এই পত্র পড়ে শুনিয়েছেন। এবং, তা শুনে গতরাত্রে মহারাজের ঘুম হয়নি।

এখন সকাল হতেই তিনি জরুরি পরামর্শ করতে নিজের দু-জন অমাত্যকে ডেকেছেন। নন্দর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অমাত্য রাক্ষস কয়েক বার কিছু কাজে পত্র লিখেছিলেন মহারাজ সিন্ধুসেনার কাছে। প্রধানমন্ত্রীই গতকাল পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সেই পুরোনো পত্র, দফতর থেকে খুঁজে বের করে যদি এই পত্রের সঙ্গে হাতের লেখা

মেলানো যায়, তবে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। সেই কারণে এখন মহারাজ অপেক্ষা করে আছেন তাঁর দুই মন্ত্রীর। অধৈর্য ভঙ্গিতে কক্ষের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছেন এবং মাঝে মাঝেই পত্রটি খুলে দেখছেন। যেন বার বার দেখলে তাঁর অক্ষরজ্ঞান হয়ে যাবে।

কক্ষে প্রবেশ করলেন দুই অমাত্য। তাঁদের হাতে দুটি ভূর্জপত্র। দুইটিই জীর্ণ, তবে একটি অন্যটির তুলনায় নতুন।

- পেয়েছেন?

প্রশ্ন করলেন মহারাজ সিন্ধুসেনা। উত্তরে উপর-নীচ ঘাড় নেড়ে প্রধানামাত্য জানালেন,

- হ্যাঁ, মহারাজ। অনেক খুঁজে দুটি পত্র উদ্ধার করা গিয়েছে। একটি প্রায় অপাঠ্য কালি হালকা হয়ে গিয়ে। তবে দ্বিতীয়টির লেখা এখনও কিছুটা পড়া যায়।

জানলার পর্দা সরিয়ে দিলেন একজন অমাত্য এবং একটি মেজ আলোর কাছে রাখলেন। তিনটি ভূর্জপত্র পাশাপাশি রেখে বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দু-জন অমাত্য পরীক্ষা করলেন।

- কী বুঝলেন?

এই লেখা অমাত্য রাক্ষসেরই।

সিন্ধুসেনার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন প্রধানামাত্য। রাজা সিন্ধুসেনা নির্দেশ দিলেন, পত্রটি আরও একবার পাঠ করুন তো, শুনি। হালকা কেশে গলা পরিষ্কার -

করে প্রধানামাত্য পড়তে শুরু করলেন,

মহারাজ সিন্ধুসেনা,

প্রথমেই অনুরোধ করব যে, এই পত্র অতি গোপন বিবেচনা করবেন এবং পত্রপাঠ এটি আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

এই পত্র বহু পূর্বেই আপনাকে লেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু গত এক বছর চাণক্যর উপস্থিতিতে তা সম্ভব হয়নি। তবে এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁর মনে নিজের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রোপণ করতে সক্ষম হয়েছি। এবং, অবশেষে তিনি আমার হাতে পাটলিপুত্রর দায়িত্ব দিয়ে মগধ ছেড়ে বেরিয়েছেন কয়েক দিন পূর্বে।

এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলাম আমি এতদিন। প্রতিহিংসার সময় আসন্ন এবং আমি বিশ্বাস করি এই কাজে পূর্বের মতোই আপনাকে পাশে পাব। মগধের সিংহাসনে আমি আপনাকে অধিষ্ঠিত করার সংকল্পে ব্রতী হয়েছি। চাণক্যর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই সিংহাসন দখল করতে হবে মহারাজ...

না না, সম্রাট সিন্ধুসেনা। মগধের সেনার একটি বড়ো অংশ এই মুহূর্তে পাটলিপুত্রতে নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন তারা চাণক্যর সঙ্গে কুলূতের পথে রয়েছে। অতএব, এটাই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। তাই অবিলম্বে এই পত্রের উত্তর আপনি আমার বিশ্বস্ত দূত নিপুণকের মাধ্যমে আমাকে প্রেরণ করবেন। কিন্তু সাবধান, এই পত্রে কোথাও পরিচিত কারুর নাম ব্যবহার করবেন না। আপনার উত্তরে এইরূপ গূঢ়লেখ রীতি অবলম্বন করবেন:

চন্দ্রগুপ্ত – রাহু -
চাণক্য – কেতু -
মগধ – পর্বত
পাটলিপুত্র – নগর
মগধ সেনায় আমার বিশ্বস্ত সেনাপ্রধান ভদ্রকেতু – গৃধ্র
আপনি – সমুদ্র
আমি- দানব

নগরে প্রবেশ করতে পর্বত আরোহণ কবে করতে চান? রাহু আর কেতুর কী হবে? রাহুকে বন্দি করলেও কেতুকে হত্যা করা প্রয়োজন। আপনার কী মত? কত সৈন্যবল নিয়ে আপনি পর্বতে আসবেন? গৃধ্র আমাদের সঙ্গে আছে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে রাজার সঙ্গে। আমার নির্দেশে, আপনার জন্যে সে-ই তিথিতে রাজধানীর দ্বার খুলে দেবে আপনার সেনার প্রবেশের সুবিধার্থে। উত্তর সংক্ষিপ্ত এবং সাংকেতিক শব্দ ব্যবহারে দেবেন, যাতে এই পত্র না থাকলে আপনার উত্তরের মর্মোদ্ধার অসম্ভব হয়।

জয় হোক।

ইতি,
দানব।

পত্রের শেষে অমাত্য রাক্ষসের নিজের অঙ্গুরীয় মুদ্রার সিলমোহর জ্বলজ্বল করছে।

পত্রটি ইতিপূর্বে অনেকবার শুনেছেন রাজা সিন্ধুসেনা। তিনি পত্রের উত্তর মোটামুটি ভেবেই রেখেছিলেন সারারাতে। তিনি ইতিমধ্যেই নিজেকে বেশ কয়েক বার মগধের সিংহাসনে সম্রাটরূপে কল্পনা করে ফেলেছেন।

ওই নপুংসক মলয়কেতু আর তার নতুন গুরু শকুনিকে একদমই পছন্দ হয়নি সিন্ধুসেনার। ওই দুষ্ট ব্রাহ্মণের এত বড়ো স্পর্ধা যে তাঁকে হুমকি দেয়? বীর সিন্ধুসেনাকে? এইবার সময় এসেছে তাঁর নিজের উত্থানের।

বজ্রের মতো গমগমে স্বরে মহামাত্যকে নির্দেশ দিলেন, — লিখুন!
প্রধান-অমাত্য দ্রুত ভূর্জপত্র বের করে, কলম কালিতে ডুবিয়ে শুরু লিখতে করলেন।

মহামতি দানব,

সাগরের প্রণাম নেবেন। আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত। এটাই আমাদের সুযোগ।

পর্বত আরোহণ করে পনেরো দিন পরের অমাবস্যার রাত্রে আমি নগর পৌঁছাতে পারব। আমার সম্পূর্ণ সেনা আমার সঙ্গে থাকবে। রাহু ও কেতু দু-জনকে হত্যা করাই শ্রেয়। কেতু এখন কুলূতের রাজমহলে আছে। তাকে আমি সেখানেই গুপ্তহন্তা ব্যবহারে হত্যা করব।

রাহুর পরিণামও একই হবে।

গৃধ্র আপনার হাতে এবং আসলে আমাদের সমর্থনে আছে শুনে খুশি হয়েছি। সে দ্বার খুলে দিলে আমার কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। আপনি তাঁকে জানিয়ে রাখবেন এই অমাবস্যার তিথির কথা। একবার সেনা প্রবেশ করলেই সিংহাসন আমার...

(কথা থামিয়ে সিন্ধুসেনা বললেন, — না। 'আমার' নয়। লেখো...)

একবার সেনা প্রবেশ করলেই সিংহাসন আমাদের। আপনি শুধু পাশে থাকবেন মহামতি।

ইতি,
সাগর।

কথা থামিয়ে দ্বিতীয় অমাত্যের উদ্দেশে মহারাজ বললেন,
মদিরা!
ইঙ্গিত বুঝে অমাত্য নিজেই পানীয় ঢেলে পেয়ালা এগিয়ে দিলেন রাজার দিকে। একচুমুকে গোটা পেয়ালা শেষ করে সিন্ধুসেনা বললেন, - সিলমোহর এনেছেন?
আমতা আমতা করে প্রধানামাত্য বললেন,
— যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি?
বলুন।

— এ যে বড়ো গভীর চক্রান্ত, মহারাজ? যদি সাংকেতিক ভাষাতেই নিজের নাম লেখা হয়, তবে আর রাজমুদ্রার ছাপ দেওয়ার কী প্রয়োজন? আপনি নিশ্চিত তো যে, আপনি এই উত্তর দিতে চান?

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল সিন্ধুসেনার।

বললেন,

– হ্যাঁ হ্যাঁ! আমি নিশ্চিত। সুযোগ মানুষের জীবনে একবারই আসে মন্ত্রী এবং যে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে না, সে মূর্খ। আজকে যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসে আমি মগধ শাসনের সুযোগ হাতছাড়া করি, তবে ভবিষ্যতে ইতিহাস আমায় হাসির পাত্র হিসাবে চিহ্নিত করবে। রাজমুদ্রার ছাপ দেওয়ার প্রয়োজন কারণ অন্যথায় প্রাপক নিশ্চিত হতে পারবে না যে, প্রেরক আসল ব্যক্তি। যেমন এই পত্রে অমাত্য রাক্ষসের মুদ্রাচিহ্ন না থাকলে আমি নিশ্চিত হতাম না যে, এটি বাস্তবে রাক্ষসেরই লেখা। তা ছাড়া এই পত্রে তো কারুরই নাম বা স্থান উল্লেখ থাকছে না। একমাত্র রাক্ষসের এই পত্র ছাড়া আমার এই লেখার কোনো মানে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

কথার মাঝেই দুটি পাথর ঠুকে একটি প্রদীপ ধরিয়ে ফেলেছিলেন সিন্ধুসেনা। কথা শেষ করেই অমাত্য রাক্ষসের পত্রটি তিনি আগুনের উপর রাখলেন। দেখতে দেখতে পুরো ভূর্জপত্রটি ছাই আর ধোঁয়া হল।

রাজা সিন্ধুসেনার চোখে তখন প্রদীপের শিখা ছায়া ফেলছে। সেই আগুনে মগধ গ্রাস করার স্বপ্ন তাঁর দু-চোখের মণিতে।

পত্রটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হতে তিনি ফিরলেন তাঁর দুই বিশ্বস্ত অমাত্যর দিকে। পত্র এবং সিলমোহরের সরঞ্জাম এগিয়ে দিলেন প্রধানামাত্য। নিজের ডান হাতের অনামিকার অঙ্গুরি দিয়ে পত্রের শেষে নিজের সিলমোহরের ছাপ এঁকে দিলেন মহারাজ সিন্ধুসেনা।

এবং, সেইসঙ্গেই শুরু হল এক গভীর ষড়যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ।

১২.

জীবসিদ্ধি কক্ষের বাইরে অপেক্ষায় থাকা শেষ সৈনিকটিকে ভেতরে ডাকল,

- ভেতরে এসো।

মহারাজ সুবর্মার মৃত্যুর মুহূর্তে উপস্থিত তাঁর পাঁচ অঙ্গারক্ষকদের মধ্যে চারজনকে ইতিমধ্যে একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন চাণক্য। রাজার মৃত্যুসংবাদ যে কয়েক জন মানুষমাত্র জানে তাদের মধ্যে এই পাঁচ দেহরক্ষীও আছে যারা রাজার অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

সৈনিকটি ঢুকে চাণক্যকে প্রণাম জানাল। চাণক্য প্রশ্ন করলেন

- তোমার নাম?

— শূদ্রক।

মহারাজের মৃত্যুর সময়ে তুমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলে?

– হ্যাঁ, আচার্য।

– রাজার মৃত্যুর সংবাদ তুমি কাউকে জানিয়েছ?

– না, আচার্য। এমনকী আমি নিজের স্ত্রীকেও এ

বিষয়ে কিছুই বলিনি।

- হুমম। সেইদিন কী ঘটেছিল তোমার মুখে শুনতে চাই।

দেখা গেল এই সৈনিকটি মোটেই গুছিয়ে বলতে পারে না। কথার মাঝে অন্য কথায় চলে যায়। তবে তার এই কথাবার্তা থেকে যেটুকু জানা গেল তা আগের চারজনের বক্তব্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

তারা প্রত্যেকেই বারান্দার দ্বারের কাছে পাহারায় দাঁড়িয়ে ছিল। উৎসব পুরোমাত্রায় চলছিল এবং তিরন্দাজি ও মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা নিয়ে সকলেই উত্তেজিত ছিল। হঠাৎই তারা দেখল মহারাজ ঢলে পড়লেন মেঝেতে। মহারাজের কাছে গিয়ে তারা দেখল যে মহারাজ তিরবিদ্ধ হয়েছেন। যুবরাজ চিত্রবর্মা সঙ্গেসঙ্গেই বৈদ্যকে ডেকে আনতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তিরবিদ্ধ হওয়ার মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই মহারাজ সুবর্মা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহারাজকে আহত হয়ে পড়ে যেতে দেখতে পেয়েছিল নীচে প্রাঙ্গণে উপস্থিত অনেকেই। তাই সেইসময়ে সকলে উৎসব থামিয়ে দেয়।

সেইমুহূর্তে মহামন্ত্রী শ্রীশৈলর নির্দেশে প্রাসাদের দ্বার বন্ধ করা হয় এবং প্রাঙ্গণে উপস্থিত সকল জনতা ও প্রতিযোগীর তল্লাশি নেওয়া হয়। জানানো হয় যে, মহারাজ আহত হয়েছেন তিরের আঘাতে। কেউ মহারাজের দিকে কাউকে বাণ নিক্ষেপ করতে দেখেছে কি না সেটাও জিজ্ঞেস করা হয়।

সকলেই ভেবেছিল যে, সহজেই হত্যাকারীকে ধরা যাবে। কারণ এতজন লোকের মধ্যে কেউ মহারাজের দিকে বাণ চালাবে আর কেউ দেখতে পাবে না, এটা হতেই পারে না। কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে আততায়ীকে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে কেউই এগিয়ে

এল না। কেউই দেখেনি হত্যাকারীকে। অথচ আঘাত লাগার সময়ে মহারাজ প্রাঙ্গণের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতএব, হত্যাকারী নিঃসন্দেহেই সামনের দিক থেকে ধনুক থেকে বাণ চালিয়েছে। হত্যাকারীর সন্ধান না

সন্ধ্যা হয়ে যায় সকলের তল্লাশি নিতে নিতে। এরপরেও পাওয়ায় বাধ্য হয়েই সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। শুধু ভিনরাজ্যের প্রতিযোগীদের অতিথিশালে রাখা হয়।

মোটামুটি এই একই কথা সকলেই জানিয়েছে। জীবসিদ্ধি চাণক্যর মুখ দেখেই অনুমান করতে পারছে যে আচার্য হতাশ হচ্ছেন। পাঁচজন সৈনিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেও নতুন কোনো তথ্যই সামনে আসেনি। কোনো সূত্রই পাওয়া যায়নি।

পঞ্চমজনও চাণক্যর কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে চাণক্য জীবসিদ্ধির দিকে তাকিয়ে শুধু হতাশ ভঙ্গিতে দুদিকে ঘাড় নাড়লেন।

চিত্রবর্মা ও শ্রীশৈলর কাছে যেটুকু আমরা জেনেছি, সৈনিকরাও এর বেশি কিছুই জানাতে পারল না। সকলেই একই কথা বলছে। জীবসিদ্ধি কিছুক্ষণ ভেবে বলল,

আচার্য আমার মস্তিষ্কে একটা সম্ভাবনা আসছে।

চাণক্য মিষ্টি ঘোলের শরবতের পেয়ালায় একচুমুক দিয়ে জানতে চাইলেন,

- হুমম। শুনি, কী সম্ভাবনা?

– গোটা ব্যাপারটাই অসম্ভব। আমার মনে হয় এই চিত্রবর্মা ও শ্রীশৈল মিলেই মহারাজ সুবর্মাকে হত্যা করেছে। এবং, এই চক্রান্তে মহারাজের পাঁচ অঙ্গারক্ষকও জড়িত। তাই হত্যাকাণ্ডর সময়ে বারান্দায় উপস্থিত সকলেই একই কথা বলছে। চাণক্য কয়েক মুহূর্ত উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে শরবত পান করলেন। পেয়ালা অর্ধেক খালি করে নামিয়ে রেখে বললেন,

- হুমম। তুমি বলতে চাইছ যে, এই পাঁচ সৈনিক শেখানো বুলি আমাদের বলে গেল?

– হ্যাঁ, আচার্য। -

শোনো জীবসিদ্ধি, গুছিয়ে মিথ্যা বলাটা কিন্তু সহজ কাজ না। তুমি বা তোমার মতো গুপ্তচরবৃত্তির মানুষরা মিথ্যা কথা বলতে, পরিচয় গোপন রাখতে যতটা অভ্যস্ত, সাধারণ অপরাধী কিন্তু মোটেই তা হয় না। গুছিয়ে মিথ্যে বলতে গেলে হয় কোথাও-না-কোথাও ভুল হবে, অথবা, প্রত্যেকে হুবহু একই বয়ান দেবে। মানে, তাদের ব্যবহৃত শব্দও কিছু ক্ষেত্রে মিলে যাবে। এদের পাঁচজনের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। এই যে শেষের জন, একদমই গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। প্রয়োজনীয় কথার মাঝে অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ফেলেছিল। যদি গোটা ঘটনা মুখস্থ করে এসে বলত তাহলে এটা কখনোই হত

না। সে নির্দ্বিধায়, একবারও কথার মাঝে দিগ্‌ভ্রষ্ট না হয়ে অবলীলায় সাজিয়ে-গুছিয়ে বয়ান দিয়ে যেত। -

অঙ্গাবস্ত্র পরিপাটি করতে করতে চাণক্য আবার বললেন,

- এরপর আবারও আমি শরীরী ভাষায় আসব। কথা বলতে গিয়ে বার বার গলা শুকিয়ে যাওয়া, চোখে চোখ রেখে কথা না বলা, বার বার মাথায় বা শরীরের কোনো অংশে হাত দেওয়া, এগুলো অপরাধীর লক্ষণ জানবে। এদের পাঁচজনের ক্ষেত্রে এরকম কিছুই লক্ষ করিনি। না হে জীবসিদ্ধি, এরা কাল্পনিক কোনো দৃশ্য বর্ণনা করেনি। এরা নিজের চাক্ষুষ করা একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছে নিজেদের মতো করে। এরা মিথ্যা বলেনি।

পেয়ালা পুনরায় তুলে নিয়ে এক চুমুক শরবত গলা দিয়ে নামিয়ে চাণক্য বললেন,

- - তা ছাড়া ভুলে যেয়ো না অনেকেই মহারাজকে তিরবিদ্ধ হয়ে বারান্দার মেঝেতে পড়ে যেতে দেখেছে।

জীবসিদ্ধি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে বাধা পেল। কারণ কেউ কক্ষের দ্বারে আঘাত করছে। আওয়াজ শুনে জীবসিদ্ধি অনুমান করতে পারছে যে, বাইরের ব্যক্তিটি যে-ই হোক সে উত্তেজিত। জীবসিদ্ধি উঠে গিয়ে দ্বার খুলে দিতেই কক্ষে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন মহামাত্য শ্রীশৈল, - আচার্য! -

– বলুন, আর্য? আপনি এত উত্তেজিত কেন? কী হয়েছে? — বৈদ্য... মানে রাজবৈদ্য চক্রাচার্যকে কেউ হত্যা করেছে।

১৩.

মৃতদেহ ঘিরে লোকজন জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক জন কুলূতের সৈনিক তাদের দূরে রেখেছে মৃতদেহর থেকে।

এখন সন্ধ্যা হয় হয়। ধুলোমাখা কাঁচা রাস্তার ধারে পড়ে আছে বৈদ্য চক্রাচার্যর মৃতদেহ। তাঁর বুকের বামদিকে একটি গভীর ক্ষত, রক্ত জমে আছে সেখানে। তরবারি বা বড়ো ছুরি ধরনের কিছু দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তা এই ক্ষত দেখলেই বোঝা যায়। খোলা চোখের মৃত দৃষ্টিতে এখনও বিস্ময় লেগে আছে। যেন তিনি এখনও বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে, তিনি মৃত।

চাণক্য মৃতদেহর পাশে মাটিতে হাঁটু রেখে বসে ক্ষত পরীক্ষা করছেন। জীবসিদ্ধি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভিড় করা লোকেদের দিকে দেখছে। সে অবশ্য মুখ ঢেকে এসেছে। কারণ সাধারণ মানুষ তাকে দেখে ফেললে রাজা সুবর্মার সঙ্গে তার চেহারার মিল পেতে পারে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় সমস্যা হবে। জীবসিদ্ধি মনে মনে ভাবছে যে, এদের মধ্যেই কেউ খুনি নয় তো? চাণক্য বলেন অপরাধীদের মধ্যে সাধারণত অপরাধস্থলে ফিরে আসার একটা প্রবণতা দেখা যায়।

উঠে দাঁড়িয়ে চাণক্য একবার আশেপাশে দেখে নিয়ে বললেন,

– জায়গাটা নির্জন। কে মৃতদেহ প্রথম দেখেছে?

সৈনিক এক কৃষককে সামনের দিকে ঠেলে দিল।

- আজ্ঞে আমি, ব্রাহ্মণদেব।

- কখন?

– এই তো, বিকেলের দিকে খেত থেকে ফিরছিলাম। তখনই দেখলাম রাস্তার ধারে কেউ শুয়ে আছে। প্রথমে ভাবলাম কেউ মদিরার নেশায় চুর হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু কাছে যেতেই রক্ত দেখতে পেলাম। আমি গিয়ে টহলদার সৈনিকদের ডেকে আনলাম।

আর কেউ ছিল আশেপাশে? -

নাহ্। কেউ না।

হুমম। তুমি আসতে পারো।

সৈনিকদের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়ে চাণক্য রাজমহলে ফেরার পথ ধরলেন। আচার্যর পাশে জীবসিদ্ধি এবং খানিকটা তফাতে মগধের দু-জন সৈনিক হাঁটছে।

চাণক্যর কপালে ভ্রূকুটি বলে দিচ্ছে যে, তিনি কিছু ভাবছেন। জীবসিদ্ধি জিজ্ঞেস করল,

কী বুঝলেন, আচার্য? বৈদ্যর মৃত্যু কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা?

মৃতদেহর শরীরের থেকে স্বর্ণ আভরণ খুলে ফেলা হয়েছে তা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ?

- হ্যাঁ, তবে কি এটা কোনো দস্যুর কাজ? -

আপাতদৃষ্টিতে তো তাই মনে হয়। নির্জন স্থানে দস্যুরা ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করে বটে। কিন্তু...

– কিন্তু?

- কিন্তু দস্যুরা এমন নির্জন স্থানেই শিকার খোঁজে যেখানে ধনী শিকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বা, যেসব সড়কে বণিকদের যাতায়াত থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে

ঘটনাস্থলের আশেপাশের শুধুমাত্র সামান্য চাষের জমি আর রুক্ষ পাহাড়ি পাথর বাদে কিছুই নেই। সেখানে দস্যু কেন থাকবে?

হতে পারে ব্যাপারটা কাকতালীয়। কপালদোষে বৈদ্য ভুল সময়ে ভুল স্থানে উপস্থিত ছিল। -

'কাকতালীয়' ব্যাপারটায় আমি ঠিক বিশ্বাসী নই, জীবসিদ্ধি। খুঁজলে দেখবে পৃথিবীর বেশিরভাগ ঘটনাই বিশেষ কারণে ঘটে। -

তাহলে আপনি বলছেন চক্রাচার্যর হত্যার সঙ্গে মহারাজ সুবর্মার হত্যার সম্পর্ক আছে?

চাণক্য চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা থেকে নেমে আশা কেশশিখায় হাত বুলিয়ে বললেন,

গতকালই বৈদ্য আমার সঙ্গে কথা বললেন আর আজকে তাঁকে হত্যা করা হল। এই দুটো ঘটনাকে কি উপেক্ষা করা যায়?

– কিন্তু কেন? মানে, হঠাৎ বৈদ্যকে হত্যা করার কী কারণ থাকতে পারে?

সেই প্রশ্নের উত্তর জানলে সম্ভবত আমরা মহারাজের হত্যারহস্যেরও সমাধান পেয়ে যেতাম। গতকাল মহারাজের মৃতদেহ পরীক্ষা করে যা যা সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছাতে পেরেছিলেন তা সবই আমাদের সবিস্তার বলেছেন। এরপর কি তবে কিছু বাকি থেকে গিয়েছিল? বা, হতে পারে আমার সঙ্গে আলোচনার ফলে তাঁর কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল যা তিনি আমায় বলতে চাইছিলেন। কিন্তু, সেটা কী হতে পারে?

— বৈদ্যর স্ত্রী আছে শুনলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে কিছু জানা যেতে পারে। হয়তো তাঁকে কিছু বলেছিলেন বৈদ্য।

হুম। কালকে ওঁকে প্রশ্ন করতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁরও জীবন সংশয় থেকে যায়। ওহে জীবসিদ্ধি, মন্ত্রী শ্রীশৈলকে বলে বৈদ্য চক্রাচার্যর স্ত্রীর সুরক্ষায় দু-জন প্রহরী নিযুক্ত করতে বলে দিয়ো।

- বেশ। আর কিছু?

– একটা প্রশ্ন ভাবাচ্ছে।

— কী প্রশ্ন, আচার্য

হত্যাকারী বৈদ্যকে হত্যা করে, সেই অস্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে গেল কেন? তুমি কি বৈদ্যর অঙ্গাবস্ত্রে রক্তের দাগগুলো ভালোভাবে লক্ষ করেছিলে? রক্তের দাগ দেখে বোঝা যায় তরবারি বা ছুরিটা হত্যাকারী ক্ষতস্থান থেকে টেনে বের করে মৃতদেহর শরীরের কাপড়ে ভালোভাবে মুছে নিয়েছে। হত্যাকারীর এতটা কষ্ট করার প্রয়োজন কী থাকতে পারে? তার পক্ষে অস্ত্রটি হত্যাস্থলে ত্যাগ করাটাই সহজ নয় কি?

মহলের প্রাঙ্গণে ততক্ষণে তারা প্রবেশ করেছে। দু-জন প্রহরী তাদের জন্যে প্রবেশ করতে জীবসিদ্ধি কিছুটা ভেবে বলল,

দ্বার খুলে দিল। ভেতরে অনেকের ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব অস্ত্রের প্রতি টান থাকে। যেমন, আমার নিজের এই ছোটো তরবারিটি। এটি আমি বিশেষভাবে অনেক বছর আগে বানিয়েছিলাম। এটি কাপড়ের ভাঁজে সহজেই লুকিয়েও রাখা যায়, আবার সাধারণ ছুরির চেয়ে ভারী ও বড়ো হওয়ায় অসিযুদ্ধেও যথেষ্ট কার্যকরী। অতএব, এই তরবারিটি আমি হাতছাড়া করতে চাইব না।

হুমম।

- আচার্য! আর্য জীবসিদ্ধি! -

অমাত্য শ্রীশৈলর ডাকে দু-জনই তাঁর দিকে চাইলেন। অমাত্যর সঙ্গে আরও এক ব্যক্তি রয়েছে। অমাত্য বলল,

- - কুলূতের দিকে এগিয়ে আসা সেনাদের সেনাপতি দূত মারফত আপনাদের জন্যে পত্র পাঠিয়েছে।

অন্য লোকটি প্রণাম করে নিজের পরিচয়পত্র এগিয়ে দিল জীবসিদ্ধির দিকে।

লোকটি সাধারণ পোশাকে থাকলেও সে মগধের সৈনিক। পরিচয়পত্র খুঁটিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে জীবসিদ্ধি সেটা ফেরত দিল লোকটিকে।

লোকটি পরিচয়পত্র রেখে দ্বিতীয় ভূর্জপত্রটি এগিয়ে দিল চাণক্যর দিকে। কিন্তু চাণক্য সেটা নেওয়ার আগেই জীবসিদ্ধি পত্রটা নিয়ে সাবধানে সেটার ভাঁজ খুলে নিঃশব্দে পাঠ করল। জীবসিদ্ধির এরকম হঠাৎ উৎসাহে চাণক্য কিছুটা অবাক হলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না।

পাঠশেষে চাণক্যর দিকে এগিয়ে দিল। পত্র পাঠ করতে করতে চাণক্যর মুখ গম্ভীর হল। সৈনিকটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,

এটা সত্যি? তোমাদের চলার পথে পাহাড় ধস নেমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে? সৈনিকটি উত্তর দিল,

— হ্যাঁ, আচার্য। রাস্তার বেশিরভাগটাই ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে পাহাড় থেকে নেমে আসা পাথরের চাঁইয়ের ভারে। সেই পাথর ভেঙে ভেঙে পথ বের করতে চারদিন সময় লাগবে অন্তত। পুরো পথ প্রশস্ত না হলে বিশাল সেনা নিয়ে চলা অসম্ভব।

অন্য কোনো পথ নেই?

না, আচার্য। আপনি তো জানেনই, যে দ্বিতীয় পথ আছে যেটা ধরে আপনারা এসেছেন তাতে সম্পূর্ণ সেনার চলা অসম্ভব। অতএব, মগধের সেনা কুলূতে প্রবেশ করতে কয়েক দিন বেশি সময় লাগবে। -

শ্রীশৈল এতক্ষণ তাদের কথা শুনছিলেন। এইবার তিনি অসহায় ভঙ্গিতে বলে উঠলেন,

– সর্বনাশ! তাহলে কী হবে এবার, আচার্য? আর মাত্র ছ-দিন বাদেই কুলূতের প্রতিষ্ঠা দিবস!

মগধের সৈনিকটিকে ইশারায় জীবসিদ্ধি চলে যেতে বলল। সে আবারও তাদের অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিতে জীবসিদ্ধি বলল,

অতএব আমাকে মহারাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেই হচ্ছে।

চাণক্য কিছু বললেন না। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগছে না। কোথায় যেন তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে।

চাণক্য ও জীবসিদ্ধি মহলের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এল। চাণক্যর কক্ষে ঢুকে জীবসিদ্ধি সাবধানে দ্বার আটকে দিয়ে বলল,

— আচার্য, পত্রটি আগে আগে আপনার থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে পত্রটির ভাঁজ দেখাটা আমার জন্যে জরুরি ছিল।

জীবসিদ্ধির কথার ইঙ্গিত বুঝতে চাণক্যর একপলক সময় লাগল। উপলব্ধি করতে পেরে তিনি বললেন,

– ওহ্!

পত্রটা মেজের উপর মেলে ধরে প্রদীপের আলোয় দেখাল,

এটি দেখুন। গুপ্তচরদের মাধ্যমে পাঠানো সমস্ত পত্রে একটি বিশেষ নিয়মের ভাঁজ থাকে। এই ভাঁজ করার নিয়মটা শুধুই প্রাপক ও প্রেরক জানে। এ ছাড়া উলটোদিকে দুটি কোণ সামান্য ছেঁড়া থাকে। এর কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

— হুমম। যাতে পত্র যদি-বা মাঝপথে শত্রু বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি খুলে পাঠ করে, প্রবল সম্ভাবনা যে পুনরায় সে একইভাবে ভূর্জপত্র ভাঁজ করবে না। সেক্ষেত্রে পত্র সঠিক প্রাপক হাতে পেলেই ভাঁজ দেখে বুঝতে পারবে যে, মাঝপথে তৃতীয় কেউ পত্র পাঠ করেছে কি না।

— একদম ঠিক। এ ছাড়া ভূর্জপত্রের সামান্য দুটি কোণ ছেঁড়া থাকাটা সন্দেহের উদ্রেক করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যদি-বা কোনো অতি সাবধানী শত্রু, পত্র বদলে

দিয়ে একদম সঠিক ভাঁজ করে নকল পত্র পাঠায়। সেক্ষেত্রেও প্রাপক সহজেই বুঝতে পারবে যে পত্র পালটে দেওয়া হয়েছে কি না। কারণ নকল পত্রের কোণ ছেঁড়া থাকবে না।

চাণক্য কিছুক্ষণ চুপ করে শিষ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,

ওহে জীবসিদ্ধি...

— বলুন, আচার্য?

— আমি অভিভূত।

সেকী? এইটুকুতেই মহামতি আচার্য চাণক্য তাঁর ছাত্রের প্রতি অভিভূত হয়ে গেলেন? অপেক্ষা করুন। আরও আছে।

জীবসিদ্ধি হেসে বলল,

দুই কোণ ছেঁড়া থাকার এক মানে, এক কোণ ছেঁড়ার মানে আর এক। উপরের কোণ ছেঁড়ার এক ইঙ্গিত, আবার নীচের কোণ ছেঁড়া থাকার ইঙ্গিত সম্পূর্ণ আলাদা। এই সমস্ত নিয়ম আমার নিজের বানানো এবং সমস্ত গুপ্তচরদের এই নিয়ম আমি শিখিয়েছি।

- — তুমি যদি নিজের আচার্যর মুখ থেকে প্রশংসা শোনার জন্যে এগুলো বলে থাকো তাহলে তোমায় আমি নিরাশ করব না। কিন্তু আগে এটা বলো যে, এই পত্রের ভাঁজ আর ছেঁড়া দেখে কী বুঝলে?

— বুঝলাম যে, এটি মগধ সেনার সঙ্গে থাকা গূঢ়পুরুষের লেখা পত্র বটে। তবে পত্রের লেখা অর্ধসত্য।

- মানে?

পত্রটি চাণক্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে জীবসিদ্ধি বলল,

- ঘ্রাণ নিয়ে দেখুন তো।

ভূর্জপত্রটি নিয়ে চাণক্য নাকের কাছে এনে চোখ বুজে

ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, দুধ জাতীয় কিছুর গন্ধ পেলাম যেন। খুবই হালকা যদিও। -

একদম ঠিক। যাক, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনার ইন্দ্রিয় তাহলে খারাপ হয়ে যায়নি।

ছাত্রের ইচ্ছাকৃত কটাক্ষের উত্তরে চাণক্য বললেন,

শোনো হে জীবসিদ্ধি, আমার ইন্দ্রিয় তোমার চেয়ে এখনও এক-শো গুণ ধারালো।

গুরুর ছদ্মরাগ ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা করে অনেকটা জাদুকর যেভাবে তার জাদু দেখায় সেই ভঙ্গিতে পত্রের উলটোদিকটা প্রদীপের শিখার কাছে ধরতেই তাতে লেখা ফুটে উঠল,

‘পাহাড়ের ধস ইচ্ছাকৃত। কেউ আমাদের পথ আটকাতে চেয়েছে। গোপনে কয়েকশো সৈনিক, ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে, পাহাড়ি পথ ধরেছে। পাঁচদিনে তারা কুলূতের সীমানা পার করবে।'

পত্রটি চাণক্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে জীবসিদ্ধি হেসে বলল,

খাগের কলম দুধে ডুবিয়ে লিখলে, তা শুকিয়ে গেলে অদৃশ্য কালির কাজ করে। আপনার বোধ হয় জানা ছিল না, আচার্য? -

চাণক্য কিছুক্ষণ লেখাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,

— ওহে, জীবসিদ্ধি... ।

বলুন, আচার্য।

চাণক্যর ঠোঁটের কোণে হাসি। বললেন,

তুমি কি জানো যে, তুমি শত্রুপক্ষর কাছে দিন দিন কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠছ?

গুরু-শিষ্য উভয়ে হেসে উঠলেন।

১৪.

নিপুণক একটি বড়ো বটগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাই তুলে আরও একবার রাস্তার দিকে দেখল। ফাঁকা, পাথুরে প্রান্তর ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না ওর। তার মানে লোকটার আসতে দেরি হবে।

কোমরে বাঁধা পশু চামড়ার জলের আধারটা বের করে মুখে লাগিয়ে দু-ঢোঁক জল খেল। গাছের সঙ্গেই তার ঘোড়াটি বাঁধা আছে। ঘোড়াটাও তার স্বামীর মতোই ক্লান্ত। নিপুণক একবার ভাবল বসে পড়বে গাছের ছায়ায়। কিন্তু পরক্ষণেই সেই চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিল। কারণ এখন গাছের তলায় বসলেই তার তন্দ্রা আসবে। ঘুমিয়ে পড়া চলবে না তার। তার কাছে এখন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে যা খুব সাবধানে জায়গামতো পৌঁছে দিতে হবে।

আনমনাভাবেই বুকের উপর হাত চলে গেল নিপুণকের। সেখানেই ওর অঙ্গাবস্ত্রের গোপন একটি ভাঁজে সিন্ধুসেনার পত্রটি আছে। নিপুণক জানে এই ভূর্জপত্রের গুরুত্ব। এই সামান্য একটুকরো লেখার উপর গোটা আর্যাবর্তর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আরও একবার রাস্তার দিকে তাকাতেই দূরে দুটি বিন্দু চোখে পড়ল। চোখের উপর হাত রেখে রোদ বাঁচিয়ে দেখার চেষ্টা করল নিপুণক। হ্যাঁ, দুটো ঘোড়াই বটে। দুটি ঘোড়াই পিঠে দু-জন মানুষকে নিয়ে ছুটে আসছে তারই দিকে।

বেশ কিছুটা সময় লাগল দু-জন অশ্বারোহীর তার কাছে পৌঁছাতে। প্রথমে নেমে এল এক দীর্ঘাঙ্গ, বলিষ্ঠ পুরুষ। নিপুণকের পূর্ব পরিচিত। লোকটি নেমে নিঃশব্দে সামান্য মাথা নেড়ে অভিবাদন জানাল। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নেমে আসতে ইশারা করল। দ্বিতীয় লোকটি খর্বকায়, ইঁদুরমুখো। নিপুণক কিছুক্ষণ তাকে দেখে প্রথম ব্যক্তির উদ্দেশে প্রশ্ন করল,

একে দিয়ে কাজ হবে? চিঠি পৌঁছে দিতে পারবে জায়গামতো?

উত্তরে প্রথমজন প্রায় চিৎকার করে বলল,

— নিশ্চয়ই পারবে। না পারলে আমি নিজে ওকে হত্যা করব। -

ইঁদুরমুখো লোকটা কেঁপে উঠল। সে জানে যে, এই লোকটা সত্যি কথাই বলছে। নিপুণক ইঁদুরমুখোকে প্রশ্ন করল,

তোমার নাম কী?

উত্তর প্রথম ব্যক্তি দিল,

— ও বোবা। কথা বলতে পারে না। ওর নাম রোচক। লিখতে পড়তেও পারে না, কানেও কম শোনে।

— ওহ্!

নিপুণক মনে মনে অমাত্য রাক্ষসের বুদ্ধির প্রশংসা করল। গোপন পত্রবাহক হিসাবে এর চেয়ে উপযুক্ত আর কেই-বা হতে পারে? যে পত্র পড়তে পারে না, শত্রুর হাতে ধরা পড়লেও কিছুই বলতে পারবে না।

লোকটা হাত নেড়ে কিছু বলল। নিপুণক জিজ্ঞেস করল,

ও কী বলছে?

- ও জানতে চাইছে যে, কাজটা করলে ওর সাজা মুকুব হবে কি না। ওর সাজা কী ছিল?

ধর্ষণের যা সাজা মগধে। মৃত্যুদণ্ড।

— ওহ্!

হেহে। জিভ কান বিকল হলেও বদমাশটার রস কম নয়।

নিপুণক রোচকের উদ্দেশে জোরে বলল,

– হ্যাঁ, চিঠি তুমি পার্বত্যক রাজ্য পার করিয়ে দিলেই তোমার সাজা আমরা ভুলে যাব। তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।

বিশ্রীভাবে হাসল লোকটা। তার হাসি দেখে নিপুণকের মাথা থেকে পা অবধি জ্বলে গেল। তার এমনিতে ইচ্ছে করছে এখুনি এই কীটটাকে মেরে ফেলতে। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রেখে কাপড়ের গোপন ভাঁজ থেকে দুটি পত্র বের করে সেটা এগিয়ে দিল নিপুণক। আবার গলার স্বর তুলে প্রায় চেঁচিয়ে বলল,

নাও। নিয়ে যাও এটা সাবধানে। এখনই রওনা দাও। আর মনে রেখো আমরা দু-জন কিন্তু গোপনে তোমার উপর নজর রাখব। যদি পালাবার চেষ্টা করো, বা, কোনো চালাকির চেষ্টা করো তবে...

কথায় না বলে নিপুণক একবার নিজের হাত কণ্ঠের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি টেনে দেখাল। ইঙ্গিত স্পষ্ট।

ঘাড় নেড়ে রোচক ভূর্জপত্র দুটি নিজের কোমরের কাপড়ে গুঁজে নিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসল। মাথা ঝুঁকিয়ে দু-জনকে অভিবাদন জানিয়ে মলয়কেতুর পার্বত্যক রাজ্যের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অর্থশাস্ত্রের আইন অনুযায়ী মৌর্য সাম্রাজ্যে ধর্ষণের সাজা ছিল মৃত্যুদণ্ড।

* * *

আছে রাজা মলয়কেতু। খেলার ছলে এক নারীর ঊর্ধ্বাঙ্গের অঙ্গাবস্ত্র খুলে ফেলার চেষ্টা করছে রাজা। নারীটিও হেসে উপভোগ করছে এই ধরাছোঁয়ার খেলা।

গত কয়েক দিন হল শকুনি নেই। সে মাঝে মাঝেই কোথাও চলে যায় কয়েক দিনের জন্যে। মলয়কেতুকে কখনো বলে না কোথায় যাচ্ছে। তবে মলয়কেতুর সন্দেহ যে, ব্রাহ্মণ আশেপাশেরই কোনো রাজ্যে যায়। কারণ কয়েক দিনের মধ্যেই সে ফিরে আসে। একবার মলয়কেতু ভেবেছিল যে, ব্রাহ্মণটার পেছনে লোক লাগাবে, দেখবে কোথায় যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সে-সাহস হয়নি তার।

শকুনি না থাকলেই মলয়কেতু সুখে থাকে। ওই লোকটার আশেপাশে মলয়কেতুর অস্বস্তি হয়। মলয়কেতুর বার বার মনে হয় যে, এই দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাকে যথাযথ সম্মান দেয় না, ব্রাহ্মণ তাকে নির্বোধ ভাবে। শকুনি এমন হাবভাব করে যেন সে-ই রাজা।

মলয়কেতুও সুযোগের অপেক্ষায় আছে। সে এমন কিছু ঠিকই একদিন করবে যাতে সকলে ওকে পুরুরাজের মতোই সম্মান ও সম্ভ্রমের চোখে দেখতে শুরু করবে।

তবে আপাতত ব্রাহ্মণ না থাকায় সে বিনোদনে ডুবে আছে। তার পাশের দুটি মেয়ের একজনেরও নাম তার মনে পড়ছে না যদিও, তবুও প্রেমিক-প্রেমিকার মতো আচরণ করছে। নাম জানার প্রয়োজনও নেই তার; রাজাদের সবার নাম জানার প্রয়োজন পড়ে না। এরকম অনেক নারী তার বিশেষ বিনোদনের জন্যে নিযুক্ত আছে। মলয়কেতু জানে যে, ফুলে যতদিন মধু আছে ততদিন মৌমাছির অভাব তার হবে না। তবে এই বিশেষ মেয়েটি বড্ড মোহময়। অদ্ভুত লাস্যময়ী তার শরীর, কামাতুর হাসি, চোখে মদিরার নেশা। গত কয়েক মাস ধরেই আছে তার মহলে। এর নামটা জানতে হবে ভাবল মলয়কেতু, যাতে পরেরবার প্রয়োজনে একে ডেকে নেওয়া যায়।

তোমার নামটা কী যেন সুন্দরী?

পদ্মা।

অন্য মেয়েটি হিংসার চোখে তাদের দেখছিল। কিন্তু মলয়কেতুর সেদিকে আর খেয়াল নেই। পদ্মা মেয়েটিকে মিষ্টি গলায় বলল,

– ওহ্, হ্যাঁ ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি সত্যিই পদ্মফুলের মতোই সুন্দর। কাছে এসো সুন্দরী।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল,

– মহারাজ পদ্মা নামে কিন্তু এক নাগিনও ছিল। আমার ঠাকুমা গল্প বলত আমায়।

— বিষ তো বটেই। তোমার চোখেই তো বিষ যাতে আমি ডুবে যাচ্ছি সুন্দরী। মলয়কেতু মেয়েটিকে কাছে টেনে নিতে উদ্যত হচ্ছিল, তখনই তার প্রধানামাত্য কক্ষে প্রবেশ করল। মহারাজকে অনেকদিন পর আবার এরকম দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল,

মহারাজ মলয়কেতু, ক্ষমা করবেন আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে।

মলয়কেতু মুখ তুলে মন্ত্রীকে দেখে বিরক্ত হলেও মুখে তা প্রকাশ না করে বলল, – না না, বিরক্ত কীসের, আর্য? মহারাজ মলয়কেতু সর্বদা দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর। বলুন, কী প্রয়োজন?

মন্ত্রী ইশারা করল দুটি মেয়েকে কক্ষ ত্যাগ করতে। একটি ভূর্জপত্রের চিরকুট রাজার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মহামাত্য বললেন,

– খানিক আগেই একটি পারাবত মারফত এই পত্র এসেছে। আমার মনে হয় আপনার একবার এটি দেখা উচিত।

মলয়কেতু হাত বাড়িয়ে সেটি নিল।

মহারাজ মলয়কেতুর জয়,

আপনি যাদের মিত্র ভাবছেন তারাই বিশ্বাসঘাতক। পৌরব রাজ্য বিপন্ন এবং আপনারও জীবনহানি করার চেষ্টা করা হতে পারে। প্রমাণ চাইলে সেই ভিনদেশি পত্রবাহককে খুঁজুন যে আপনারই দেশের উপর দিয়ে আপনার শত্রুর পত্র নিয়ে আসছে।

আপনার এক শুভাকাঙ্ক্ষী।

মলয়কেতুর নেশার ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। পত্রটি পড়ে ঠিক বুঝল না, তবে তার নিজের জীবন সংশয় হতে পারে এইটুকু সে বুঝতে পেরেছে। মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, — এটা

- কী?

বেনামি পত্র লিখে কেউ আপনাকে সাবধান করতে চেয়েছে, মহারাজ। আপনি আদেশ দিলে এই পত্রে লেখা কথার সত্যতা খতিয়ে দেখতে পারি।

— কীভাবে?

- আমাদের রাজ্যে সত্যিই এই মুহূর্তে কোনো গুপ্তচর গোপন কোনো পত্র নিয়ে প্রবেশ করেছে কি না সেটা খুঁজে দেখতে পারি।

— হ্যাঁ, তাই করুন।

- যথা আজ্ঞা, মহারাজ।

অমাত্য বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই মলয়কেতু তাঁকে আর একবার ডাকল, মহামাত্য।

পিছু ফিরলেন তিনি,

বলুন, মহারাজ।

আপনার কী মনে হয়, এখানে কার ব্যাপারে আমাকে সাবধান করা হয়েছে? কে আমার মিত্র সেজে আমার রাজ্য দখল করার চেষ্টা করছে?

অমাত্য কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন,

- জানি না, মহারাজ।

মলয়কেতু কয়েক মুহূর্ত মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,

— বেশ। আপনি আসতে পারেন। -

মন্ত্রী বেরিয়ে গেল। প্রশ্নের উত্তরটা কেউই মুখে স্বীকার না করলেও মনের গভীরে দু-জনই উত্তরটা বোধ হয় জানে।

১৫.

— আচার্য, আসতে পারি?

সকালের প্রার্থনা ধ্যান শেষ করে সবে ফলের থালার দিকে হাত বাড়িয়েছেন চাণক্য। উত্তর দিলেন,

এসো হে জীবসিদ্ধি, দ্বার খোলাই আছে।

জীবসিদ্ধি ভিতরে এসে চাণক্যকে প্রণাম করে একটি আসনে চাণক্যর মুখোমুখি বসল। বলল,

— তিনটি সংবাদ আছে।

চাণক্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন জীবসিদ্ধির দিকে। জীবসিদ্ধি উত্তর দিল, — প্রথম খবর এসেছে অক্ষয়ের থেকে। বাবাক নামে এক কামারের খোঁজ সে পেয়েছে। এই কামার তক্ষশিলায় থাকে বলে জানা গিয়েছে।

চাণক্য খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে খানিকটা নিজের মনেই বললেন, - আবার তক্ষশিলা। সব ঘটনা, সব নাম ঘুরে-ফিরে সেখানেই কেন আসে - বরাবর?

এবার আসি দ্বিতীয় পত্রে। সেটি এসেছে অমাত্য রাক্ষসের থেকে।

চাণক্য উৎসাহী ভঙ্গিতে এইবার জীবসিদ্ধির কথায় মনোযোগ দিলেন। জীবসিদ্ধি বলল,

- তিনি সংক্ষিপ্ত লেখায় জানিয়েছেন যে, সব ঠিক আছে।

-আর?

আর জানিয়েছেন যে, মগধের জনগণনার কাজ দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই হল সমস্যা অমাত্য— মন্ত্রীদের। এরা এইসব নিয়েই আছে। এই তথ্য আমাদের জানানোর কী প্রয়োজন? জনগণনা এখন কেন জরুরি?

জীবসিদ্ধির অলক্ষে চাণক্যর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল একমুহূর্তের জন্যে। জিজ্ঞেস করলেন,

— আর তৃতীয় সংবাদ? -

- আচার্য শকুনির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সে মলয়কেতুর রাজমহলে আছে।

উঠে বসলেন চাণক্য। বললেন,

- এটাই প্রত্যাশিত ছিল। প্রথমে গান্ধারের অম্বিক আর এখন মলয়কেতু। এদের দু-জনকেই অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত করা সহজ কিনা। সে এখন আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের একত্রিত করছে। সম্ভবত পার্বত্য প্রদেশের অন্য শাসকরাও যোগ দেবে তার সঙ্গে।

তাহলে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী, আচার্য?

চাণক্য আবার গা এলিয়ে একটি আপেল ও দইয়ের তৈরি মিষ্টি 'মঠা' শরবত তুলে নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন,

ওহে জীবসিদ্ধি, তোমার মনে আছে তোমার ছোটোবেলার একটি ঘটনার কথা? এই মঠঠার পাত্র দেখে কিছু মনে পড়ে যায়? জীবসিদ্ধি হেসে বলল, -

অবশ্যই মনে আছে। তক্ষশিলায় আপনি তখন শিক্ষক আর আমরা আপনার ছাত্র। কীভাবে জানি আপনার মঠের প্রবেশপথে কাঁটাঝোপ গজিয়ে উঠেছিল। আসতে-যেতে ছাত্রদের ও অন্যান্যদের পায়ে কাঁটা ফুটছিল। আমরা সকলেই বিরক্ত হয়ে দুটো অপশব্দ ব্যয় করে এড়িয়ে চলে যাচ্ছিলাম।

- হুমম। তারপর? -

আমরা পাঠশালায় বসে আপনার অপেক্ষা করছিলাম। ঢুকতে গিয়ে আপনারও পায়ে কাঁটা বিঁধল। আপনার সঙ্গে ছিল চন্দ্রগুপ্ত। সে তো কোথা থেকে একটা লাঠি নিয়ে এসে সেই কাঁটাঝোপ উপড়ে ফেলতে গেল। আপনি তাকে বাধা দিলেন। বললেন, 'ঝোপ ভেঙে লাভ নেই, চন্দ্রগুপ্ত। কারণ আবার কয়েক দিন পর পুনরায় এখানে কাঁটাঝোপ গজিয়ে উঠবেই।' এরপর আপনি একটি অদ্ভুত কাজ করলেন। নিজের কুটিরের ভেতর থেকে একপাত্র মিষ্টি মঠা নিয়ে এলেন। আপনার কুটিরে সবসময়ই মিষ্টি কিছু বানানোই থাকত। -

জীবসিদ্ধি হেসে উঠল।

আপনি সেই মিষ্টি শরবত কাঁটাঝোপের গোড়ায় ঢেলে দিলেন এবং আশপাশের মাটিতে ছড়িয়ে দিলেন। অন্য ছাত্ররা আপনার কাণ্ড দেখে হাসাহাসি জুড়ে দিল।

আপেল চিবোতে চিবোতে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

আর তোমরা? তোমরা হাসছিলে না? -

নাহ্। আমরা মানে আমরা ছ-জন আপনাকে চিনতাম, আচার্য। আমরা জানতাম যে, কারণ ব্যতীত কোনো কাজ আপনি করেন না। এই অদ্ভুত কাজেরও কোনো উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে আপনার। -

- হুমম।

চন্দ্রগুপ্তই জিজ্ঞেস করল আপনাকে যে, এটা আপনি কেন করলেন। আপনি যে উত্তর দিয়েছিলেন সেটা আমি কোনোদিন ভুলব না। আপনি আমাদের বলেছিলেন,

"ওই মিষ্টি দইয়ের টানে পিঁপড়ে আসবে। তারা এই কাঁটাগাছের শেকড় খেয়ে গাছটাকে মেরে ফেলবে। শেকড় নষ্ট হওয়ায় কাঁটাগাছ আর কোনোদিন সেখান থেকে পুনরায় গজিয়ে উঠতে পারবে না। শত্রুদেরও সবসময় এভাবেই শেষ করতে হয়— সমূলে! তোমরা সকলে সমস্যা এড়িয়ে যাচ্ছিলে, শুধু নিজেরটুকুই ভাবছিলে। কিন্তু দেখো, তোমাদের মিত্র চন্দ্রগুপ্ত কিন্তু সকলের সুবিধার কথা ভেবে গাছ ভেঙে দিতে উদ্যত হয়েছিল। সে এড়িয়ে যায়নি, যদিও তার পদ্ধতি ভুল ছিল। সমস্যা ও শত্রুর অবশেষ রাখতে নেই কখনো। তাকে সমূলে বিনষ্ট করতে হয় যাতে সেটি পুনরায় আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

জীবসিদ্ধির গল্প শেষ হতে চাণক্য শান্তস্বরে বললেন,

- – হুমম। কথাটা সবসময়ে মনে রাখবে।

– আপনার কি এই মঠুঠা দেখে সেই ঘটনা মনে পড়ল এখন নাকি এই কথার অন্য তাৎপর্য আছে?

উত্তর না দিয়ে চাণক্য শুধু হাসলেন।

তখনই দরজায় আরও একবার কড়া নাড়ার শব্দ হল।

ভেতরে আসুন।

চাণক্য বলতেই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী দ্বার খুলে দিল, আর কক্ষে চিত্রবর্মা প্রবেশ করল।

— প্রণাম, আচার্য। সুপ্রভাত, জীবসিদ্ধি মহাশয়। -

সুপ্রভাত, আর্য।

একটি খালি আসনে বসতে বসতে চিত্রবর্মা বললেন,

- কালকের ঘটনা শুনেছেন?

– রাজবৈদ্যর হত্যার?

- আজ্ঞে হ্যাঁ! মর্মান্তিক! সত্যি বলতে চক্রাচার্য শুধুই একজন অত্যন্ত কুশল বৈদ্য নয়, আমার পরম মিত্রও ছিল। আমি তো গতকাল দুপুরে বিশেষ কাজে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে শুনি এই কাণ্ড। আমি তো ভাবতেই পারছি না। আমি কড়াহাতে এই রাজ্যে দস্যুবৃত্তি দমন করব!

- আপনি মনে করেন এটা দস্যুদের কাজ?

এই প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে যুবরাজ প্রশ্ন করলেন,

মানে? অমাত্য শ্রীশৈল তো তাই বলল। কেন? আপনার কী মনে হয়?

চাণক্য কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

সন্দেহ নয় ঠিক। একটা সম্ভাবনা হতে পারে যে, বৈদ্য মহারাজের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানতেন যা গুরুত্বপূর্ণ। -

কিন্তু চক্রাচার্য তো একদিন আগেই আপনার কাছে সব কথা বলেছে। তার আবার নতুন করে কী বলার থাকতে পারে?

আমি বলিনি যে, এটাই কারণ তাকে হত্যার, আর্য। এটা সম্ভাবনা মাত্র সেই মর্মেই আমি শ্রীশৈলকে বলেছিলাম যে, বৈদ্যর স্ত্রীর জন্যে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে। কারণ হতে পারে তাঁর স্ত্রীকে তিনি কিছু বলে গিয়েছেন। আজকে সকালেই একবার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে আছে। -

দু-দিকে ঘাড় নেড়ে চিত্রবর্মা বললেন,

সে-সম্ভাবনা নেই, আচার্য। কারণ, অনেক বছরের মিত্রতার সূত্রে আমি চক্র ও তার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত। তার স্ত্রী শিক্ষিতা না হওয়ায় চক্রর আজীবন আফশোস ছিল যে, সে তার নতুন নতুন জ্ঞানের তত্ত্ব তার জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে না। ও অনেকবার ওর স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওর স্ত্রী... মানে সত্যি বলতে সে একটু মন্দবুদ্ধির স্ত্রীলোক।

- তবে এটা বড়োই আফশোসের কথা।

- তবুও একবার চলুন তার গৃহে। আমি এমনিতেই একবার তার গৃহে যাব। শুধু যুবরাজ হিসাবে নয়, মিত্র হিসাবে চক্রর স্ত্রীর পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য। আমার সঙ্গেই আপনারাও চলুন না।

-বেশ তো। আমরা তৈরি, আপনি বেরোলে আমাদের ডেকে নেবেন দয়া করে। বেশ, বেশ। -

কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল চিত্রবর্মা। জীবসিদ্ধি দ্বার রুদ্ধ হওয়া অবধি অপেক্ষা করার পর বলে উঠল,

আমার তো মনে হয় এ-ই হত্যাকারী। -

- কার?

— রাজার। এবং বৈদ্যর। এ একা অথবা শ্রীশৈলর সঙ্গে মিলে হত্যা করেছে। চাণক্য উঠে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন,

ওহে জীবসিদ্ধি, এই হত্যাকাণ্ডে ‘কে’ জরুরি নয়, যতটা না ‘কীভাবে’ এবং 'কেন'।

— 'কেন'-র উত্তর কি সহজ নয়? রাজসিংহাসনের লোভে।

হুম। কিন্তু তাই যদি হয় তবে আমাদের আমন্ত্রণ করা কেন? কেন আমাকে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে বলবে সে নিজেই?

জীবসিদ্ধি অস্থির ভঙ্গিতে উত্তর দিল,

আমি নিশ্চিত এটা আপনাকে মগধ থেকে বের করে আনার জন্যে। আপনার প্রাণ সংশয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে, আচার্য। আপনি দয়া করে আমাকে ছাড়া একা কোথাও যাবেন না। বা, অঙ্গরক্ষক হিসাবে সর্বক্ষণ সঙ্গে অন্তত একজন মগধের সৈনিককে রাখবেন। -

জীবসিদ্ধি, একমাত্র কোনো মুর্খই আমাকে নিজের গৃহে ডেকে এনে হত্যা করে গোটা মগধের রোষ কাঁধ পেতে নেবে। কুলূতের মাটিতে আমার যদি বজ্রপাতেও মৃত্যু হয় তবে চন্দ্রগুপ্ত সেটাকে কুলূতের ষড়যন্ত্র বলেই ধরে নেবে এবং এই গোটা রাজ্য ধুলোয় মিশিয়ে দিতে মগধ সেনার তিনদিন লাগবে বড়োজোর। এবং, এই কথা চিত্রবর্মাও জানে। সে আর যা-ই হোক, মূর্খ নয় যে, নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনবে। অতএব, জীবসিদ্ধি এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার মত ভিন্ন। তুমি প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কায় আছ যে, আমার প্রাণহানির চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আমি প্রায় নিশ্চিত যে, চিত্রবর্মা কখনোই নিজের দেশের মাটিতে আমার উপর আক্রমণ করার সাহস করবে না।

চাণক্যর কথায় জীবসিদ্ধিকে খুব একটা সন্তুষ্ট বলে মনে হল না। গজগজ করতে করতে বলল,

- - তবুও, সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। আমি যা বললাম তা আপনি দয়া করে মেনে চলবেন।

চাণক্য তার কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। অন্যমনস্কভাবেই নিজের কেশশিখায় হাত বুলিয়ে বললেন,

— কিছু একটা ঘটছে যা খুব সহজ, একদম আমাদের চোখের সামনেই আছে। কিন্তু আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি না। ওই বিশেষ তির এখানে কেন? গোটা বিষয়টায় কি শকুনির কোনো ভূমিকা আছে? থাকলে সেটা কী? কীভাবে সকলের চোখের সামনে হত্যা করা হল রাজাকে অথচ কেউ হত্যাকারীকে দেখতে পেল না? বৈদ্যর হত্যা কি নিতান্তই সমপাত নাকি সেটাও গোটা চক্রজালের অংশ? আমার মন বলছে রাজার মৃত্যুরহস্যের উত্তরটা পেলেই সব সমাধান হয়ে যাবে। অথচ গোটা ব্যাপারটা এতটাই অস্বাভাবিক...

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় জীবসিদ্ধি চাণক্যর কথা মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বলল,

আচার্য, এখনও কিন্তু সেই তিরন্দাজ প্রতিযোগীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা বাকি। তাদের মধ্যেই হত্যাকারী লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল। বা, যদি তা নাও হয়, তাদের থেকে হয়তো কোনো সূত্র পাওয়া যাবে যে, কোন উপায়ে এতদূর থেকে বাণ নিক্ষেপ করা সম্ভব, তাও আবার সকলের দৃষ্টির থেকে নিজেকে লুকিয়ে।

- হুম। আমার মনে আছে, জীবসিদ্ধি। বৈদ্যর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেই পরের প্রহরে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

তখনই বাইরে থেকে ডাক এল,

মহামতি চাণক্য, যুবরাজ চিত্রবর্মা জানালেন রথ প্রস্তুত। তিনি বাহিরে প্রাঙ্গণে আপনাদের অপেক্ষা করছেন। -

---

চাণক্যর পায়ে কাঁটা ফুটে যাওয়ার এই কাহিনি খুবই প্রচলিত লোককাহিনি।

১৬.

চারজনের দলটা গ্রামের সীমার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরনের পোশাক নিতান্ত সাদামাটা, গ্রাম্য। কিন্তু তাদের যে ঘোড়াগুলো গাছের সঙ্গে খানিক দূরেই বাঁধা আছে সেগুলো দেখলেই অনুমান করা যায় যে, এধরনের জাতের ঘোড়া একমাত্র মগধের বিশেষ রাজকর্মীদের জন্যে বরাদ্দ থাকে। দলপতি শশাঙ্ক বার বার আকাশের দিকে চেয়ে সূর্যের অবস্থান দেখে সময় অনুমান করার চেষ্টা করছে। দুপুরের সূর্য দেখে মনে হয় দিনের তৃতীয় প্রহরের মাঝামাঝি সময় এখন।

- ওই আসছে। -

দলের একজন জানাল। সকলেই তাকিয়ে দেখতে পেল যে, গ্রামের মেঠোপথ ধরে একজন লোক হেঁটে আসছে। লোকটি এসে প্রথমে দলপতিকে এক বিশেষ সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বলল,

খবর ঠিক ছিল, আর্য শশাঙ্ক। অস্ত্রনির্মাতা বাবাকের কুটির এখানেই আছে। এবং, যেটুকু খবর পেলাম গ্রামের ও আশেপাশের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে, তিনি যথেষ্ট বিখ্যাত একজন অস্ত্রনির্মাতা। গান্ধাররাজ অম্বিক তাঁকে একসময়ে তাঁর সেনার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণশালার তদারকির কাজে বহাল করেছিলেন।

অম্বিকের নাম শুনে শশাঙ্কর পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ায় একবার নাক কুঁচকে বললেন,

অম্বিক বরাবরই মূর্খ। সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই চিনি ওকে। ওর কথা বাদ দাও। তবে, এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ বটে। কারণ, অম্বিকের হয়ে রাজ্য চালাত তার মহামাত্য আচার্য শকুনি। অতএব, বলাই চলে যে, বাবাক আসলে শকুনির নির্বাচন। অতএব, এখনও যে শকুনি তাকে দিয়েই অস্ত্র বানাবে এই সম্ভাবনা প্রবল।

— তবে এবার আমাদের করণীয় কী?

তোমরা গ্রামের লোকেদের মাঝে মিশে যাও। কুটিরের কাছে পৌঁছোও। আমিও যাচ্ছি সেখানেই। আমি নিজেই বাবাককে জিজ্ঞাসাবাদ করব।

শশাঙ্ক যা আশা করেছিল, সেইস্থানে পৌঁছে দেখল বাবাকের কুটির তার চেয়ে অনেকটাই বড়ো। কুটিরের দুই ধার থেকে উঁচু পাঁচিল উঠে গিয়েছে। দরজায় কড়া নাড়াতে এক যুবক এসে দরজা খুলে দিল। যুবকের নাক ও চোখ সরু, ভ্রূ কম। দেখেই বোঝা যায় এ আর্যাবর্তর দেশীয় মানুষ নয়। সম্ভবত মোঙ্গলীয়। তবে যুবক পরিষ্কার দেশীয় ভাষায় কথা বলল।

- কী প্রয়োজন, বলুন?

আমি অস্ত্রনির্মাতা বাবাকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

হ্যাঁ, আসুন। তিনি আমার পিতা। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। আসুন ভিতরে। ছেলেটি শশাঙ্ককে বাড়ির পেছনের দিকে বারান্দায় নিয়ে এল। এক মধ্যবয়সি পুরুষ বারান্দায় একটি তুলোর আসনে গা এলিয়ে গড়গড়া থেকে ধূমপান করছে। এই ব্যক্তিও মোঙ্গলীয় চেহারার। পিতাপুত্রর মুখ ও চেহারার একই গড়ন, তবে পিতার মুখে একগাল কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। এই বয়সেও বলিষ্ঠ চেহারা এই বিদেশির।

— পিতা, ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

বাবাক ঘাড় ঘুরিয়ে শশাঙ্ককে দেখে সোজা হয়ে বসল।

বলুন মহাশয়, আপনার কী সেবা করতে পারি? গদিতেই বাবাকের পাশে বসে শশাঙ্ক বলল,

আপনাকে একটি বস্তু দেখাতে চাই, মহাশয়।

নিজের অঙ্গাবস্ত্রের ভাঁজ থেকে কাপড় জড়ানো তিরটি বের করে আনল শশাঙ্ক। কাপড় সরিয়ে সেটাকে বাবাকের মুখের সামনে ধরতেই বাবাকের চোখে স্পষ্ট চেনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। এইবার সরাসরি প্রশ্ন করল শশাঙ্ক,

— এই বাণ আপনি চেনেন?

শশাঙ্ক অপেক্ষা করল বাবাকের উত্তরের। এখন যদি লোকটা অস্বীকার করে যে, এই বাণ সে চেনে না, তবেই স্পষ্ট হয়ে যাবে লোকটির অবস্থান। যে, সে জেনেশুনে মিথ্যে বলছে অর্থাৎ শত্রুদের সঙ্গে সে জড়িত। আর যদি হ্যাঁ বলে, তবে এই সম্ভাবনাই বেশি যে, কামার নিজের অজান্তেই এই বাণ বানায় শকুনির সেই তিরন্দাজ হত্যাকারীর জন্যে।

উপরনীচে মাথা নাড়িয়ে বাবাক উত্তর দিল,

— হ্যাঁ। এটা আমার বানানো।

— আপনি ছাড়া এই বাণ কি আর কেউ বানায়?

সম্ভবত না। কারণ দেখতেই পাচ্ছেন এই বাণ সাধারণের থেকে ভিন্ন। অন্তত এই বাণটি যে আমার হাতে বানানো সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু এই প্রশ্ন কেন করছেন বলুন তো?

শশাঙ্ক একবার বাবা আর তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলের দিকে দেখে নিয়ে, একটু ভেবে বলল,

ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয়। কিন্তু যেহেতু আপনি আমায় সত্য বললেন, তাই আমিও আপনাকে সত্যটা জানাব। অন্তত যতটা জানানো সম্ভব ততটা জানাব। সোজাসুজি বলি, আমি মগধের রাজকর্মচারী। আমরা এক হত্যাকারীর খোঁজ করছি যে এই বিশেষ বাণ ব্যবহার করে। -

পিতাপুত্র কিছুটা চমকাল। বাণটা হাতে নিয়ে সেটার উপর এমনভাবে হাত বোলাতে লাগল যেমন পোষা ময়নার গায়ে মানুষ হাত বুলিয়ে দেয়। অনেকটা শিক্ষকের ভঙ্গিতে বলল,

সাধারণ বাণের ফলায় খাঁজ থাকে যাতে তা শিকারের শরীর থেকে টেনে বের করে আনাটা পীড়াদায়ক হয়। মানে শরীরে বিদ্ধ থাকা ফলা বের করার সময়ে খাঁজে লেগে শরীরের ধমনী, মাংস কেটে বেরোয়। কিন্তু এই বিশেষ বাণে ফলা নেই। মাথার সঙ্গে লাগানো সামান্য লোহার অংশ ঘষে ঘষে সুচালো করা। এই তিরটি ঠিক তির নয়, যেন বড়ো একটি শলাকা। কেন জানেন?

কেন?

কারণ আমায় যে এই বাণ বানাতে বলেছিল সে এভাবেই বানাতে বলেছিল।



কেন এই বাণের ফলার প্রয়োজন নেই জানেন? যাতে এই শলাকার মতো ফলার মাথায় সহজেই সামান্য বিষ লাগিয়ে দেওয়া যায়। এই বাণ একবার কারুর শরীরে বিদ্ধ হলেই তার মৃত্যু অবধারিত। তাই টেনে বের করে আনার সময়ে শিকারকে অতিরিক্ত যন্ত্রণা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, শিকার ততক্ষণে যমের দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছে।

চমকাল শশাঙ্ক। প্রশ্ন করল,

- আপনি জানতেন যে, এই তিরের মাথা বিষে চুবিয়ে ব্যবহার করার হয়?

জানতাম না, কিন্তু অনুমান করেছিলাম। তা ছাড়া এধরনের তির বানাতে দেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু, আমি একজন অস্ত্রনির্মাতা। ক্রেতার ইচ্ছামতো অস্ত্র বানিয়ে দেওয়াই আমার ধর্ম। কোন কাজে তা ব্যবহার হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব আমার নয়।

— কিন্তু, এই তিরে বিশেষ কী আছে যা শুধু আপনিই বানাতে পারেন?

মৃদু হাসল বাবাক। বলল,

ফলা না থাকায় এই বাণের ক্ষেত্র কমে যায়, যার ফলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর হাওয়ার সঙ্গে ঘর্ষণ কম হয়। এতে হাওয়ায় ছুটে যেতে থাকা শরের গতি হ্রাস হয় না। এর ফলে এই বাণ সাধারণ শরের থেকে বেশি দূর অবধি উড়ে যেতে পারে। তিরন্দাজের শিকারের পরিসর অনেক বেড়ে যায় এই বাণের ক্ষেত্রে। কিন্তু এর ফলে একটি সমস্যা হয়।

- কী সমস্যা?

ভারসাম্য! সাধারণ বাণের ক্ষেত্রে ফলার ওজনের সঙ্গে সমতা এনে দেয় উলটোদিকে লাগানো পালকযুক্ত লোহার এই খাঁজযুক্ত অংশ, যার মধ্যে ধনুকের গুণ ঢুকে যায়। কিন্তু এই বাণের ক্ষেত্রে ফলা না থাকায় দু-দিকের ভার সমান হতে পারে না, যার ফলে এমনিতে এই বাণ ব্যবহারের অযোগ্য বলা চলে। কিন্তু, আমি এর সমাধান বের করি।

- সমাধান?

- হ্যাঁ মহাশয়, সমাধান। এই তিরের মাথার দিকে, যেখানে লোহার অংশ শেষ হয়েছে সেখানে এই লাল মোটা সুতো জড়ানো লক্ষ করেছেন? কী ভেবেছেন? এটা শুধুমাত্র অলংকার? না মহাশয়, না। এর বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। গুনে দেখুন, এই সুতোয় ঠিক তেরোটা প্যাঁচ আছে প্রতিটি বাণে। এই মোটা ভারী সুতোই সমতা আনে ল্যাজার দিকের ভারের সঙ্গে। দেখুন।

বাবাক নিজের ডান হাতের তর্জনীর উপর বাণটার মধ্যভাগ রেখে সেটাকে ছেড়ে দিল। বাণ সুন্দরভাবে ঠিক দাঁড়িপাল্লার মতো দোল খেয়ে সোজা হয়ে গেল অনুভূমিকভাবে।

একটি বাণ নির্মাণের মধ্যে যে এতখানি বৈজ্ঞানিক কারিগরি থাকে তা জেনে শশাঙ্ক বিস্মিত হল। কিন্তু দ্রুত আসল কথায় ফিরে এল,

- — আপনাকে এই বাণ কে বানাতে দিয়েছিল?

দু-দিকে ঘাড় নেড়ে বাবাক বলল,

চিনি তাকে। একজন যুবক। যোদ্ধার মতো চেহারা। নাম বলেছিল শঙ্কুমণি।

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল শশাঙ্ক। তারপর হেসে উঠল,

– শত্রুর কৌতুক জ্ঞানের প্রশংসা না করে পারলাম না। শঙ্কুমণি, শকুনির আসল নাম। আপনাকে যে যোদ্ধা এই বাণ বানাতে দেয় সে যে-ই হোক, শকুনি নয়। ওটা ভুয়ো নাম, বাবাক মহাশয়। বাদ দিন। আমায় বলুন আপনি কি বর্তমানে সেই ব্যক্তির জন্যে তির বানাচ্ছেন?

- আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বলে উঠে দাঁড়াল বাবাক। ভেতরের ঘর থেকে ভারী একটি কাঠের পেটি এনে মেঝেতে নামিয়ে রাখল। ডালা খুলতেই ভেতরে এক-শো মতো বাণ দেখা গেল। সবক-টাই অবিকল শশাঙ্কর হাতে ধরা বাণের মতো দেখতে। ফলাহীন তীক্ষ্ণ মাথা, তার পরেই লাল সুতো জড়ানো।

বাবাক বলল,

- - আগেরবার দেড়শো বাণের দাম দিয়ে গিয়েছিল। এখানে এক-শোর বেশি আছে। আরও খান কুড়ি মতো বানানো বাকি।

- তার মানে শীঘ্রই তার আসার কথা?

– তাই তো আশা করা যায়। এসে সে যেকোনো একটা তির চালিয়ে পরীক্ষা করে নেয় আগে।

- সাধু।

কিছুক্ষণ ভেবে শশাঙ্ক প্রশ্ন করল,

- তাকে দেখতে কেমন?

- সে এই দেশেরই লোক। লম্বা, চওড়া, পেশিবহুল যোদ্ধার মতো চেহারা। কাঁধ অবধি কালো চুল।

চেহারায় বিশেষ কোনো কিছু যা দিয়ে লোকটিকে চিহ্নিত করা যায়?

- হ্যাঁ, বাম গালে বড়ো একটা কাটা দাগ আছে। কপাল থেকে, চোখ দিয়ে

নেমে গোটা গাল জুড়ে। আগে যুদ্ধে কোনো তরবারির আঘাতের চিহ্ন ওটা।

বেশ। শেষ প্রশ্ন, আপনি ছাড়া যে অন্য কেউ এই বিশেষ বাণ বানাতে পারে না, সেটা বুঝলাম। কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত যে, এই যে পুরুষটি আপনার থেকে বাণ নিয়ে যায় সে-ই একমাত্র সেই বাণ ব্যবহার করে? এমনও তো হতে পারে যে, একদল তিরন্দাজ আছে যারা এই বাণ ব্যবহার করে!

অসম্মতি প্রকাশ করে দু-দিকে মাথা নাড়ল বাবাক। বলল,

– না, না। এই বাণ চালানো খুবই কঠিন। একমাত্র এক অতি কুশল ধনুর্ধর ব্যতীত কেউ এই বাণ ব্যবহার করতে পারবে না। তাও বহুদিনের অভ্যাসের পরেই তা সম্ভব। তাই আমি নিশ্চিত যে, এই বাণ একমাত্র সেই যুবক যোদ্ধাই চালায় এবং সে-ই আপনাদের কাঙ্ক্ষিত হত্যাকারী।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শশাঙ্ক বলল,

বেশ। পরেরবার সে এখানে আপনার থেকে এই তির ভরতি পেটি নিতে এলেই আমাদের হাতে ধরা পড়বে। আপনার গৃহের বাইরে আমরা প্রতি প্রহরে সর্বক্ষণ নজর রাখব। শিকারি খুব শিগগিরই শিকার হবে, ধরা দেবে আমাদের ফাঁদে। -

১৭.

নাগর নগরের দক্ষিণে বৈদ্য চক্রাচার্যর গৃহ। গৃহে আজ শোকের ছায়া। কিছু প্রতিবেশী ও আত্মীয় গৃহের উঠোনে বসে আছেন এবং নিজেদের মধ্যেই মৃদুস্বরে কথা বলছেন। ভিতর থেকে স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

রাজরথ এসে থামতেই কয়েক জন লোক এগিয়ে এল। চিত্রবর্মাকে দেখে তাঁদের একটাই প্রশ্ন ছিল,

মৃতদেহ কখন পাওয়া যাবে?

চিত্রবর্মা উত্তর দিলেন,

- একটু বাদেই সৈনিকরা নিজেরাই মরদেহ এখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে। আমি নিজে তাদের এই নির্দেশ দিয়েছি। আপনারা দয়া করে আর সামান্য ধৈর্য ধরুন। মৃতদেহ পরীক্ষা শেষ হয়েছে বলেই খবর পেয়েছি ইতিমধ্যে। আমরা চক্রাচার্যর পরিবারকে জানাতে এসেছি।

হাতজোড় করে চিত্রবর্মা এগিয়ে গেল গৃহের দিকে, তার পিছনে চাণক্য ও জীবসিদ্ধি।

ভিতরে ঢুকে তাঁরা দেখলেন এক বৃদ্ধার কাঁধে মাথা রেখে এক স্ত্রীলোক সর্বহারার কান্না কেঁদে চলেছে। তার পাশেই একটি দশ অথবা এগারো বছর বয়সি ছোটোছেলে বসে। চাণক্য ও জীবসিদ্ধি অনুমান করতে পারলেন যে, এ-ই বৈদ্যর সদ্যবিধবা স্ত্রী।

এই পরিস্থিতিতে মহিলাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা সম্ভব নয় বুঝেই চাণক্য একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শোকগ্রস্ত মহিলা তাঁদের উপস্থিতি টেরও পেলেন না। তবে চিত্রবর্মাকে দেখে মহিলার পাশে বসে থাকা ছেলেটি উঠে এল। অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করায় ছেলেটিরও চোখ লাল। চিত্রবর্মাকে প্রণাম করে বলল,

বাবার মৃতদেহ কখন আনতে পারব, যুবরাজ?

তোমাদের কষ্ট করতে হবে না, ভগীরথ। আমার লোকেরা দেহ নিয়ে আসবে। চক্রাচার্যকে রাজকীয় সম্মানে শেষ বিদায় জানানো হবে। আমি তোমাদের পাশে আছি। -

- অজস্র ধন্যবাদ।

আমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁরা খুব পন্ডিত মানুষ, ভগীরথ। ওঁরা তোমার মাতাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান। তোমার পিতার মৃত্যুর বিষয়ে সাহায্য করতে এসেছেন।

ছেলেটি একবার চাণক্য ও জীবসিদ্ধির দিকে দেখল, তারপর নিজের মায়ের দিকে দেখল। তাঁদের উদ্দেশ করে বলল,

— ব্রাহ্মণদেব, ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার মাতাকে এখন প্রশ্ন করে লাভ হবে না।

চাণক্য এগিয়ে এসে ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে বললেন,

— ওঁকে বিব্রত করার প্রয়োজন নেই। তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি? - করুন।

— তোমার পিতা কি কখনো তোমায় বা তোমার মাতাকে কিছু বলেছিলেন? কী বলবেন?

ছেলেটি ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল। চাণক্য বুঝতে পারলেন এভাবে হবে না। প্রশ্ন পালটে জিজ্ঞেস করলেন,

গত দু-দিনে তিনি কী করছিলেন, বা, তাঁর সঙ্গে কে কে দেখা করতে এসেছিল বলতে পারো?

- পিতা গত দু-দিন বাড়িতেই ছিলেন। প্রচুর পড়াশুনা করছিলেন কিছু একটা নিয়ে। এক-দুইজন মানুষ এসেছিলেন বিকালের দিকে ঔষধি নিতে। বাকি সময়ের কথা বলতে পারি না, কারণ আমি পাঠশালায় ছিলাম।

—— বৈদ্য মহাশয় কী বিষয়ে পড়াশুনা করছিলেন বলতে পারো?

— না, তা আমি বলতে পারি না। পিতার কাজ আমি বুঝি না... বুঝতাম না। শেষ কথাটা বলার সময়ে গলা আটকে এল ছেলেটির। চাণক্য বললেন,

— কী বিষয়ের পুস্তক তিনি পড়েছিলেন জানো? বা, দেখাতে পারো?

ছেলেটি পাশের কক্ষে হাঁটা দিল। তার পিছু পিছু তারা তিনজন ঢুকল। গোটা ঘরে শুধু একটি আসন, একটি চারপায়া পাঠ করার নীচু মেজ আছে। বাদবাকি পুরো ঘর শুধুই

চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক পুথিতে ভরা। পড়ার মেজ আর আসনের আশেপাশেই অন্তত খান পঞ্চাশ পুস্তক রাখা। চাণক্য একে একে সেগুলো হাতে নিয়ে দেখলেন সেগুলোর বিষয়বস্তু। অবশেষে ঘাড় নেড়ে বললেন,

ভগীরথ। নাহ্, এভাবে কিছুই অনুমান করা যাবে না। আমরা আসি তবে, তোমার জন্যে এই মুহূর্তে আমার কাছে সমবেদনা ছাড়া কিছু দেওয়ার নেই। তবে যদি বিষ্ণু চান, তোমার পিতার হত্যাকারীকে তোমার সামনে হাজির করব।

গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে চিত্রবর্মা বললেন,

আপনারা ফিরে যেতে চাইলে যান রথ নিয়ে। আমি এখানেই থাকি। আপনারা পৌঁছে শুধু আমার জন্যে রথ ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ, আর্য।

পথে চাণক্য একটাও কথা বললেন না। জীবসিদ্ধিও জিজ্ঞেস করল না। রথ থেকে নেমে মহলে ঢোকার সময়ে চাণক্য বললেন,

—বৈদ্য কী বিষয়ে গত দু-দিন অধ্যয়ন করেছেন সেটা লক্ষ করেছ, জীবসিদ্ধি? হ্যাঁ। মৃতদেহর পরীক্ষানিরীক্ষা বিষয়ক পুস্তক সবক-টি। কিন্তু, তা থেকে তো এটা বোঝা সম্ভব নয় আচার্য তিনি কী জানতে চাইছিলেন।

হুমম। কিন্তু এটা থেকে একটা বিষয় বোঝা সম্ভব যে, আমার অনুমান ভুল ছিল না। বৈদ্যর হত্যা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, জীবসিদ্ধি। দু-দিন আগে আলোচনায় তিনি এমন কিছু সূত্র পেয়েছিলেন যা তিনি পুনর্বার খতিয়ে দেখতে চাইছিলেন। এবং, সেটিই সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সমস্যা হল, যেখানে একমাস পূর্বেই মৃতদেহ ভস্ম হয়ে গিয়েছে সেখানে তিনি কী এমন জরুরি তথ্য পাওয়ার আশা করছিলেন? আর সেটি তিনি কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে সম্ভবত তাঁর হত্যাকারী, তাঁকে বলতে গেলেনই-বা কেন?

কথার মাঝেই চাণক্য কক্ষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। নিজের কক্ষে ঢুকে চাণক্য বললেন,

জীবসিদ্ধি, শ্রীশৈলকে বলো আমি ওই তিরন্দাজ প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বেশ।

বলে জীবসিদ্ধি বেরিয়ে যাচ্ছিল, চাণক্য পিছু ডেকে বললেন,

আর শোনো, আমার জন্যে কিছু মিষ্টান্ন বানাতে বলো আমাদের মগধের ভৃত্যকে। আমার মস্তিষ্ক কাজ করছে না। ওহে জীবসিদ্ধি শুনলে...?

শেষ কথাগুলো ইচ্ছে করেই শুনতে না পাওয়ার ভান করে জীবসিদ্ধি দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

১৮.

একে একে প্রত্যেক প্রতিযোগীর সঙ্গে কথা বললেন চাণক্য। কিন্তু, তাদের কথা থেকেও নতুন কোনো তথ্যই পাওয়া গেল না। শেষ যাকে ডাকা বাকি ছিল সে প্রতিযোগিতার বিজয়ী হওয়ার দাবিদার। সে বিজয়ী হয়নি কারণ মহারাজের উপর আক্রমণের পরেই প্রতিযোগিতা স্থগিত করে দেওয়া হয়।

জীবসিদ্ধি ছাড়াও এই সময়ে চাণক্যর কক্ষে চিত্রবর্মা ও শ্রীশৈলও উপস্থিত। শেষজনকে যখন ডাকা হল ততক্ষণে চাণক্যও হতাশ হয়ে পড়েছেন। তবুও শেষ প্রতিযোগী ধনুর্ধরকে ডাকার নির্দেশ দিলেন তিনি। তামাটে বর্ণের এক দক্ষিণ ভারতীয় পুরুষ এসে প্রবেশ করে উপস্থিত সকলকে প্রণাম করল।

- প্রণাম।

- প্রণাম। আপনার নাম? -

- বিন্দু।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, যেদিন আপনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছিলেন সেই সময়েই মহারাজের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়? -

অধৈর্য ভঙ্গিতে বিন্দু বলল,

আমি জানি, ব্রাহ্মণদেব। এবং, তারপর থেকে আমাদের সকলকে বহুবার রাজসৈনিকরা প্রশ্ন করেছে, রীতিমতো এখানে গৃহবন্দি করে রেখেছে গত একমাস। আমি জানি না আপনার আলাদা করে আর কী জানার থাকতে পারে। আমরা মুক্তি চাই, যুবরাজ। দয়া করে এবার আমাদের সকলকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দিন। আমার পরিবার আমার অপেক্ষায় আছে।

শেষ কথাগুলো চিত্রবর্মাকে উদ্দেশ করে বলা হল। চিত্রবর্মা কিছুটা অপ্রস্তুতে পড়লেন। চাণক্যই তাঁর হয়ে বললেন,

– নিশ্চয়ই ফিরবেন, হে ধনুর্ধর। কিন্তু প্রতিযোগিতার ফলাফল অমীমাংসিত রেখে ফেরাটা যে রাজ্যের পক্ষে অসম্মানজনক। আপনিও তো বিজয়ী হতেন। প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর আপনিই ছিলেন শুনলাম। তাই যুবরাজ আর মহামন্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল একটু আগেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আগামী কয়েক দিন বাদেই রাজ্যে আবার উৎসব আছে। প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিকে মহারাজও আরোগ্যের পথে। তাই আমরা

ভাবছিলাম আপনারা আরও কয়েক দিন যদি অপেক্ষা করে যান, তবে একবারে আগের প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ সেইদিনই আমরা করে দিতাম।

এই কথায় লোকটির মুখের মেঘ কিছুটা কাটল। বলল,

- সেটা তো ভালো প্রস্তাব। এমনিতেই যখন দেরি হয়েই গেল একমাস, আর কয়েক দিন দেরি করাই যায়। মহারাজের আরোগ্যের কথা শুনে খুশি হলাম। সাধু।

সাধু। কিন্তু, অপরাধী যেহেতু এখনও অধরা, তাই আপনাকে আরও একবার আমি বিরক্ত করতে চাই। যদি সেদিনের ঘটনা আপনার স্মৃতি থেকে পুনরায় আমায় বলেন তবে বড়ো ভালো হয়।

একটু ভেবে নিয়ে গুছিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করল বিন্দু। এর কথাও আর সকলের মতোই হুবহু এক। কেউই কোনো ধনুর্ধর বা সৈনিকদের মধ্যে কাউকে মহলের দিকে বাণ নিক্ষেপ করতে দেখেনি।

চাণক্য কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবলেন। তারপর বললেন,

- আমি একটা পরীক্ষা করার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু সেটা করতে আপনার সাহায্য প্রয়োজন, বিন্দু। আপনি কি আমায় সাহায্য করবেন?

- - আমার সাহায্য প্রয়োজন? বেশ, বলুন কী সাহায্য, ব্রাহ্মণদেব?

চাণক্য শ্রীশৈলর দিকে ফিরে বললেন,

— আর্য, আমি একটি পরীক্ষা করতে চাই। খড়, তুলো আদি দিয়ে মোটামুটি একটি মানবাকৃতি পুতুল বানাতে কতক্ষণ লাগবে আপনাদের কর্মচারীদের? পুরো পুতুল লাগবে না, কোমর অবধি হলেই হবে।

কিছুটা বিস্মিত হয়ে বৃদ্ধ মন্ত্রী উত্তর দিলেন,

— তা, এই প্রহরের মধ্যেই হয়ে যাবে। -

বেশ, বেশ। তাহলে এখনই তা বানানো শুরু করার নির্দেশ দিন। তারপর সেটিকে একটি খুঁটির উপর বসিয়ে যেন মহলের প্রাঙ্গণের দিকের ওই বারান্দায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক যেখানে মহারাজ সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলেন। ব্যাপারটা আপনি দেখে-শুনে করিয়ে নিতে পারবেন, আশা করি?

— উম... মানে... হ্যাঁ, তা হয়ে যাবে। কিন্তু, আপনি কী করতে চাইছেন, আচার্য?

চাণক্য বিন্দুর দিকে ফিরে বললেন,

আমি চাই আপনি পুতুলটি লক্ষ করে তির নিক্ষেপ করুন। বিন্দু শঙ্কিত হয়ে বলল,

আচার্য, আমি নির্দোষ! আমি কিছু করিনি। দেখুন, আমি পূর্বে অঙ্গারাজ্যের সেনাতে ছিলাম। অবসর নিয়েছি কয়েক বছর পূর্বে। আমি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতে বা

বিভিন্ন জায়গায় তিরন্দাজির খেলা দেখিয়ে উপার্জন করি। আপনি চাইলে আমায় দেওয়া অঙ্গরাজের প্রশংসাপত্র দেখতে পারেন। আমি বুঝতে পারছি যে, সেদিনের সেরা ধনুর্ধর বলে আপনি আমাকেই সন্দেহ করছেন...।

হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে চাণক্য বললেন,

আপনি ভুল করছেন, বিন্দু। আপনাকে অন্যায়ভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করার কোনো অভিপ্রায় নেই। চণক পুত্র চাণক্য তার স্বর্গীয় পিতার নামে শপথ করে বলছে যে, আমি কোনো নির্দোষ মানুষকে ফাঁসিয়ে দেব না। আমি শুধুমাত্র আপনার কাছে সাহায্য চাইছি মাত্র। সেইরকম মনে করলে আপনি এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নাও করতে পারেন। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

চাণক্যর কথা বলার ভঙ্গিতে যে আন্তরিকতা ছিল তাতে বিন্দু আশ্বস্ত হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

বেশ। আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি তা বলবেন।

অতি উত্তম। ধন্যবাদ। আপনি এখন বিশ্রাম নিন। পুতুলটি বানানো হয়ে গেলেই আপনাকে ডেকে নেব।

* * *

রোচক গত কয়েক দিন ধরেই পৌরব রাজ্যের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। বারংবার পেছন ফিরে দেখছে কেউ পিছু নিচ্ছে কি না। কেউ নেই। কিন্তু ও জানে যে, ও একা নয়। ওই নিপুণক লোকটা আর সেনাধ্যক্ষ সিংহরণ বাজপাখির মতোই কোনো-না-কোনো কোণ থেকে তার উপর নজর রেখে চলেছে। কারণ এই কয়েক দিনে রোচক বহুবার আচমকা কোনো ভরা বাজারে বা নির্জন রাত্রে হঠাৎই দেখতে পেয়েছে সেই দু-জনকে। তাদের দৃষ্টি ওকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, 'কোনো চালাকি নয়। নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলেই গর্দান যাবে।'

তাই আপাতত পালানোর আশা ছেড়ে নির্দেশমতো পত্র পাটলিপুত্রে পৌঁছে দেওয়াই একমাত্র উপায় ধরে নিয়ে রোচক চলছে। নগরের প্রবেশপথে কড়া প্রহরা দেখে ঘোড়া থামাতে হল রোচককে। অনেক লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একে একে সকলের পরিচয়পত্র দেখে তবেই প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে প্রহরীরা। কিছুটা বিস্মিত হল রোচক। হঠাৎ এতটা কড়া প্রহরার কারণ কী? মনে মনে ভয় পেল ও। কোনো বিপদ হবে না তো?

কথাটা ভাবার পরক্ষণেই দুটি ঘোড়া সারি ভেঙে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। তাকিয়েই নিজের দু-পাশে নিপুণক আর সিংহরণকে দেখতে পেল সে। নিপুণক আশ্বাসে, ভঙ্গিতে ইশারা করে বোঝাল যে কোনো ভয় নেই। রোচককে ওরা আগেই একটা ভুয়ো পরিচয়পত্র দিয়েছে বটে। কিন্তু তবুও কেন যেন বিপদের গন্ধ পেল রোচক।

শুনতে পাচ্ছেন না? এগিয়ে আসুন।

চেঁচিয়ে প্রহরী তাড়া দিল। রোচক সত্যিই শুনতে পায়নি। ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল। অন্য এক প্রহরী হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিছু। রোচক শুনতে না পেলেও ঠোঁট পড়তে পারে। বুঝল পরিচয়পত্র দেখতে চাইছে। সভয়ে নিজের পরিচয় ভূর্জপত্রটি এগিয়ে দিল সে। সেটি হাতে নিয়ে দেখতেই প্রহরীর ভ্রূ কুঁচকে গেল। পাশেরজনকে ডেকে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু বলল যা রোচক বুঝতে পারল না। কিন্তু কিছু একটা যে গণ্ডগোল হয়েছে তা অনুমান করতে বিলম্ব হল না।

একমুহূর্ত আর দেরি না করে উলটোদিকে ঘোড়া ছোটাতে গেল। কিন্তু, সেসুযোগ পেল না। এক প্রহরীর ছুড়ে দেওয়া বল্লম ওর কাঁধে আঘাত করল। মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণা গোঙানির মতো শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। চারজন প্রহরী এসে জাপটে ধরল ওকে। একজন প্রহরী এসে ওর অঙ্গাবস্ত্রের ভাঁজে খুঁজতে শুরু করল। লুকোনো ভাঁজ থেকে দুটি পত্র পেল। একটি পত্র খুলে দেখতেই উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করল,

- এই তো! এটিতে সিন্ধুদেশের মুদ্রা! খবর সঠিক ছিল! এই সেই ভিনদেশি গুপ্তচর!

টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে রোচক অসহায় দৃষ্টিতে খুঁজল সেই দুজনকে যাদের নির্দেশে সে আজ এখানে এসেছে। একমুহূর্তের জন্যে ভিড়ের মধ্যে সে নিপুণক আর সিংহরণকে দেখতেও পেল। ও শেষবারের জন্যে আশা করল যে, হয়তো তারা দু-জন এগিয়ে আসবে তাকে উদ্ধার করতে। তার জন্যে না হোক, অন্তত এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রের খাতিরে তারা এগিয়ে আসবে ওকে সাহায্য করতে। কিন্তু পরমুহূর্তে তারা দু-জন ভিড়ের সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হল।

তখনই সত্যিটা উপলব্ধি করতে পারল রোচক। সব মিথ্যে ছিল! ওকে মুক্তির আশ্বাস, ওর অপরাধ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি, এই পরিচয়পত্র— সব কিছুই মিথ্যে। বিশাল এই রাজকীয় চতুরঙ্গের খেলায় সে একটি সামান্য গুটিমাত্র, যাকে বিপক্ষের হাতে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই খেলায় নামানো হয়েছে।

১৯.

প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে মহলের তিনতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছেন চাণক্য। সেখানে মাঝামাঝি জায়গায় একটি পুতুল রাখা হয়েছে। তাড়াহুড়োয় বানানোর ফলে সেটি রুক্ষ ও কুরূপ হয়েছে।

প্রাঙ্গণে চাণক্য ছাড়াও শ্রীশৈল, চিত্রবর্মা এবং ধনুক হাতে বিন্দু দাঁড়িয়ে আছে। সেইসঙ্গে কয়েক জন প্রহরী। জীবসিদ্ধিকে চাণক্য তিনতলার বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন। তার কাজ গোটা ব্যাপারটা উ থেকে নজর করা। শ্রীশৈল প্রশ্ন করলেন,

– ঠিক আছে তো, আচার্য?

চাণক্য বারান্দায় দাঁড়ানো মূর্তিটির দিক থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দিলেন, হুমম।

সূর্যের তেজ আজকে কম, তার উপর উত্তর থেকে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। তাই অঙ্গাবস্ত্রের উপর সকলেই পশমের আলোয়ান জড়িয়ে নিয়েছে। হঠাৎ একটু জোর হাওয়া দেওয়ায় নিজের আলোয়ানটিকে শরীরের উপর আরও একটু ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে চাণক্য বিন্দুর দিকে ফিরলেন। বিশাল প্রাঙ্গণের অনেকটাই দূরে সে দাঁড়িয়ে, তাই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

- বিন্দু, আপনি তৈরি?

হ্যাঁ, আচার্য।

- বেশ। মনে রাখবেন, ওই পুতুলের কণ্ঠের এইখানে নিশানা করবেন।

আঙুল দিয়ে নিজের গলার বামে ইঙ্গিত করলেন চাণক্য। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিন্দু ধনুকে বাণ চড়াল। তিরসহ ধনুকের গুণ যতটা সম্ভব পেছনে টেনে ধরল। এক চোখ বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত নিশানা স্থির করল। এবং, বাণ নিক্ষেপ করল। বাতাস কেটে বাণ উড়ে গেল এবং পুতুলে আঘাত করতেই পুতুল উলটে পড়ল বারান্দায়। নিজের মানসপটে চাণক্য যেন সেদিনের ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি হতে দেখলেন। কিন্তু, কোথায় যেন কিছু ভুল হচ্ছে। চাণক্যর মন বলছে কিছু একটা ভুল হচ্ছে।

চাণক্য চেঁচিয়ে জানতে চাইলেন,

- জীবসিদ্ধি, তির বিদ্ধ হয়েছে?

— হ্যাঁ, আচার্য।

বেশ, এবার তবে দ্বিতীয় পরীক্ষা। জীবসিদ্ধি, মূর্তিটি পুনরায় আগের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দাও। তির বিদ্ধই থাক।

এই বলে চাণক্য প্রাঙ্গণের উঁচু, চওড়া প্রাচীরে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁরা সকলেই অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে প্রাচীরের উপর এসে দাঁড়ালেন। বেশ কয়েক জন সৈনিক সেখানে প্রহরা দিচ্ছে যারা চিত্রবর্মাকে দেখে অভিবাদন জানাল।

একইভাবে প্রাচীরের উপর থেকে আরও একবার বিন্দুকে দিয়ে মহলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা পুতুলটির উপর বাণ নিক্ষেপ করালেন চাণক্য। পুতুলটি আবার আগের মতোই পড়ে গেল।

প্রাচীর থেকে নেমে এসে চাণক্য মহলের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাকি তিনজনকেও সঙ্গে আসতে ইশারা করলেন। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরের বারান্দায় উপস্থিত হলেন



চাণক্য। দেখলেন মূর্তিটা চিত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। গলার বামদিকে দুটি তির বিঁধে আছে।

— জীবসিদ্ধি, পুতুল নাড়াওনি তো?

- নাহ্ আচার্য।

- হুমম।

পুতুলটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন চাণক্য। বিদ্ধ হওয়া তির দুটি দেখলেন ভালো করে। ততক্ষণে পেছনে অন্য তিনজনও এসে পড়েছে। শ্রীশৈল বলে উঠলেন,

— ঠিক এভাবেই! হ্যাঁ, একইভাবে মহারাজ পড়ে ছিলেন। উফ, কী ভয়ঙ্কর!

চিত্রবর্মা বললেন,

— নিশানা একদম যথাযথ লেগেছে।

এই কথায় একটু অস্বস্তিসূচক নিশ্বাস ফেলল বিন্দু। জীবসিদ্ধি মনে মনে ভাবল যে, বেচারা এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না যে, এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করল নাকি আরও বেশি জড়িয়ে গেল। এখন বোধ হয় নিজের সঠিক নিশানা লাগানোর কলার জন্যে তার আফশোসই হচ্ছে। এরকম নিশানা লাগিয়ে ও বোধ হয় নিজেকে সন্দেহের তালিকায় আরও উপরে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু জীবসিদ্ধি লক্ষ করল চাণক্যর কপালে ভ্রূকুটি। কিছু একটা চিন্তা করছেন তিনি। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না। উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে প্রণাম জানিয়ে বললেন,

সময় ব্যয় করে আমার এই পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্যে সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আর আমি আপনাদের সময় নষ্ট করব না। শুধু আমি বিন্দুকে সামান্য কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আর্য, আপনারা উপস্থিত না থাকলেও হবে।

আসলে বিন্দুর অস্বস্তি আরও বাড়ল। চিত্রবর্মা আর শ্রীশৈল বুঝতে পারল যে, চাণক্য তাদের সামনে প্রশ্ন করতে চাইছেন না। তারা বেরিয়ে গেল। চাণক্যর সঙ্গে শুধু জীবসিদ্ধি আর বিন্দু রইল।

এখানে বড্ড ঠান্ডা বাতাস বইছে। ভেতরে আসুন।

ঢুকে চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

ভেতরে আপনার ধনুর্বিদ্যা অসাধারণ! আপনি বাস্তবিকই গুণী মানুষ। আচ্ছা একটা কথার উত্তর দিন, তিরন্দাজি কি বাতাসের গতি ও অভিমুখের উপর নির্ভর নয়?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আচার্য। -

— হুম। এই একটু আগে, মানে, যখন তির নিক্ষেপ করলেন তখন কি বাতাস আপনার পক্ষে ছিল, না, বিপক্ষে?

পক্ষে। দু-বারই বাতাসের অভিমুখে তির নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বাতাস মহলের দিকেই বইছে এখন।

আর যদি তা না হত?

- তাহলে নিশানা লাগানো আরও কঠিন হত।

হুমম। আপনার বাণের ফলার অর্ধেক অংশ পুতুলের কণ্ঠে বিদ্ধ হয়েছে। আপনি কি নিজের সম্পূর্ণ বলে তির নিক্ষেপ করেছিলেন?

— আজ্ঞে, হ্যাঁ। বাতাসের অভিমুখে বাণ তার সম্পূর্ণ গতিতে গেলেও দূরত্বের কারণে এর চেয়ে বেশি জোরে আঘাত করবে না।

হুমম। কিন্তু, যদি বাণটি অন্য ধরনের হয়?

মানে?

জীবসিদ্ধিকে ইশারা করতেই জীবসিদ্ধি কাপড়ের ঝোলা থেকে একটি বাণ বের করে আনল। সেই বিশেষ বাণ যা দিয়ে মহারাজকে হত্যা করা হয়েছে। সেটি হাতে নিয়ে ভালোভাবে দেখে অবাক হল বিন্দু। বলল,

এরকম অদ্ভুত বাণ আমি আগে দেখিনি। তবে অনেক তিরন্দাজ তার নিজের সুবিধামতো বাণ বানিয়ে নেয় বটে।

এই বাণটির ক্ষেত্রে কী মনে হয়?

এটি নিক্ষেপ করা কঠিন। আমায় এই বাণ দিলে আমি কোনোভাবেই নিশানা লাগাতে পারতাম না। এই বাণ হালকা হওয়ায় গতি হয়তো বেশি, কিন্তু এই দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে দীর্ঘ অনুশীলন লাগে।

যদি ধরে নিই যে, কোনো এক ধনুর্ধর এই বাণ ব্যবহারে কুশল। সে যদি আপনার মতো লক্ষ্যভেদ করত আজকে, তবে কি এই বাণ আরও অনেক বেশি প্রবেশ করত পুতুলের কণ্ঠে?

কিছুক্ষণ ভেবে, হাতে বাণটি নিয়ে ওজন আন্দাজ করে বিন্দু উত্তর দিল, সম্ভবত না। লক্ষ্যের থেকে দূরত্ব এতটা বেশি হওয়ায় সেটা সম্ভব না।

পুতুলের জায়গায় মানব থাকলে কি সেটা আরও কম বিদ্ধ হত না?

অবশ্যই, আচার্য। ঠিকই বলেছেন। যেকোনো প্রাণীর গলার নরম হাড়ও ওই তুলো আর খড় দিয়ে বানানো মূর্তির চেয়ে বেশি শক্ত। তাই সেইক্ষেত্রে তিরের ফলা আরও কম পরিমাণ বিদ্ধ হত শরীরে।

হুমম।

চাণক্যর কপালের ভ্রূকুটি আরও গভীর হয়েছে। বললেন,

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আসতে পারেন।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানিয়েও, বিন্দু বেরোতে কিছুটা ইতস্তত করছে দেখে জীবসিদ্ধি জিজ্ঞেস করল,

- কিছু বলবেন? -

– হ্যাঁ... মানে একটা কথা হঠাৎ মাথায় এল। -

- বলুন?

আচার্য, আমি আমার এক বন্ধুর কাছে শুনছিলাম যে, পশ্চিমে নাকি তির নিক্ষেপ করার যন্ত্র বানানোর চেষ্টা চলছে। ধনুক নয়, যন্ত্রের সাহায্যে অনেক বেশি গতিতে তির নিক্ষেপ করা যাবে বলা হচ্ছে। সেইরকম কোনো যন্ত্র ব্যবহারে কিন্তু এরকম দূরত্বেও গভীর ক্ষত করা সম্ভব।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে জীবসিদ্ধি বলে উঠল,

যন্ত্র? শর নিক্ষেপ করার যন্ত্র?

- আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাশয়।

চাণক্যকে কিন্তু খুব একটা উত্তেজিত মনে হল না। তিনি বিন্দুর উদ্দেশে বললেন,

- অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি অনেক সাহায্য করলেন।

বিন্দু বেরিয়ে যেতেই জীবসিদ্ধি উত্তেজিত ভঙ্গিতে আচার্য! শুনলেন আপনি? শর নিক্ষেপ করার যন্ত্র! নিশ্চিতভাবেই কোনো যন্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে মহারাজকে। সেই কারণেই এই বাণ ফলা ছাড়িয়ে বাঁধা সুতো অবধি প্রবেশ করেছিল রাজার কণ্ঠে। যন্ত্রের সাহায্যেই এই অসাধারণ জোরে বিদ্ধ হয়েছে তির। এটাই তো আমাদের সমস্যার সমাধান!

চাণক্যর দিকে ফিরে বলল,

চাণক্য কিছুক্ষণ ভাবলেশহীন মুখে জীবসিদ্ধির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,

- তোমার তাই মনে হয়? কিন্তু তাহলেও তো প্রশ্নটা একই থেকে যাচ্ছে। হত্যাকারী সেই অদ্ভুত যন্ত্র কীভাবে সকলের অজ্ঞাতে ব্যবহার করল? সকলের সামনে একটি অদ্ভুত যন্ত্র বের করে তির নিক্ষেপ করল আর কেউ সেটা দেখতে কীভাবে পেল না?

জীবসিদ্ধি কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিল,

হতে পারে সেই যন্ত্র কোনো দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তুর মতোই দেখতে। তাই সহজেই সেটি গোপনে সকলের আড়ালে ব্যবহার করা যায়। নেহাতই নিরীহ দেখতে কোনো বস্তু যা আসলে কিনা একটি অস্ত্র। এটা কি সম্ভব নয়, আচার্য?

চাণক্যর কপালে ভ্রূকুটি। আবারও শুধু বললেন, হুমম।

২০.

রোচককে বন্দি করে মলয়কেতুর সম্মুখে হাজির করা হয়েছে। রাজা মলয়কেতু আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল রোচকের উপর। লোকটার মুখের সঙ্গে মূষিকের আশ্চর্য মিল আছে। ভীত, সন্ত্রস্ত রোচক হাত, মুখ নেড়ে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু কেউই কিছু বুঝতে পারছে না।

মলয়কেতু বিরক্ত ভঙ্গিতে বন্দি রোচকের দু-পাশে দাঁড়ানো সশস্ত্র সৈনিকের উদ্দেশে প্রশ্ন করল,

— এ এরকম বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে কেন? এ কি বোবা নাকি?

— হ্যাঁ, মহারাজ।

— এসব নাটক করছে। কারাগৃহে নিয়ে গিয়ে কয়েক ঘা মুষলাঘাত করলেই - কথা বেরোবে।

সৈনিক আগেই পরীক্ষা করে দেখেছে যে, লোকটি সত্যিই বোবা সেটা রাজাকে বলল না। পূর্বের অভিজ্ঞতায় সে জানে রাজার সম্মুখে অধিক কথা বলা মানেই নিজের বিপদ ডেকে আনা।

মলয়কেতু নির্দেশ দিল,

নিয়ে যাও একে কারাগৃহে। কথা বলানোর চেষ্টা করো।

- যথা আজ্ঞা, মহারাজ।

টেনে-হিঁচড়ে দুজন প্রহরী রোচককে রাজসভার বাইরে নিয়ে চলল। তার কাছ থেকে পাওয়া দুটি পত্র ইতিমধ্যে মলয়কেতুর হাতেই রয়েছে। সেটি খুলে আরও একবার পড়ে দেখল সে।

> মহামতি দানব,
>
> সাগরের প্রণাম নেবেন। আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত। এটাই আমাদের সুযোগ।
>
> পর্বত আরোহণ করে পনেরো দিন পরের অমাবস্যার রাত্রে আমি নগর পৌঁছাতে পারব। আমার সম্পূর্ণ সেনা আমার সঙ্গে থাকবে।
>
> রাহু ও কেতু দুজনকেই হত্যা করা শ্রেয়। কেতু এখন কুলূতের রাজমহলে আছে। তাকে আমি সেখানেই গুপ্তহন্তা ব্যবহারে হত্যা করব।
>
> রাহুর পরিণামও একই হবে।

গৃধ্র আপনার হাতে এবং আসলে আমাদের সমর্থনে আছে শুনে খুশি হয়েছি। সে দ্বার খুলে দিলে আমার কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

আপনি তাঁকে জানিয়ে রাখবেন এই অমাবস্যা তিথির কথা। একবার সেনা প্রবেশ করলেই সিংহাসন আমাদের। আপনি শুধু পাশে থাকবেন মহামতি।

ইতি,

সাগর।

শেষে রয়েছে রাজকুমার সিন্ধুসেনার রাজমুদ্রার ছাপ।

চিৎকার করে নিজের মন্ত্রীর উদ্দেশে মলয়কেতু বলল,

- – দেখুন, মহামন্ত্রী দেখুন! এরা আমাকে এতই মূর্খ মনে করে যে, কিছু কিছু শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করেই সাংকেতিক পত্র লেখা যাবে আর কেউ কিছুই বুঝবে না। রাক্ষস মানে দানব, সিন্ধু মানে সাগর। কুলূতের রাজমহলে এখন কে অতিথি হয়ে আছে তা সকলের জানা। অর্থাৎ, কেতু হল চাণক্য। পর্বত মানে নিশ্চয়ই আমার রাজ্যের কথা বলা হয়েছে! আমার পর্বত্যক রাজ্য!

রাগে নিজের হাতের মুঠোয় দুটি পত্র দুমড়ে-মুচড়ে দিতে দিতে মলয়কেতু বলল,

- - সকলে! ওরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে! ওই সিন্ধুসেনা সেইদিনই আমার সঙ্গে— পুরু বংশের উত্তরাধিকার পর্বত্যক মলয়কেতু ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে! এদের আমি দেখিয়ে দেব যে পুরু বংশের রক্তে বইতে থাকা বীর্য এখনও মিলিয়ে যায়নি। যার শৌর্য-বীর্যের গুণগান স্বয়ং বিশ্বসম্রাট অলকশেন্দ্র করেছেন, তাঁরই রক্ত বইছে আমার ধমনীতে!

মন্ত্রীদের প্রতি চিৎকার করে আদেশ দিল মলয়কেতু,

– আচার্য শকুনি কোথায়?

একজন মন্ত্রী সভয়ে বলল,

তিনি তো এখন এখানে নেই। গতকালই কোথাও চলে গিয়েছেন আবার।

- সেও যে কোথায় যায় বার বার, কে জানে! আপনারা সেনাপতিদের তৈরি হতে বলুন, আমরা যুদ্ধে যাব। ধূলিসাৎ করব এই কুচক্রীদের।

মহামাত্য বললেন,

মহারাজ, আরও একবার বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ করছি।

— কেন? কীসের পুনর্বিবেচনা?

ভেবে দেখুন। আমাদের কাছে হঠাৎই বেনামি পত্র এল যা থেকে সঠিক সময়ে আমরা জানতে পারলাম যে রাক্ষসের গুপ্তচর আমাদের রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করেছে। কে লিখল সেই পত্র? সে এত কিছু জানালই-বা কীভাবে? তা ছাড়া এই পত্রে ব্যবহার করা এই গুপ্ত ছদ্ম শব্দের মানে সম্পূর্ণ ভিন্নও হতে পারে।

কিছুক্ষণ মহামাত্যর দিকে তাকিয়ে রইল মলয়কেতু। তার ভীরু মন দোলাচলে পড়ল এইবার। সত্যিই তো, এই বিষয়গুলো ভাবা উচিত ছিল তার। এখন ভরাসভায় কি সকল অমাত্য তাকে মূর্খ ভাবল? হঠাৎ জেগে ওঠা বীরত্ব নেমে আসছে তার। নিজের স্বাভাবিক ভীরু প্রকৃতি থেকে বেশি সময় সে ভিন্ন থাকতে পারে না। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মলয়কেতু প্রশ্ন করল,

- তাহলে আপনি কী করতে বলছেন, মহামাত্য?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন অমাত্য সুদীপ্তক। স্বয়ং মহারাজ পুরুর সময় থেকে তিনি পর্বত্যক রাজ্যের মন্ত্রী। বীরপুরুর পরবর্তীতে এই মূর্খ রাজার অধীনে মন্ত্রী থাকাটা তাঁর পক্ষে দিন দিন বিরক্তিকর হয়ে উঠছে। শিশুকে বোঝানোর ভঙ্গিতে তিনি বললেন,

- মহারাজ, আমি আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছি। হঠাৎ ক্রোধের মধ্যে নেওয়া সিদ্ধান্ত মূর্খতার পরিচয়। তা ব্যক্তি ও রাজ্যের জন্যে ধ্বংস ডেকে আনে। আমি বলি যে আপনি অপেক্ষা করুন, দেখুন কী হয়। অমাবস্যার রাত্রে আমাদের নগরের সীমানায় সিন্ধের সেনা আসে কি না সেটা আগে দেখুন। তারপর আদৌ সিদ্ধান্ত নেবেন।

মলয়কেতু বুঝতে পারছে যে, মহামাত্য সঠিক কথাই বলছে। অন্যান্য সভাসদরাও তারই সমর্থনে সম্মতি জানাচ্ছে ঘাড় নেড়ে। কিন্তু, মহামাত্য সুদীপ্তক কি প্রথমেই তাকে মূর্খ বলল? তাকে অপমান করল নাকি? সেটাও ঠিক নিশ্চিত বুঝতে পারল না মলয়কেতু।

বেশ, তবে তাই হোক। কিন্তু, আমাদের সেনাকে সতর্ক থাকতে বলুন, সেনাপতি। যুদ্ধকালীন তৎপরতা যেন থাকে। আর আমার সুরক্ষা ব্যবস্থার দিকে বাড়তি নজর দিন। প্রয়োজনে দ্বিগুণ রক্ষী নিযুক্ত করুন।

বেশ।

– এইবার আপনারা তবে আসুন। আমার বিশ্রামের সময় হয়েছে। -

সকলে সভা ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই মলয়কেতু ডাক দিল,

পদ্মা আছ?

সঙ্গোসঙ্গোই ভেতরের ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল পদ্মা। হাতে একটি সোনার থালায় সুগন্ধি তৈল নিয়ে প্রবেশ করল সে। এতক্ষণ সে পর্দার আড়ালে রাজার আদেশের

অপেক্ষাতেই ছিল। একদিকে রাখা পাত্র থেকে সোমরস একটি ছোটো পাত্রে ঢেলে এগিয়ে দিল মহারাজের দিকে। মহারাজ সেটিতে চুমুক দিয়ে পদ্মার সঙ্গে ভেতরের কক্ষে চলে গেল।

ভেতরের কক্ষে একটি নীচু আসনে মহারাজ বসতে পদ্মা তার মাথায় ও কাঁধে তেল দিয়ে মালিশ শুরু করল। একটা আরামের নিশ্বাস বেরিয়ে এল মলয়কেতুর মুখ থেকে। সে চোখ বুজে ভাবতে শুরু করল কীভাবে সকলকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায় যাতে পুরুর মতোই এই সিন্ধুসেনা ও অন্য রাজারা তাকেও সম্মান দেবে।

রিনরিনে কণ্ঠে পদ্মা জানতে চাইল,

— মহারাজের কি আরাম লাগছে?

- হুমম?

— জানতে চাইছি, তেল মালিশে কি আমার মহারাজের আরাম লাগছে?

'আমার মহারাজ' কথাটা বড়ো মধুর শোনাল মলয়কেতুর কানে। মেয়েটার ব্যক্তিত্বে কিছু একটা আছে যা সহজে ধরা দেয় না। তার মহলের অন্য মেয়েদের মতো নয় যাকে চাইলেই পাওয়া যায়। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই মলয়কেতু উত্তর দিল,

- হ্যাঁ। খুব আরাম।

মহারাজ কি কিছু নিয়ে চিন্তিত?

হুমম। চিন্তিত তো বটেই। রাজনীতির ব্যাপার। এসব তুমি বুঝবে না। এখানে সবাই তোমার গৃহের কালসাপ, বুঝলে হে? যারা রোজ তোমারই গৃহে তোমারই ভাঁড়ার থেকে দুধ, কলা খেয়ে যায়।

সত্যিই এত কিছু আমি বুঝি না, মহারাজ। তবে এটুকু জানি যে, এই উত্তর-পশ্চিমের সমস্ত রাজার চেয়ে শক্তিশালী রাজা হলেন আপনি। আপনার ক্ষমতার ভয় মগধও পায়। আমার এক সখী ওদেশে থাকে। সে-ই বলেছিল। সে তো হিংসায় পড়ে গিয়েছিল এই শুনে যে আমি আপনার সেবক হিসাবে স্থান পেয়েছি। আমি সত্যিই বেশি বুঝি না, মহারাজ। আমি এক সাধারণ দাসী, আপনাকে সেবা করতে পারলেই খুশি। তবে, সেটাই-বা পারি কই?

- কেন? কী হয়েছে, পদ্মা?

একটা আফশোসের দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল,

আপনাকে আমার সঙ্গে দেখলেই তো ওই ব্রাহ্মণ আমাকে তিরস্কার করে।

কে? শকুনি?

হ্যাঁ, ও-ই। শকুনিই বটে! পুরো একটা বুড়ো শকুন যেন। কিছু মনে করবেন না মহারাজ, ওর দৃষ্টি আমার ভালো লাগে না। ও কেমনভাবে যেন তাকায় আমার দিকে।

চোখ খুলে পদ্মার দিকে তাকাল মলয়কেতু,

সেকী? একথা আগে বলনি তো?

সাহস পাইনি, মহারাজ। ও ব্রাহ্মণকে দেখলেই গা শিউরে ওঠে, ভয় করে। কেমন যেন ধূর্ততা। যেন সে ব্রাহ্মণ তো নয়, সাক্ষাৎ খুনি।

মলয়কেতু আবার চোখ বুজে সোজা হয়ে বসল। মনে মনে ভাবল গা শিউরে তো তারও ওঠে, ভয় তারও করে ওই শকুনিকে। কিন্তু সেকথা স্বীকার করা যাবে না। সেদিনের নামহীন সতর্কবার্তার কথা আবার মনে পড়ল তার।

'আপনি যাদের মিত্র ভাবছেন তারাই বিশ্বাসঘাতক।

আজকে দূতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া চিঠির কথাও মনে এল তার। আর তাতেই হঠাৎ আরও একটা প্রতিশব্দ মাথায় এল মলয়কেতুর। 'গৃধ্র — শকুন'।

২১.

রাতের তৃতীয় প্রহরের শেষের দিকে কোনো এক সময়। নাগরের রাজমহল শান্ত। খোলা বাতায়ন সমস্ত ঢেকে দেওয়া হয়েছে বাইরের ঠান্ডা হাওয়ার প্রবেশ রুখতে। যে যার নিজেদের কক্ষে ঘুমিয়ে আছে।

জীবসিদ্ধির ঘুম বরাবরই পাতলা। তাই হালকা শব্দেও ঘুম ভেঙে গেল। দরজার বাইরে কিছু একটা পতনের শব্দ হল যেন। জেগে গেলেও চোখ বন্ধ রেখেই শুয়ে থাকল জীবসিদ্ধি। শোনার চেষ্টা করল। প্রায় পরমুহূর্তেই আবারও একই শব্দ হতেই বিছানায় সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠে বসল সে। শয্যার পাশে মাঝারি আকারের তরবারিটা নিয়ে ঘুমোনো তার বহু বছরের অভ্যাস। তার হাত অবচেতনভাবেই সেটি চেপে ধরেছে।

উঠে এসে দরজায় কান লাগাল জীবসিদ্ধি। কেউ একজন বাইরে আছে। মেঝেতে শুয়ে পড়ে দরজার নীচ দিয়ে বাইরে দেখল সে। ঠান্ডা, পাথুরে মেঝে তার খোলা শরীরের চামড়ায় স্পর্শ করতে প্রায় শীতল তরবারি চালানোর অনুভূতি হল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বাইরে কী ঘটছে বোঝার চেষ্টা করল। বাইরে দু-জন থাকার কথা কিন্তু এই মুহূর্তে দেয়ালে লাগানো প্রদীপের মৃদু আলোয় সৃষ্ট ছায়ার গতিবিধি থেকে বোঝা যাচ্ছে মাত্র একজনই আছে। কিছু একটা সমস্যা আছে।

লোকটি তার দরজার বাইরে নয়, মুখোমুখি চাণক্যর কক্ষের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু একটা করছে লোকটা যা জীবসিদ্ধি দরজার নীচ থেকে দেখে বুঝতে পারছে না।

জীবসিদ্ধি দ্রুত নিজের অঙ্গাবস্ত্র মেঝেতে ফেলে তার উপর একটি কাঠের মেজের চারটে পায়া বসাল, যাতে টানলে কোনো শব্দ না হয়। মেজটা টেনে দরজার কাছে এনে তাতে চড়ল। এই মহলের প্রতিটি কক্ষের দরজার ঠিক উপরে, বারান্দার দিকে খোলা একটা করে ছোট্ট বায়ুরন্ধ্র" আছে যাতে ঠান্ডায় সমস্ত বাতায়ন বন্ধ থাকলেও বায়ু চলাচল অবরুদ্ধ না হয়। জীবসিদ্ধি সেই ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই দেখতে পেল তাদের দুই দ্বাররক্ষী মগধের সৈনিক মাটিতে পড়ে আছে। একটি ছায়ামূর্তি চাণক্যর কক্ষের দরজার সামনে একটি দড়ি দিয়ে বানানো সিঁড়ি লাগিয়ে তাতে চড়ছে। লোকটির গায়ে কুলূতের সামরিক পোশাক। সেও জীবসিদ্ধির মতোই দরজার উপরের বায়ুরন্ধ্রের ফাঁক দিয়ে ভেতরের ঘরে উঁকি দিচ্ছে। লোকটা নিজের কাপড়ের ভাঁজ থেকে একটি লম্বা, অতি সরু কাঠির মতো কিছু বের করে সেটা মুখের কাছে ধরল।

মুহূর্তে জীবসিদ্ধি বুঝতে পারল ওটা কী। ওটা একটা বাঁকনল"! মেজ থেকে লাফিয়ে নেমে সেটি একদিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দরজা খুলতে গিয়েই জীবসিদ্ধি বুঝল তার দ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে আততায়ী। কণ্ঠের সমস্ত জোর লাগিয়ে জীবসিদ্ধি চিৎকার করে উঠল,

- — গুরুদেব! সাবধান!

যদি তার গলা চাণক্যর কানে একমুহূর্তের বিলম্বেও পৌঁছে থাকে, তবে এতক্ষণে চাণক্যর মৃত্যু নিশ্চিত। চিৎকার করতে করতেই মেজ তুলে দরজায় সশব্দে ছুঁড়ে দিল জীবসিদ্ধি। তার উদ্দেশ্য যতটা হয় শব্দ করা যাতে মগধের সৈনিকরা তা শুনতে পেয়ে চলে আসে। কয়েক ক্ষণ বাদেই জীবসিদ্ধির দরজা খোলার শব্দ হল। উদগ্রীব হয়ে জীবসিদ্ধি বাইরে বেরোতেই দেখতে পেল তার দরজার খিল বাইরে খুলে দিয়েছেন স্বয়ং চাণক্য।

চাণক্যকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জীবসিদ্ধি ছুটে গিয়ে তার দু-কাঁধ চেপে ধরল। মুহূর্তের আশঙ্কায় গুরু-শিষ্য শিষ্টাচারের কথা তার মাথায় থাকল না।

আপনি ঠিক আছেন, আচার্য? শলাকা আপনাকে আঘাত করেনি তো? ততক্ষণে চিৎকার শুনে মগধ ও কুলূতের সৈনিকরা ছুটে এসেছে সেখানে। চাণক্য নিজের গায়ের অতিরিক্ত অঙ্গাবস্ত্র জীবসিদ্ধির খোলা গায়ে চড়িয়ে দিয়ে, তার দু-হাত নিজের হাতে নিয়ে আশ্বস্ত করলেন, -

— শান্ত হও হে, জীবসিদ্ধি। এই হিমশীতল রাত্রে এভাবে বেরিয়ে এলে নিশ্চিত তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। আমি ঠিক আছি। সঠিক সময়ে সাবধান করেছ তুমি। ঠিক সময়মতো সজাগ হয়ে শয্যার একপাশে গড়িয়ে সরে যাই। তাই এযাত্রা প্রাণ রক্ষা পেল তোমার জন্যে।



স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল জীবসিদ্ধি। সৈনিকদের উদ্দেশে প্রশ্ন করল,

- আততায়ীটিকে ধরা গিয়েছে?

প্রত্যেকেরই মুখ দেখে বোঝা গেল তারা হতভম্ব। ওরা নিজেরাই বুঝতে পারছে না কী ঘটেছে।

চাণক্য জীবসিদ্ধিকে প্রশ্ন করল,

তুমি দেখেছ লোকটাকে?

— অন্ধকারে মুখ তো স্পষ্ট নয়। তবে পরনে কুলূতের সৈনিকের পোশাক ছিল।

হুম। সেই কারণেই এতদূর অবধি ঢুকে আসতে পেরেছে। সকলেই ভেবেছে সেও একজন সৈনিক। সে পলায়নও করতে পারবে সহজেই। মহলের অন্যান্য সৈনিকের ভিড়ে মিশে যাবে সে।

মেঝেতে পড়ে থাকা মগধের দুই সৈনিকের কাছে গিয়ে চাণক্য তাদের নাকের কাছে হাত রেখে ও কবজি ধরে নাড়ি পরীক্ষা করলেন। তারপর অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে বললেন,

– দু-জনই মৃত। ওই দেখো দু-জনেরই কাছে দুটি কাঁটা ফুটে আছে। ওতেই তীব্র বিষ ছিল। তোমার ক্ষণিকের দেরি হলে আজকে আমারও একই পরিণতি হত হে, জীবসিদ্ধি।

জীবসিদ্ধি মগধের সৈনিকদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল,

কিন্তু আমি তো নির্দেশ দিয়েছিলাম মহলের এই আমাদের তলে ওঠার সিঁড়ির মুখে যেন আমাদের মগধের সৈনিকরা প্রতিটি অচেনা ব্যক্তির পরিচয়পত্র পুনরায় পরীক্ষা করে দেখে। তোমরা দেখনি? একটু আগেই কুলূতের যে সৈনিকটি উঠে এসেছে তার পরিচয়পত্র পরীক্ষা করেছিলে?

দু-জন মগধের সৈনিক এগিয়ে এসে জানাল যে, তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকই সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু আততায়ীর কাছে সঠিক পরিচয়পত্রই ছিল। তাই তাদের মনে সন্দেহ জাগেনি। বিভিন্ন প্রয়োজনে সর্বদাই কুলূতের সৈনিক বা কর্মচারীরা এই তলে দিনে বা রাতে আসে। তাদের পরিচয়পত্র দেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও তাই সন্দেহ হয়নি।

জীবসিদ্ধি বলল,

– তাহলে তোমরা আততায়ীকে দেখেছ। তাকে খুঁজে বের করো।

চাণক্য হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

না হে, জীবসিদ্ধি। তা করে লাভ নেই। এটা খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার মতোই অসম্ভব হবে। তা ছাড়া সে এতক্ষণে সম্ভবত মহল ত্যাগ করেছে।

তখনই একদিক থেকে যুবরাজ চিত্রবর্মা প্রবেশ করলেন,

- আরে, এ কী? কী হয়েছে এখানে?

উত্তেজিত জীবসিদ্ধি তাঁকে দেখেই ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল,

আপনি জানেন না, তাই না? কুলূতের পরিচয়মুদ্রা ও সামরিক পোশাক পরে হত্যাকারী রাজমহলের অন্দর অবধি প্রবেশ করছে। আর আপনি কিছুই জানেন না যুবরাজ, তাই না?

চাণক্য জীবসিদ্ধির হাত চেপে তাকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত দিলেন। জীবসিদ্ধি আরও দু-কথা বলত কিন্তু আচার্যর ইঙ্গিতে চুপ রইল। চাণক্য বললেন,

যুবরাজ চিত্রবর্মা, আমাদের দু-জন সৈনিককে অজানা আততায়ী হত্যা করেছে। আমাকেও হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে দেখতেই পাচ্ছেন, তা বিফল হয়েছে জীবসিদ্ধির সতর্কতায়।

চিত্রবর্মাকে বাস্তবিক বিস্মিত মনে হল জীবসিদ্ধির। কয়েক বার মৃত দু-জন সৈনিকের দিকে আর চাণক্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

– কিন্তু… কিন্তু কীভাবে?

চাণক্য উত্তর দিলেন,

— সৈনিকদের গলায় বিঁধে থাকা কাটা দুটি দেখুন। আমার কক্ষে আসুন এবার। চাণক্যর কক্ষে কয়েকটি প্রদীপ জ্বালাতে ঘর আলোকিত হল। নিজের শয্যার কাছে এসে চাণক্য দেখালেন যে, চাণক্যর মাথার বালিশে একটি একই ধরনের কাঁটা ফুটে আছে। জীবসিদ্ধি বলল,

- আততায়ীকে একটি সরু, লম্বাটে কাঠি বের করতে দেখেই চিনতে পারি জিনিসটাকে। ওটা আসলে একটা বাঁকনল। অনেকটা এরকমই একটা নল ব্যবহার করে ফুঁ দিয়ে কাচের কাজ করা হয়। এধরনের একটা অস্ত্র গুপ্তঘাতকরাও ব্যবহার করে থাকে। বাঁকনলের একদিকে বিষাক্ত কাঁটা ভরে, অন্যদিক মুখে নিয়ে জোরে ফুঁ দিলে সেই কাঁটা তীব্রবেগে উড়ে গিয়ে বিদ্ধ করে শিকারকে। তৎক্ষণাৎ, নিঃশব্দ মৃত্যু।

হতভম্ব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন চিত্রবর্মা। এই কাণ্ডের তাৎপর্য বুঝতে তাঁর কিছুটা সময় লাগল। তা বুঝতে পেরেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তিনি চাণক্যর সম্মুখে,

আপনি বিশ্বাস করুন আচার্য, এ বিষয়ে আমি জড়িত নই! এ কাজ আমার নয়! এ আমার বিরুদ্ধে কারুর চক্রান্ত। কেউ বা কারা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চাইছে। আমি মূর্খ নই। আমি জানি যে, আমার রাজমহলের অন্দরে আপনাদের সমস্ত সুরক্ষার দায়িত্ব আমার। আমারই মহলে যদি মহামতি চাণক্যর কোনো বিপদ ঘটে তবে গোটা মগধের রোষ এসে পড়বে আমার উপর। আমি নিজেই নিজের ধ্বংস কেন চাইব, আচার্য? আচার্য, জীবসিদ্ধি আপনারা বিশ্বাস করুন এই বিষয়ে আমি কোনোভাবেই জড়িত নই।

চাণক্য এবং জীবসিদ্ধি একবার একে অপরের দিকে চাইল। চাণক্য চিত্রবর্মার উদ্দেশে বললেন,

উঠুন, যুবরাজ। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আপনারই কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি এই ঘটনায় নিশ্চিতভাবে যুক্ত। অন্যথায় আততায়ী রাজ্যের সৈনিকের পরিচয়পত্র পেত না। তা ছাড়া তার কাছে নিশ্চয়ই মহলের অন্দরের মানচিত্র ছিল যাতে সে সহজেই এত বড়ো মহলের মধ্যেও আমার কক্ষ খুঁজে পেয়েছে।

আপনি ঠিক বলেছেন, আচার্য। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে দোষীকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি অত্যন্ত লজ্জিত। — আপনি বিশ্রাম নিন, যুবরাজ। ভোর হতে আর দেরি নেই।

চিত্রবর্মা বিদায় নিতে চাণক্য নির্দেশ দিলেন দুই মৃত সৈনিকের মরদেহ পরেরদিনই যেন মগধে তাদের পরিজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। পূর্ণ সামরিক সম্মানে তাঁদের অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন হবে। সকলে বিদায় নিতে চান্কার কক্ষে শুধু জীবসিদ্ধি আর চাণক্য রয়ে গেল। চাণক্য বললেন,

— যাও হে, জীবসিদ্ধি। একটু ঘুমিয়ে নাও।

আজকে আমার আর ঘুম হবে না, আচার্য। আমি বহুবার আপনাকে সবধান করেছিলাম যে, এই কুলূতের আমন্ত্রণ নিঃসন্দেহে আপনাকে পাটলিপুত্রর সুরক্ষাবলয় থেকে বের করে এনে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল। আজকে প্রমাণিত হল যে, সেটাই সত্যি।

হুমম। তাই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু...

এতে আবার কিন্তু কীসের থাকছে?

— চিত্রবর্মা মিথ্যা বলছে বলে মনে হল না। আবারও বলছি, তার সঙ্গে আমি একটি বিষয়ে অন্তত সহমত, যে, সে আর যা-ই হোক, মূর্খ নয়। নিজের গৃহে ডেকে আমাকে হত্যা করে পরবর্তী দাবানলের তাপ সে কেন নিজের দিকে নেবে? — সম্ভবত শকুনির নির্দেশে।

হুমম। আমায় ভাবতে হবে হে, জীবসিদ্ধি। অনেকটা ভাবতে হবে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই মুহূর্তে নিজ ছন্দে ঘটে চলেছে যার উপর সমগ্র আর্যাবর্তর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

বায়ুরন্ধ্র— ভেন্টিলেটর

বাঁকনল— ব্লোপাইপ

২২.

পরের দু-দিন চাণক্য সারাদিন শুধুই পুথিপত্র পড়লেন। বৈদ্য চক্রাচার্যর গৃহ থেকে তিনি গোপনে অনেকগুলো পুস্তক আনিয়েছেন। পুস্তক আনানোর বিষয়ে এহেন

গোপনীয়তার প্রয়োজন কীই-বা থাকতে পারে তা জীবসিদ্ধি ভেবে পায়নি। চাণক্য সকাল থেকে রাত অবধি নিজের কক্ষে দোর এঁটে পড়ে চলেছেন। কী পড়ে চলেছেন, বা, কী খুঁজে পাওয়ার আশা নিয়ে পড়ছেন তা জীবসিদ্ধির জানা নেই। সম্ভবত তিনি বৈদ্যর হত্যার কোনো সূত্র খুঁজছেন।

জীবসিদ্ধি এই দু-দিনে দু-বার মহারাজ সুবর্মার ছদ্মবেশে সজ্জিত হয়ে তাঁর চালচলন আয়ত্ত করার অভ্যাস করেছে। একাজে তাকে সাহায্য করছেন অমাত্য শ্রীশৈল। আর মাত্র দু-দিন পরেই কুলূতের প্রতিষ্ঠা দিবস, অতএব তাকে মহারাজের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

তবে এই দু-দিনে তাদের কাছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পত্র এসেছে। প্রথম পত্রটি এসেছে গান্ধার থেকে।

পরমপূজ্য আচার্য, প্রণাম নেবেন।

আগেই জানিয়েছি যে, আমরা ওই বিশেষ ধরনের শরের নির্মাতার খোঁজ পেয়েছি। তার গৃহেই একটি ঘরে তার কার্যালয়। বাবাক ভারতীয় নয়। চেহারায় চৈনিক ছাপ আছে। সে এবং তার পুত্র গৃহে থাকে। পিতাই একমাত্র বাণ বানাতে পারে, পুত্রটি মন্দবুদ্ধি, হাবাগোবা গোছের। পায়ে সমস্যা আছে, খুঁড়িয়ে হাঁটে। বিশেষ কিছুই জানে না কাজকর্ম। পিতার হাতে হাতে জিনিস এগিয়ে দেয়, বাজার থেকে খাদ্য, ফলাদি ক্রয় করে আনে।

তার কার্যালয়ে ওই বাণ বাবাক নিজেই আমাদের দেখিয়েছে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সেই ধনুর্ধরের এখানে আসার কথা। আমরা আশা রাখি, দুর্ধর্ষ সেই আততায়ী তিরন্দাজকে আমরা এইবার ধরতে পারব আমাদের জালে।

আমি এবং একদল বিশ্বস্ত গূঢ়পুরুষ সর্বক্ষণ বাবাকের গৃহের উপর নজর রাখছি। তার গৃহের দু-দিকে দুটি দ্বার এবং দুই দুই করে চারজন সর্বক্ষণ সেই দ্বারের উপর নজর রাখে। বাবাক যে দ্বার দিয়েই বের হোক, একজন তার পিছু নেয় যতক্ষণ না সে গৃহে ফিরে আসছে। বলা তো যায় না, হয়তো আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পথে কোথাও সেই হত্যাকারী বাবাকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারে। তা ছাড়া বাবাক নিজেও যে শকুনির হয়ে কাজ করছে না তারও নিশ্চয়তা নেই। তাই তার প্রতিটি গতিবিধির উপরেই নজর রাখা হচ্ছে। আশা রাখি, আগামীতে সুসংবাদ দিতে পারব।

ইতি,

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র, শশাঙ্ক।

দ্বিতীয় পত্র নামহীন। শুধু একটি বাক্য লেখা— 'সেনার নগরে প্রবেশ সম্পন্ন হয়েছে।' তৃতীয় পত্র এসেছে পাটলিপুত্র থেকে।

প্রিয় আচার্য চাণক্য,

খেদের সঙ্গে জানাচ্ছি, জনগণনার কাজ খুব একটা অগ্রসর হয়নি। তৃতীয় ধাপ গণনা শুরু করার সময় আসন্ন। সম্রাট আপনাদের কুশলের কথা ভেবে বড়োই চিন্তিত।

বি দ্র আপনি সতর্ক থাকুন।

ইতি,

কাত্যায়ন।

জীবসিদ্ধি পত্রটি পাঠ করে কিছুই বুঝল না। অমাত্য রাক্ষস আবারও সেই একই জনগণনার কথা লিখেছেন। আর সবশেষে হঠাৎ চাণক্যকে সতর্ক কেন থাকতে বললেন? গোটা পত্রের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা কি সাধারণ সতর্কতাবাণী, নাকি, বিশেষ কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে?

প্রশ্নগুলো চাণক্যকে করতে চাণক্য উত্তর না দিয়ে 'কুলূতের মধুতে মিষ্টতা নেই' গোছের কিছু একটা কথা বলে প্রসঙ্গ পালটে এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি শুধু অমাত্য রাক্ষসের পত্রের উত্তর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

প্রিয় অমাত্য কাত্যায়ন,

সম্রাটকে জানাবেন যে, এদিকে সব কুশল। তৃতীয় পর্যায় জনগণনার কাজে ভীমাকে নিযুক্ত করুন।

ইতি,

বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য।

এই 'ভীমা' নামটা জীবসিদ্ধির চেনা চেনা মনে হলেও মনে পড়ল না কোথায় যেন শুনেছে এই নাম।

গতকালই আর এক গুপ্তচর এসে একটি অদ্ভুত সংবাদ জানিয়েছে। তার কথা অনুযায়ী বহু প্রচেষ্টার পর সে এক রাত্রে গোপনে কুলূতের সীমান্তে অপেক্ষারত মলয়কেতুর সেনাশিবিরে প্রবেশ করেছিল এবং সেখানে গিয়ে যা দেখা গিয়েছে তা বিস্ময়কর।

গুপ্তচর দেখতে পেয়েছে যে, সেই শিবির আসলে খালি। প্রায় কয়েক হাজার সেনার থাকার মতো তাঁবুর ব্যবস্থা থাকলেও বড়োজোর আশি-নব্বইজন সৈনিক আছে গোটা শিবিরে। তাদের একমাত্র কাজ কাউকে শিবিরে ঢুকতে না দেওয়া এবং প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যাবেলায় শিবির জুড়ে কিছুটা দূরে দূরে শুকনো কাঠ একত্র করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া।

গুপ্তচর চলে যেতে জীবসিদ্ধি চাণক্যর কাছে জানতে চেয়েছিল,

— এর মানে কী, আচার্য? অযথা সেনাশিবিরের মানে কী? অকারণ ভয় দেখানো? আর এই আগুন কেন জ্বালায় তারা রোজ সন্ধ্যায়?

চাণক্য সম্মতিতে মাথা নেড়ে বললেন,

হুমম। রাত্রে অনেক জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় যাতে দূরে পাহাড়ের উপর থেকে দেখলে মনে হয় কয়েক হাজার সৈনিক আগুন জ্বেলে তাপ

নিচ্ছে। সুন্দর পরিকল্পনা। এই ধূর্ত বুদ্ধি শকুনি ছাড়া আর কারই-বা হতে পারে! — কিন্তু উদ্দেশ্য কী? কুলূতকে বিভ্রান্ত করা?

চাণক্য একটি অদ্ভুত কথা বলে চোখ বুজলেন, — কুলূতকে, নাকি, আমাদের? —

বাকি পুরো সময়টাই চাণক্য চিকিৎসাশাস্ত্রের পুস্তক পড়ে এবং পদ্মাসনে বসে ধ্যান করে কাটালেন। একটিও শব্দ আর তিনি উচ্চারণ করেননি এই বিষয়ে।

২৩.

পরেরদিন সকালে উঠে জীবসিদ্ধি দেখল চাণক্য তখনও নিজের কক্ষ থেকে বের হননি। আচার্য বরাবরই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়েন। তাই কিছুটা অবাক হয়ে জীবসিদ্ধি দরজার বাইরে প্রহরারত মগধের দুই সৈনিকের কাছে জানতে চাইল সব ঠিক আছে কি না। উত্তরে এক প্রহরী জানাল,

— আচার্য গতকাল সারারাত জাগরণ করেছেন। তাঁর কক্ষের প্রদীপ সারারাত প্রজ্বলিত ছিল। আমরা কক্ষের ভেতর থেকে তাঁর শব্দ পেয়েছি, দু-একবার বাহিরেও এসেছিলেন। সম্ভবত তিনি সারারাত অধ্যয়নে ডুবে ছিলেন।

তবুও দুশ্চিন্তা হল জীবসিদ্ধির। তাই খানিকটা ইতস্তত করার পর সে চাণক্যর দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে ডাকল।

— আচার্য? আচার্য?

কিছুক্ষণ কোনো শব্দ হল না। জীবসিদ্ধির মনে আশঙ্কার মেঘ সবে জমাট বাঁধতে শুরু করেছিল, ভেতরের খিল সরিয়ে দরজা খুলে দিলেন চাণক্য। চোখের নীচে কালি দেখেই বোঝা যায় যে, প্রহরীদের কথাই ঠিক। চাণক্য সারারাত জেগে ছিলেন।

বজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে তিনি জীবসিদ্ধিকে ভিতরে আসতে বললেন এবং নিজে গিয়ে একটি আসনে বসলেন। সারাকক্ষে পুস্তক ছড়িয়ে পড়ে আছে। জীবসিদ্ধি সেগুলো একবার দেখে প্রশ্ন করল,

— ক্ষমা করবেন আপনার নিদ্রাভঙ্গের জন্যে। আসলে আপনি দরজা খুলছেন না দেখে আমার চিন্তা হচ্ছিল।

ঠোঁটের এককোণে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে চাণক্য বললেন,

— ভাবলে যে এই বুঝি আচার্যকে কেউ তাঁর কক্ষে হত্যা করে দিয়ে গেল। তাহলে আরও একটি রুদ্ধদ্বার হত্যারহস্য সৃষ্টি হত, তাই না? কী বলো হে, জীবসিদ্ধি? যদিও সেক্ষেত্রে তার সমাধান করার জন্যে চণক পুত্র চাণক্য থাকত না।

জীবসিদ্ধি গুরুর এহেন বক্রোক্তির উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল,

— সারারাত ধরে অধ্যয়ন করার কি খুব দরকার ছিল?

আড়মোড়া ভেঙে চাণক্য বললেন,

অবশ্যই দরকার ছিল। আগামী পরশুই তো প্রতিষ্ঠা দিবস। রহস্যের সমাধান না করে কীভাবে তোমায় বিপদের মুখে ঠেলে দিই বলো?

— তা, যা খুঁজছিলেন, তা পেলেন? -

চাণক্য একটি কুঁজো থেকে কিছুটা জল একটি ঘটিতে নিয়ে তা পান করলেন। চোখে-মুখে দিলেন। ঠান্ডাজলের স্পর্শে তাঁর ঘুম কাটল। বললেন,

ওহে জীবসিদ্ধি, তোমার গুরুর সম্ভবত কালের নিয়মে বয়সের ভারে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে।

কথার সত্যতা নিয়ে গুরুর সিদ্ধান্তের উপর আমি প্রশ্ন করছি না। তবে, হঠাৎ এই উপলব্ধির কারণ কী?

চাণক্য চোখ ছোটো করে তাঁর অন্তরভেদী দৃষ্টিতে জীবসিদ্ধির দিকে তাকালেন। নাক দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের 'হুফ' শব্দ করে বললেন,

কৌতুক করছ গুরুর সঙ্গে, হে জীবসিদ্ধি? চাণক্যর বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলছ? ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে জীবসিদ্ধি বলল,

আমি তুলিনি। আপনি স্বয়ং তুলেছেন।

চাণক্য একটি পুস্তক তুলে সেটির একটি পাতা খুলে জীবসিদ্ধির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,

বেশ তো, তবে নিজেই বের করো দেখি এই গোটা রহস্যের সমাধান। সমস্যার চাবিকাঠি শৈলবিদ্যার এই পুস্তকের একটি শ্লোকে রয়েছে। একাদশ শ্লোক পাঠ করে দেখো।

জীবসিদ্ধি পাঠ করল। চাণক্য জিজ্ঞেস করলেন,

কী বুঝলে মানে?

জীবসিদ্ধি আরও একবার পড়ল। বলল,

— এটা তো শবব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা করার একটা পদ্ধতি লেখা রয়েছে।

কী লেখা রয়েছে সেটা বলো।

— মৃতদেহ সম্পূর্ণ দাহ হওয়ার পরেও যদি পাকস্থলী ভস্মীভূত না হয়, তবে তা পাকস্থলীতে বিষাক্ত দ্রব্যের উপস্থিতির ইঙ্গিত।

জীবসিদ্ধি লক্ষ করল চাণক্যর চোখের নীচে কালি থাকলেও চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। এই দৃষ্টি জীবসিদ্ধির পরিচিত।

— আপনি কি বৈদ্যর মৃত্যুর সমাধান করে ফেলেছেন?

শুধু বৈদ্য চক্রাচার্যর নয়, জীবসিদ্ধি। সব রহস্যের সমাধান হয়েছে।

উত্তেজিত হয়ে জীবসিদ্ধি উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

সেকী? আপনি বলতে চাইছেন আপনি মহারাজ সুবর্মার মৃত্যুরহস্যের সমাধানও করে ফেলেছেন? আপনি জানেন কে হত্যাকারী?

হ্যাঁ। কে হত্যাকারী এটা তো সহজেই বোঝা যায়, জীবসিদ্ধি। কারুর মৃত্যুতে যার সবথেকে বেশি লাভ সে-ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হত্যাকারী হয়। এইক্ষেত্রেও তাই। এই রহস্যে 'কে?'-এর উত্তর গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু যতক্ষণ না 'কীভাবে?'-র উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল ততক্ষণ হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যেত না। আর তারপর আরও জটিল প্রশ্নটা হল 'কেন?'

অর্থাৎ, আপনি এখন জানেন কোন যন্ত্র ব্যবহারে শর নিক্ষেপ করা হয়েছিল? কোন কৌশলে সকলের চোখ এড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল মহারাজকে?

— হ্যাঁ, জীবসিদ্ধি। সেই কারণেই তো বলছি যে, আমার নিজের বুদ্ধির উপর আমার মনে আজকে সন্দেহ জাগছে। এত সরল সমাধানটা আমার বুঝতে এতদিন সময় লাগল। আমার তীব্র তিরস্কার প্রাপ্য, হে জীবসিদ্ধি। আরও অনেক আগেই আমার বোঝা উচিত

ছিল উৎসবের দিন ঠিক কী ঘটেছে। আমি এখন সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, জীবসিদ্ধি।

— আপনি বলতে চান সব সমাধান আপনি পেয়েছেন এই একটি শ্লোক থেকে?

- — হুমম। ঠিক তাই। সবথেকে বড়ো কথা এই পাকস্থলী আগুনে না ভস্মীভূত - হওয়ার ব্যাপারটা আমি পূর্বেই জানতাম। অথচ কিছুতেই এতদিন মনে পড়ছিল না। গতকাল রাতে এই লেখাটা খুঁজে পাই। তারপর শুধুই বসে ভেবেছি আর সমস্ত সূত্র একে একে জায়গামতো পর পর জুড়ে গিয়েছে।

জীবসিদ্ধি আরও একবার লেখাটা পড়েও কিছু বুঝতে না পেরে অধৈর্যভাবে পুস্তকটি নামিয়ে রাখল। বলল,

আমি কিন্তু আপনার কথার সূত্র কিছুই ধরতে পারছি না। -

— সেকী? এখনও বুঝলে না? সব সূত্র তো তোমার হাতেই আছে, জীবসিদ্ধি। এমনকী তুমি নিজেই কয়েক দিন আগে কথার মাঝে সমাধানটা বলে ফেলেছিলে।

- এ কী বলছেন আপনি? আমি? আমি সমাধান করে ফেলেছিলাম?

— ঠিক তাই। তুমি সমাধানের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলে নিজেরই অজান্তে। তোমার সেই কথাটা পুনরায় গতকাল রাতে মনে পড়তেই সমাধান পেয়ে গেলাম মহারাজ সুবর্মার হত্যারহস্যের।

জীবসিদ্ধি কিছুক্ষণ ভেবে দু-হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে বলল,

— নাহ্! পারলাম না। এবার আপনিই তবে আমার ধূম্রমোচন করুন, গুরুদেব। চাণক্যর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটল। বললেন,

বেশ, বেশ। আমিই তবে বুঝিয়ে বলি। গুরুর তো কাজ হল তার শিষ্যকে মার্গ দেখানো। তাই না? আমিই তবে তোমায় বলছি গোটা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে। কিন্তু তার আগে...

গুরুর পরিহাস হজম করে অধৈর্য ভঙ্গিতে জীবসিদ্ধি বলে উঠল,

— কী তার আগে?

চাণক্য চোখ বুজে বললেন,

- — আমি নিজের প্রার্থনা, পাঠ, আদি কার্য সম্পন্ন করি। তোমার গুরু ক্ষুধার্ত, হে জীবসিদ্ধি। যাও আগে তার আহারের জন্যে কিছু ফলাদি নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, সঙ্গে ধূমায়িত এক পেয়ালা দুধে বেশ খানিকটা মধু মিশিয়ে আনতে ভুলে যেয়ো না। তবে তার আগে তোমার আরও একটা কাজ আছে। তুমি আসার সময়ে অমাত্য শ্রীশৈলকে নিয়ে এসো। তাঁকে একটি প্রশ্ন করার আছে আমার।

২৪.

কুলূতে চাণক্যকে হত্যার চেষ্টা কে করল, মহারাজ মলয়কেতু?

প্রশ্নটা মলয়কেতুর দিকে ছুড়ে দিলেন আচার্য শকুনি। আজকেই শকুনি আবার পর্বত্যকা রাজ্যের রাজধানী মলয়নগরে ফিরে এসেছেন। মহলে প্রবেশ করেই তিনি সরাসরি চলে এলেন মহারাজের খোঁজে অন্দরে এবং অভিবাদনের ধার না ধেরেই সরাসরি প্রশ্ন করলেন তিনি।

মলয়কেতু তখন সবেই আহার সেরে উঠেছে। ব্রাহ্মণের ঔদ্ধত্য দেখে মাথা থেকে পায়ের নখ অবধি জ্বলে গেল মলয়কেতুর। কিন্তু শকুনিকে এখনই ঘাঁটানোর সাহস পেল না। নিজের কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ না করে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মলয়কেতু বলল,

– আপনি এসে গিয়েছেন, আচার্য? উত্তম, উত্তম। কিন্তু কী বললেন, আচার্য? কাকে হত্যা করা হয়েছে?

হত্যা করা হয়নি মহারাজ, হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি জানতে চাই এই কাণ্ডে আপনার হাত আছে কি না? -

মলয়কেতু বাস্তবিক অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,

- আমি? সেকী? সেই সংবাদ আমিও পেয়েছি, কিন্তু আমি তো ভাবলাম এটা আপনার কাজ।

মহারাজের অনুমতির অপেক্ষা না করেই একটি আসনে বসলেন শকুনি। ভ্রূ কুঁচকে মলয়কেতুর চোখে চোখ রেখে বোঝার চেষ্টা করলেন সে মিথ্যা বলছে না সত্যি। শেষে বললেন,

না, মহারাজ। আমি না।

তাহলে নিঃসন্দেহে চিত্রবর্মার কাজ।

না, সেও করেনি।

- তবে?

– সেটাই তো জানতে চাইছি, মহারাজ। আমার নির্দেশ অমান্য করে কে এই কাজ করল।

মলয়কেতুর আরও একবার রাগ হল। ‘নির্দেশ’? এই ব্রাহ্মণ নিজেকে ভাবে কী? সে তাঁকে ‘নির্দেশ’ দেবে?

আবারও রাগ গিলে মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে মলয়কেতু বলল,

– কিন্তু আচার্য, আপনি এতে এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? যে-ই করে থাকুক, সে তো আমাদের ভালোই করার চেষ্টা করছিল। চাণক্য আমাদের আর মগধের পথের মাঝের সবচেয়ে বড়ো কাঁটা। আপনি যখন দেড় মাস পূর্বে বলেছিলেন আপনি মগধের অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভটির উপর আঘাত করতে চলেছেন, তো আমি ভেবেছিলাম আপনি চাণক্যর কথাই বলছেন।

তখন শকুনি বিরক্তভাবে মলয়কেতুর দিকে তাকিয়ে বললেন,

কতটুকু জানেন আপনি মগধ সাম্রাজ্যের বিষয়ে? প্রায় গোটা আর্যাবর্ততেই যে সাম্রাজ্য আধিপত্য স্থাপন করে ফেলেছে মাত্র কয়েক বর্ষে, আপনি কি বাস্তবে মনে করেন যে, মাত্র একটি মানুষের উপর তা দাঁড়িয়ে আছে? আপনি কি মনে করেন যে, কুলহীন চন্দ্রগুপ্ত শুধুমাত্র চাণক্যর হাতের পুতুল?

- না... মানে... আমি বলতে চাইছি...

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ বললেন, – চন্দ্রগুপ্তকে বাল্যকাল থেকে সম্রাট হওয়ার জন্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাকে তক্ষশিলায় নিয়ে গিয়ে নিজের ছাত্র হিসাবে রেখেছিল চাণক্য। সে বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং সেইসঙ্গেই সে বীর অতি কুশল একজন যোদ্ধা। শোনা যায় সে অলকশেন্দ্রের' মহা পরাক্রমী যবন* সেনাদের থেকে যুদ্ধকলায় প্রশিক্ষিত হয়েছিল। তার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অমাত্য রাক্ষস একজন দক্ষ প্রশাসক। নন্দর রাজকুমারীকে বিবাহ করায় এবং রাক্ষস তার পক্ষে আসায় তার সমর্থক রাজাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া মগধের সুবিশাল সেনাবলের কথা নাই-বা বললাম। কিন্তু এইসব ছাড়াও তার কাছে আছে এমন একজন যে সম্ভবত মগধের কাছে চাণক্যর থেকেও অপরিহার্য।

– কে সে, আচার্য?

- এমন একজন যাকে মগধের শত্রুরা কেউ চেনে না। তার বাস্তব পরিচয় গোটা আর্যাবর্তে মাত্র কয়েক জন বিশেষ ব্যক্তি জানে। সে না থাকলে মগধ পঙ্গু হয়ে যাবে। মগধের সবচেয়ে গোপন এবং অন্যতম শক্তিশালী একটি অস্ত্র সে। নন্দ সাম্রাজ্যের পতনে তার ভূমিকা অন্যতম ছিল, অথচ কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তার উপস্থিতি।

বিস্ময়ে মলয়কেতুর মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন করল,

কার কথা বলছেন? কে সেই ব্যক্তি? আর, এত তথ্য আপনি কীভাবে জানেন? এমনকী তার ছাত্রাবস্থার কথাও জানেন আপনি! এগুলো যদি অত্যন্ত গোপন বিষয় হয়েই

থাকে, তবে তা আপনার কীভাবে জানা? এ একমাত্র তবেই সম্ভব যদি চাণক্য বা চন্দ্রগুপ্তর অত্যন্ত কাছের ও বিশ্বাসী কেউ আপনার পরিচিত হয়ে থাকে।

এই প্রথমবার শকুনিকে কিছুটা বিব্রত মনে হল। যেন ভুল করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে ফেলেছেন। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে তিনি বললেন,

সেকথা আপনার না জানলেও চলবে। আপনি খোঁজ নিন যে, চাণক্যর জন্যে কে গুপ্তহন্তা নিযুক্ত করেছে। যদি আমার অনুমান ভুল না হয় তবে আমাদের পক্ষে থাকা রাজাদের মধ্যেই কারুর কাজ এটা। আমি ঠিক করেছি আমি আরও একবার সকলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে চাই। তাদের আমি নিজে গোপন সভায় যোগদান করার জন্যে আমন্ত্রণপত্র পাঠাব।

— তাতে কী লাভ হবে, আচার্য?

যেন অতি নির্বোধ কারুর প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে এমনভাবে শকুনি উত্তর দিলেন,

- কারণ আমি দেখা করতে চাই শুনে, অন্য রাজাদের মধ্যে যে-ই এই কাজ করে থাকুক না কেন, তার মনে ভয় ঢুকবে। সে নিশ্চিতভাবেই ভেবে নেবে যে, আমি তার এই পদক্ষেপের কথা জেনে গিয়েছি। এবং, সেই ব্যক্তি ওই সভায় আসবে না। যে আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে অস্বীকার করবে, মহারাজ জানবেন সে-ই সম্ভবত আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

মনে মনে এই ব্রাহ্মণের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না। কিন্তু মলয়কেতুর মনে পড়ল গতকাল প্রধানামাত্য সুদীপ্তক একটা অদ্ভুত কথা বলছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী বলছিল তার নাকি শকুনির সঙ্গে কথা বলার সময় প্রতিবারই মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ অন্য কারুর বুলি বলছেন এবং তিনি যা বলেন তা আসলে তাঁর নিজের কথা নয়। এরকম অদ্ভুত কথা কেন বৃদ্ধের মাথায় এল তা মলয়কেতু ভেবে পায়নি যদিও।

মলয়কেতু প্রশ্ন করল,

সবই বুঝলাম কিন্তু আপনার একটা কথার সঙ্গে সহমত হতে পারছি না, আচার্য। চাণক্যকে হত্যা করতে বাধা কোথায়? সে এখন মগধের বাইরে, তাকে হত্যার পরিকল্পনা আমরা কেন করছি না? তাই

— কেননা চাণক্যকে জীবিত থাকতে হবে। কারণ তাকে নিজের চোখে দেখে যেতে হবে তার স্বপ্ন ধ্বংস হতে। তাকে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে তার একচ্ছত্র আর্যাবর্তর পতন, মগধের পতন! কারণ সেটাই হবে চাণক্যর জন্যে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন শাস্তি! এটাই হবে শকুনির চরম প্রতিশোধ!

অলকশেন্দ্র— অ্যালেকজেন্ডার দ্য গ্রেট

যবন— গ্রিক

২৫.

অমাত্য শ্রীশৈল এসে চাণক্যকে প্রণাম জানালেন,

প্রণাম, মহামতি।

চাণক্য প্রতি-প্রণাম জানিয়ে বললেন,

প্রণাম, মহামাত্য মহাশয়। আপনাকে আপনার কাজের মাঝে এভাবে ডেকে আনার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু একটা প্রশ্ন করা যে বড়োই জরুরি হয়ে পড়েছে, আর্য। কথা দিলাম এর পর আর কোনো প্রশ্ন আমি আপনাকে করব না। — কী প্রশ্ন, আচার্য? বলুন?

মহারাজকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেইদিন কি তিনি বার বার জলপান করছিলেন?

এই প্রশ্নে শ্রীশৈলকে এতটাই বিস্মিত মনে হল যেন তিনি কোনো অলৌকিক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর পাশে দাঁড়ানো জীবসিদ্ধিও অবাক হল এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে। কিন্তু শ্রীশৈলর উত্তরে জীবসিদ্ধি আরও বেশি অবাক হল,

হ্যাঁ, তাই তো। আপনি বলায় মনে পড়ছে। মহারাজ সেদিন বারান্দায় দাঁড়ানোর পর থেকেই বার বার জল চাইছিলেন। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন সেকথা? এই সামান্য ব্যাপারটা তো আমারই মনে ছিল না। আপনাকে কে বলল?

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

কেউ বলেনি, অমাত্য মহাশয়। এটি আমার যুক্তিনির্ভর অনুমান মাত্র। আমার শেষ সংশয়টুকু দূর করার জন্যে ধন্যবাদ। আপনাকে আর বিব্রত করব না। আগামীকাল উৎসব, আপনি তার প্রস্তুতি কাজে ব্যস্ত, তা আমি জানি। আপনি আসতে পারেন। ধন্যবাদ।

শ্রীশৈলর মনে প্রশ্ন ছিল কিন্তু চাণক্যর কথার পর আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, তাই তিনি প্রণাম জানিয়ে কক্ষ থেকে চলে গেলেন। তিনি বেরিয়ে যেতে জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

এই প্রশ্নের মানে কী, আচার্য? আপনি জানলেনই-বা কেমন করে এরকম অদ্ভুত তথ্য? দয়া করে আমায় ব্যাখ্যা করুন, আচার্য।

চাণক্য হাত তুলে জীবসিদ্ধিকে থামিয়ে বললেন,

শান্ত, হে জীবসিদ্ধি, শান্ত। সঠিক সময়ে উত্তর পাবে সব কিছুর। কিন্তু আপাতত আমি নিজের প্রাতঃভোজ সম্পন্ন করব।

* * *

জীবসিদ্ধি আসনে বসে পা অধৈর্য ভঙ্গিতে নাড়াচ্ছে আর গুরুকে তাড়া দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা অতি কষ্টে সংবরণ করছে।

চাণক্য আহার শেষে নিশ্চিত্ত ভঙ্গিতে, ধীরে-সুস্থে তাঁর মধুমিশ্রিত দুধে চুমুক দিচ্ছেন এবং আড়চোখে জীবসিদ্ধিকে লক্ষ করছেন। জীবসিদ্ধির অধৈর্য ভাবটা ক্রমশই বাড়ছে আর তিনি সেটা দেখে নিজের চুমুকের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান আরওই বাড়িয়ে চলেছেন। অন্যতম প্রিয় শিষ্যকে এইরূপ নিরীহ উৎপীড়ন করে তিনি মজা পান।

আধা পেয়ালা শেষ করে তা নামিয়ে রেখে চাণক্য একটি তৃপ্তিসূচক শব্দ করলেন মুখে। তারপর জীবসিদ্ধিকে প্রশ্ন করলেন,

আগে তোমার মতামত শুনতে চাই। কে মহারাজ সুবর্মার হত্যাকারী? জীবসিদ্ধি উত্তর দিল, -

হত্যাকারী অবশ্যই শকুনির সেই বিশেষ তিরন্দাজ। কারণ বিন্দু স্বীকার করেছে যে, এই বিশেষ বাণ সাধারণ ধনুর্ধরদের পক্ষে ব্যবহার করা কঠিন। কী উপায়ে সে সকলের চোখের সামনে এই অসম্ভব কাজ সম্ভব করেছে নিজে সম্পূর্ণ অদৃশ্য থেকে তার ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য সেটা নয়। আপনি জানতে চাইছেন যে, এই ঘটনার অন্তরালে কে আছে। বা, কার আদেশে হত্যা করা হয়েছে মহারাজকে। তাই তো? -

চাণক্য উত্তর না দিয়েই তাকিয়ে রইলেন জীবসিদ্ধির দিকে। জীবসিদ্ধি নিজেই বলল,

আমি নিশ্চিত চিত্রবর্মার কাজ এটা। রাজসিংহাসন লাভের আশায় তিনিই তাঁর অগ্রজের হত্যা করিয়েছেন। তবে এই গোটা ষড়যন্ত্র তাঁর একার নয়। এটা সম্পূর্ণ শকুনির মস্তিষ্কপ্রসূত। ওই বিষাক্ত তির ব্যবহার করে হত্যা করার উদ্দেশ্য যাতে পরবর্তীকালে সেই বাণ পাটলিপুত্রে পাঠিয়ে আমাদের এখানে আনা যায়। শকুনি জানত যে, ওই বাণ দেখে আপনি কুলূতে না এসে পারবেন না। আপনাকে আসতেই হবে এখানে।

চাণক্য আবারও প্রশ্ন করলেন,

আমাদের এখানে আমন্ত্রণ দিয়ে আনার উদ্দেশ্য কী — সেটা কি এতদিনে স্পষ্ট নয়, আচার্য? আপনাকে মগধের সুরক্ষাবলয়ের বাইরে এনে হত্যা করাই তার উদ্দেশ্য। এটা তো জলের মতো পরিষ্কার কয়েক দিন আগে সেই রাতের ঘটনার পর।

বলে তোমার মনে হয়?

চাণক্য দুদিকে ঘাড় নেড়ে বললেন,

না হে জীবসিদ্ধি, না। এখানেই সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়ে গেল তোমার। গোটা ঘটনাটা যে সাজানো সে-বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু ঘটনা এতটা সরল নয়। না না, ভুল বললাম। আসলে রহস্য অতীব সরল। যাকে জটিল করে সাজানো হয়েছে একটিমাত্র বিশেষ উদ্দেশ্যে।

জীবসিদ্ধি দু-হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল,

- আপনার কথার কোনো মানেই আমি বুঝতে পারছি না, আচার্য।

চাণক্য নিজের কেশশিখায় হাত বুলিয়ে বললেন,

- — বেশ, তোমায় আমি একটা অতি সহজ সূত্র দিচ্ছি। যদি বলি শকুনির সেই রহস্যময় তিরন্দাজ, মহারাজ সুবর্মার হত্যার সময়ে ছিলই না, তবে কি তুমি কিছু অনুমান করতে পারো?

জীবসিদ্ধি কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলল,

আপনি বলতে চাইছেন কোনো ধনুর্ধর ওই বিশেষ বাণ ব্যবহার করে হত্যা করেছে রাজাকে? আপনি কি... আপনি কি বিন্দুকেই সন্দেহ করছেন?

একদমই না। আমি কোনো ধনুর্ধর বা প্রতিযোগীকেই সন্দেহ করছি না। সত্যি বলতে আমি কাউকেই সন্দেহ করছি না। কারণ সন্দেহের ধাপ আমি অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি। আমি নিশ্চিতভাবেই জানি হত্যাকারী কে।

— কে?

— আগেই বলেছি, ‘কে?’-র চেয়ে এখানে ‘কীভাবে?’ বেশি জরুরি। কীভাবে হত্যা করা হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরের শেষেই, কে হত্যাকারী তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাই আগে আমি এই গোটা রহস্যের সবচেয়ে জটিল অংশের, সবচেয়ে সরল ব্যাখ্যাটা তোমায় বলব। আমার ব্যাখ্যার শেষে তুমি নিজেই নিশ্চিতভাবে বুঝে যাবে হত্যাকারী কে।

শ্বাসরুদ্ধ করে জীবসিদ্ধি শুনছে। চাণক্য বলতে শুরু করলেন,

আমরা এখনও পর্যন্ত সেইদিন এই প্রাঙ্গণে ও মহলের বারান্দায় উপস্থিত সকলের থেকে হত্যাকাণ্ডর বিষয়ে কী কী জেনেছি তা আরও একবার মনে করা যাক। নীচে প্রাঙ্গণে উপস্থিত সকলে দেখেছে মহারাজ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই পড়ে গেলেন।

চিত্রবর্মা আবছাভাবে, মাত্র একমুহূর্তের জন্যে দেখেছিলেন কালোমতো কিছু একটা দ্রুত ছুটে আসে মহারাজের দিকে, যেটা চিত্রবর্মা কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারেন যে আসলে সেটা একটা বাণ। অমাত্য শ্রীশৈল দেখেছিলেন মহারাজ হঠাৎই টলমল করে পড়ে গেলেন মেঝেতে। দু-জনই মহারাজের দিকে ছুটে যান, চিত্রবর্মা আগে মহারাজের কাছে পৌঁছোন এবং তাঁকে সোজা করতে দেখা যায় তাঁর কণ্ঠের একদিকে বাণ বিদ্ধ হয়ে আছে। এবং, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানেই রাজা মারা যান। তাই তো?

- ঠিক তাই।

এইবার মূল প্রশ্ন হল, কীভাবে হত্যাকারী ধনুকে তির চড়িয়ে, নিক্ষেপ করে এই কাজ করল অথচ কেউ দেখতে পেল না। যদি প্রাঙ্গণে উপস্থিত কেউ, বা, উচু পাঁচিলে থাকা কোনো সৈনিক এই কাজ করে থাকে তবে তাকে নিশ্চিতভাবেই কেউ-না-কেউ দেখতে পেত। আবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা চিত্রবর্মা, শ্রীশৈল অথবা তাদের থেকে কিছুটা দূরে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীদের পক্ষেও ধনুক ব্যবহার করে তির নিক্ষেপ করা সম্ভব নয় সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে। যদি ধরেও নিই যে বারান্দায় সেখানে উপস্থিত সকলেই ষড়যন্ত্রে মিলিত এবং সকলেই মিথ্যা বলছে তাহলেও একটা সমস্যা থেকে যায়, সেটা হল যে মহারাজ সুবর্মার কণ্ঠে তির বিদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ সামনের দিকে। মহারাজ উৎসবের সময়ে যে বারান্দার থেকে সামনে প্রাঙ্গণের দিকে মুখ করে ছিলেন। অর্থাৎ চিত্রবর্মা, অমাত্য এবং সৈনিকরা ছিল মহারাজের পেছনের দিকে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার সময়ে মহারাজ তাদের দিকে পেছন ফিরে ছিলেন। অতএব তাদের পক্ষে মহারাজের কণ্ঠে ধনুর্বাণ ব্যবহার করে তির বিদ্ধ করা সম্ভব ছিল না।

তবে? তবে কি আমার সন্দেহই ঠিক? ভিনদেশের প্রযুক্তিতে বানানো কোনো শর-নিক্ষেপকারী অস্ত্র?

– যন্ত্র প্রযুক্তির ব্যবহারে উন্নত ও শক্তিশালী হতে পারে জীবসিদ্ধি, কিন্তু অদৃশ্য হতে পারে কি? তাহলে যে সেটা প্রযুক্তি নয়, জাদুবলে। সে-সম্ভাবনার স্থান আমার যুক্তিভিত্তিক বাস্তব ব্যাখ্যায় অপ্রয়োজনীয়। না হে জীবসিদ্ধি, আমি তোমায় আশ্বস্ত করছি কোনোরকম অদ্ভুত, অজানা যন্ত্রের ব্যবহার এই ক্ষেত্রে হয়নি।

জীবসিদ্ধি কিছুটা দমে গেল। হতাশ ভঙ্গিতে বলল,

– তাহলে আপনি বলতে চাইছেন সাধারণ ধনুক ব্যবহার করেই তির নিক্ষেপ করা হয়েছিল? কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? সেখানে উপস্থিত এতজনের দৃষ্টি এড়িয়ে কি ধনুকের থেকে বাণ নিক্ষেপ সম্ভব?

এইবার তুমি সঠিক পথে চলেছ, জীবসিদ্ধি। একদম সঠিক প্রশ্ন। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কি একটা ধনুক থেকে বাণ নিক্ষেপ করা সম্ভব? উত্তরটা হল— না। সম্ভব না। কখনোই সম্ভব না।

তবে?

– এর উত্তর তুমি নিজেই আমায় কয়েক দিন আগে দিয়েছিলে, জীবসিদ্ধি। কথার মাঝে তুমি বলেছিলে যে, যদি-বা সকলের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে একটি বাণ আনা সম্ভবও হয়, গোটা একটা ধনুক আনা কখনোই সম্ভব না। এটাই এই রহস্যের উত্তর, জীবসিদ্ধি। এই গোটা হত্যাকাণ্ডে ধনুক ব্যবহার করাই হয়নি। মহারাজের মৃত্যু বাণ বিদ্ধ হওয়ার ফলে হয়ইনি। তাঁর মৃত্যু হয়েছে বিষক্রিয়ায়! বাণের ফলায় লাগানো বিষ নয়, খাদ্য বা পানীয়র সঙ্গে মুখপথে গ্রহণ করা কোনো বিষের ফলে মৃত্যু হয় মহারাজের।

অবাক বিস্ময়ে জীবসিদ্ধির মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে। কথা বলতে ভুলে গিয়েছে সে। তার মাথায় সব আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে। জীবসিদ্ধিকে বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে ওঠার সুযোগ না দিয়েই চাণক্য পুনরায় বলে উঠলেন,

— হ্যাঁ, জীবসিদ্ধি। আমার বিশ্বাস মহারাজ সুবর্মাকে সেদিন উৎসব শুরুর ঠিক আগেই বিষ দেওয়া হয়েছিল খাদ্য বা পানীয়র মাধ্যমে। এমন কোনো বিষ যা প্রভাব দেখানো শুরু করে ধীরে ধীরে। বেশ কিছুটা সময় নিয়ে তা মানুষের শরীরে ছড়িয়ে যায় এবং একসময়ে হৃদগতি স্তব্ধ করে। মহারাজ উৎসব দেখেছিলেন দাঁড়িয়ে, শরীরে ধীরে ধীরে অস্বস্তি বাড়ছিল। তিনি তাই বার বার জল পান করছিলেন। কারণ ততক্ষণে বিষ রাজার শরীরে তার ক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এ ধরনের বেশিরভাগ বিষের প্রাথমিক উপসর্গ হল বার বার গলা শুকিয়ে যাওয়া। সব সূত্র থেকেই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, মহারাজকে বিষ দেওয়া হয়েছিল। তাই একটু আগেই মহামাত্যকে প্রশ্ন করলাম যে, রাজা সেদিন বার বার জল খেতে চাইছিলেন কি না। তার উত্তর থেকে আমার যুক্তিনির্ভর অনুমান এইবার নিশ্চিত সত্য বলে প্রমাণিত হল। মহারাজ সুবর্মাকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এবং, সে-বিষ তাঁর শরীরে তিরবিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই প্রবেশ করেছিল।

২৬.

অনেকক্ষণ কথা বলায় চাণক্যর গলা শুকিয়ে গিয়েছে। তাই আরও একচুমুক দুধে গলা ভিজিয়ে নিয়ে তিনি আবার শুরু করলেন,

ভেবে দেখো, প্রাঙ্গণে উপস্থিত দর্শকরা কী দেখেছিল। তারা দেখেছিল যে, মহারাজ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই মেঝেতে পড়ে যান। বারান্দায় উপস্থিত থাকা প্রত্যেকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায় মহারাজের গলায় তির বিদ্ধ হয়ে আছে। অতএব সকলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিল যে, রাজা তিরের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। আমার এখানেই প্রথম সন্দেহ জাগে। তির সামনে থেকে এসে বিধলে, রাজা সুবর্মার পড়া উচিত পিঠের দিক করে, বুকের দিকে নয়। কারণ ছুটে আসা তিরের ধাক্কায় তাঁর শরীর পিছিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু সকলেই বলেছে যে মহারাজ উলটো হয়ে পড়েছিলেন যে কারণে প্রথমে কেউই তির দেখতে পায়নি। চাণক্য নিজের আঙুল নিজের কণ্ঠের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,

-দ্বিতীয় যে বিষয়টা ঠিক মেলাতে পারছিলাম না সেটা হল তির বিদ্ধ হওয়ার ভঙ্গি। সকলেই বলেছে যে, বাণের গোটা ফলাটাই প্রায় গলায় গেঁথে গিয়েছিল। অথচ বিন্দুর সাহায্যে করা পরীক্ষার ফলে এটা স্পষ্ট যে, পাঁচিল থেকে হোক বা নীচের প্রাঙ্গণ, কোনো স্থান থেকেই বাণ নিক্ষেপ করে সেটা সম্ভব নয়। যদি-বা কোনো অত্যন্ত প্রতিভাধর ধনুর্ধরের নিক্ষেপ করা বাণ বারান্দায় দাঁড়ানো কোনো মানুষের শরীর বিদ্ধ করতে সক্ষমও হয়, তবে সেই বাণের মধ্যে এতটা গতি অবশিষ্ট থাকতে পারে না যে, সেটা গোটা ফলা অবধি ঢুকে যাবে মানুষের শরীরে।

কিন্তু রাজা সুবর্মার ক্ষেত্রে ঠিক সেইটাই হয়েছিল। কোনো ধনুক ব্যবহার করেই সেটা সম্ভব নয়। এবং, এই ক্ষেত্রেও ধনুক ব্যবহার হয়নি।

মহারাজকে আগেই বিষ দেওয়া হয়েছিল। হত্যাকারী অপেক্ষাতেই ছিল কখন বিষ কাজ করা শুরু করবে এবং মহারাজ সুবর্মা ঢলে পড়বেন মৃত্যুর কোলে। কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে একটা বিষয় অত্যন্ত জরুরি ছিল, মহারাজের মৃত বা প্রায় মৃত শরীর মেঝেতে ঢলে পড়ার পর বাকি নাটকটা মঞ্চস্থ করার জন্যে হত্যাকারীকে মৃতদেহের কাছে সবচেয়ে প্রথমে পৌঁছানো ছিল আবশ্যক। তাই সে কিছুটা এগিয়েই গিয়েছিল মহারাজের পতনের আগে থেকেই তার দিকে। মহারাজ পড়ে যেতেই সে সবার প্রথমে ছুটে গেল তাঁর কাছে এবং বসে পড়ল বারান্দায় উপস্থিত অন্যদের দিকে পিঠ করে। মহারাজ পড়েছিলেন বুকের উপর ভর করে। হত্যাকারী তাঁকে সোজা করল, নিজের অঙ্গাবস্ত্রের ভাঁজে লুকিয়ে রাখা একটি বিষাক্ত বাণ বের করল এবং সজোরে গেঁথে দিল মৃতদেহের কণ্ঠে। গোটা ব্যাপারটাই ঘটল মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে। নীচে প্রাঙ্গণে থাকা লোকেদের বা দুর্গের প্রাচীরে দাঁড়ানো প্রহরীদের কারুর পক্ষেই দেখা সম্ভব ছিল না নীচু পাঁচিল ঘেরা বারান্দার আড়ালে কী ঘটল। আবার সেই ঘটনা বারান্দায় সেসময়ে

উপস্থিত থাকা কেউই প্রত্যক্ষ করল না কারণ রাজার শরীরের উপরের অংশ আড়াল করে ছিল তাঁর সামনে ঝুঁকে বসে থাকা হত্যাকারীর শরীর। সকলে এগিয়ে এল এবং দেখল মহারাজের কণ্ঠে তির গেঁথে আছে এবং ধরেই নিল যে যখন মহারাজ বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতা দেখেছিলেন সেই সময়েই কেউ সম্মুখ থেকে তাঁর দিকে বাণ নিক্ষেপ করেছে। আরও একচুমুকে অনেকটা

দুধ গলায় ঢেলে চাণক্য বললেন,

হত্যার পদ্ধতিটা যখন বুঝতেই পারলে তখন আশা রাখি হত্যাকারী কে সেটা বুঝতে আর অসুবিধা থাকে না।

জীবসিদ্ধি উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল,

— চিত্রবর্মা!

হুমম। ভেবে দেখো, আমরা যে কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি সেদিনের ঘটনা নিয়ে, তাদের মধ্যে একমাত্র একজনই বলেছে যে, সে বাণের মতো কিছু একটা উড়ে আসতে দেখেছে, যেটা নিঃসন্দেহে মিথ্যা কথা। চিত্রবর্মা এই কথা ইচ্ছা করে বলেছিল আমাদের ও অন্য সকলকে বিভ্রান্ত করতে। তার কথায় সকলেরই মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা মহারাজকে বাণ বিদ্ধ হয়ে মেঝেতে ঢলে পড়তে দেখেছে। কিন্তু বাস্তবে কেউই মহারাজকে শরবিদ্ধ হতে দেখেনি। তারা শুধুই তাঁকে পড়ে যেতে দেখেছিল মেঝেতে। আসলে মহারাজ প্রথমে ঢলে পড়েছিলেন এবং তার পরে সকলের দৃষ্টির আড়ালে বাণ দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিলেন। চিত্রবর্মা অত্যন্ত সুকৌশলে সকলকে বিভ্রান্ত করেছেন।

তুমি এইবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, তুমি রহস্য সমাধানের কতটা কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলে হে, জীবসিদ্ধি। যখন তুমি বলেছিলে যে, বাণ বা ছুরির মতো ছোটো জিনিস নিজের বস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু ধনুক লুকিয়ে রাখা সম্ভব না। এক্ষেত্রে ঠিক সেই কৌশলটাই ব্যবহার করা হয়েছে। তিরবিদ্ধ মৃতদেহ দেখে সকলেই ধরে নেবে যে, ধনুকের সাহায্যে নিক্ষেপ করা বাণের আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে। এমনকী মৃতদেহের শরীরে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেলেও কারুর সন্দেহ হবে না কারণ বাণের ফলায় তীব্র মারণ বিষ আছে। কেউ ধারণাই করতে পারবে না যে, মহারাজের মৃত্যু যে বিষে হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তিরের ফলার বিষ প্রায় তৎক্ষণাৎ প্রাণ নেয়। আর মহারাজকে আগেই যে বিষ দেওয়া হয়েছে তা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে কিছুটা সময় নিয়ে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজের কেশশিখায় অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাত বুলিয়ে চাণক্য বললেন,

গোটা বিষয়টা যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত এবং সেই ব্যক্তি কে তা আশা করি বুঝতে পারছ? কয়েক বছর আগে পাটলিপুত্রর রাজমহলের অন্দরে গান্ধারের দূতের হত্যা, নকল স্বর্ণমুদ্রার ঘটনা আর এই কুলূতের হত্যাকাণ্ডর মধ্যে মিল পাচ্ছ না, জীবসিদ্ধি? প্রথম ক্ষেত্রে একটি বিষাক্ত শলাকা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তক্ষশিলায় অলৌকিক উপদ্রব আর এইবার এই তির ব্যবহার। এই সবগুলি ব্যবহার হয়েছে মূল সমাধান বা মূল সমস্যা থেকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। 'তিরধনুক' দুটি শব্দ একে অন্যের সঙ্গে সর্বদা অবিচ্ছেদ্য। সকলেই ধরে নেয় বিনা তিরে ধনুকের গুরুত্ব নেই আবার ধনুর ব্যবহার ছাড়া তিরের কোনো ব্যবহার নেই। অথচ এখানে ঠিক সেটা করা হয়েছে। এই কৌশল চিত্রবর্মা ব্যবহার করলেও আসলে এ যে আচার্য শকুনির মস্তিষ্কের ফসল সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত! এত সহজ একটি কৌশল, অথচ কতটা কঠিন তার সমাধান সেটা ভাবো। যে সমাধান করার জন্যে একজন নিরীহ মেধাবী মানুষকে প্রাণ দিতে হল। -

কে? কার কথা বলছেন?

তাঁর কথা বলছি যিনি আমারও আগে হত্যার আসল পদ্ধতিটা ধরে ফেলেছিলেন। এবং, তাই তাঁকে প্রাণ দিতে হল— রাজবৈদ্য চক্রাচার্য!

২৭.

বোধগম্য হল না। বৈদ্য হত্যার পদ্ধতি ধরে ফেলেছিলেন? কিন্তু তাহলে সেকথা তিনি আপনাকে সেইদিন জানাননি কেন?

জীবসিদ্ধির প্রশ্নের উত্তরে দু-দিকে ঘাড় নেড়ে চাণক্য বললেন,

না জীবসিদ্ধি, তিনি তখনও পর্যন্ত জানতেন না। তিনিও অন্য সকলের মতোই প্রথমে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি সত্য অনুমান করেছিলেন। অন্তত আংশিকভাবে তিনি রহস্যের সমাধান করতে পেরেছিলেন। প্রথমে মৃতদেহে বিঁধে থাকা তিরের ফলায় বিষ থাকায় তিনিও ধরেই নিয়েছিলেন যে, মৃতদেহে যে সমস্ত বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছে সেগুলো সেই বিষাক্ত বাণেরই প্রভাবে হয়েছে। তাই তিনি মৃতদেহের পাকস্থলীতে থাকা অপাচ্য খাদ্য পরীক্ষা করেননি সেই সময়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে আমার সঙ্গে আলোচনায় আমি সে-প্রসঙ্গ তুলি। সত্যি বলতে আমিও কিন্তু সেইসময়ে একবারের জন্যেও ভাবিনি যে, রাজাকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আসলে তুমি তো জানোই যে, আমি যে বৃহৎ 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করছি তাতে মৃতদেহ পরীক্ষা নিয়ে একটি অধ্যায়

রাখছি। সেই উদ্দেশ্যেই শব ব্যবচ্ছেদ নিয়ে আমার অধ্যয়ন ও কৌতূহল দুইই আছে। আমি সেই কৌতূহলবশেই সেইদিন মৃতদেহে বিষাক্ত খাদ্য উপস্থিত কি না তা পরীক্ষা পদ্ধতির প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। সেটাই বৈদ্যর জীবনে কাল হয়ে এল।

আফশোসের দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাণক্য বললেন,

আমার কথায় বৈদ্য চক্রাচার্যর মনের গভীরে একটা প্রশ্ন অঙ্কুরিত হল। তার মনে হল, সত্যিই তো, তিনি আলাদা করে মৃতর পেটে থাকা অপাচ্য খাদ্যের পরীক্ষা করেননি। যদি তাতেও বিষ থেকে থাকে? কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই। কারণ সুবর্মার মৃতদেহ একমাস পূর্বেই ভস্মীভূত হয়েছে। তবে? এখন কী উপায়? এই ভাবনায় তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করলেন। খুঁজলেন যে কিছু তাঁর নজর এড়িয়ে গিয়েছে কি না। আর তখনই তাঁর নজর ওই যে তোমার পাশে রাখা পুস্তকের একটি অংশে পড়ল, যে অংশটা তুমি একটু আগে পাঠ করলে। মৃতদেহ চিতার অগ্নিতে ভস্ম হয়ে যাওয়ার পরেও যদি দেখা যায় যে, পাকস্থলী সম্পূর্ণ ভস্ম হয়নি, তবে বুঝতে হবে যে পাকস্থলীতে কোনো বিষাক্ত পদার্থ ছিল। বৈদ্য তাঁর মনের সন্দেহ পরীক্ষা করার একটা উপায় পেলেন। তিনি ভাবলেন যদি এটা জানা যায় যে, মহারাজ সুবর্মাকে দাহ করার সময়ও এটা ঘটেছিল কি না, তবে বোঝা যাবে মহারাজের পেটে বিষ ছিল কি না।

এদিকে মহারাজ সুবর্মার মারা যাওয়ার কথা যেহেতু গোপন রাখা হয়েছে অতএব ধরে নেওয়া যায় মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েক জন দেহ সরের সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। তাদের কাবুর থেকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পেয়ে যাবেন বলে ভাবলেন তিনি। এবার, কে ছিল সেখানে মৃতদেহ সংকারের সময়ে? সেকথা ভাবতে প্রথমেই তাঁর মাথায় এল চিত্রবর্মার নাম, যে কিনা আবার বৈদ্যর মিত্রস্থানীয়। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস ভাবো জীবসিদ্ধি, বৈদ্য তাঁর সন্দেহের নিরসন করতে গেলেন স্বয়ং হত্যাকারীর কাছে।

বিস্মিত জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

— তার মানে চিত্রবর্মাই চক্রাচার্যকে হত্যা করেছে?

গম্ভীর মুখে উপর-নীচে মাথা নাড়ালেন চাণক্য,

- হুমম। অনুমান করতে পারি, যখন সেইদিন চিত্রবর্মা ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন রথে, পথেই তাঁর দেখা হয় চক্রাচার্যর সঙ্গে। তিনি নিজের সন্দেহের কথা জানান চিত্রবর্মাকে। চিত্রবর্মার মাথায় বলতে গেলে বজ্রপাত হল। চিত্রবর্মা বুঝতে পারল যে, বৈদ্যর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কোনোভাবেই হতে দেওয়া যাবে না! কারণ একবার চক্রাচার্য যদি নিজের সন্দেহের কথা আমায় বলে তবে আমি নিঃসন্দেহে হত্যা-পদ্ধতিটি ধরে ফেলব। বৈদ্য তাঁর সরল প্রকৃতিতে তাঁকে সন্দেহ না করলেও আমি কিন্তু সহজেই বুঝে যাব হত্যাকারী কে

যদি একবার রাজার খাদ্যে বিষ থাকার কথা আমি জানতে পারি। অতএব চিত্রবর্মা বুঝল যে, নিজেকে বাঁচানোর স্বার্থে রাজবৈদ্যর মুখ চিরতরে বন্ধ করতেই হবে।

চিত্রবর্মা আর বৈদ্যর মধ্যে সেইদিন কী কথোপকথন হয়েছিল আমার জানা নেই। কিন্তু অনুমান করতে পারি চিত্রবর্মা একান্তে গোপন কথা আলোচনার অজুহাতে বৈদ্যকে নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। যেহেতু আগে থেকে কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চিত্রবর্মা মহল থেকে বেরোয়নি অতএব তার কাছে নিজের তরবারিটি বাদে অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না। তাই নিজের তরবারি দিয়েই সে চক্রাচার্যকে হত্যা করে। তার শরীরের সামান্য অলংকার খুলে নেয় যাতে মনে হয় এ কাজ দস্যুদের।

খানিক থেমে চাণক্য বললেন,

মনে করে দেখো, বৈদ্য যেদিন খুন হলেন সেইদিনই আমি একটা বিষয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম। হত্যাকারী বৈদ্যকে হত্যা করে সেই অস্ত্রে লেগে থাকা রক্ত তারই অঙ্গাবস্ত্রে মুছে নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। রক্তাক্ত অস্ত্র মৃতদেহের সঙ্গে ফেলে আসা অধিক সহজ নয় কি? তাহলে কেন হত্যাকারী অস্ত্র হত্যাস্থলেই ত্যাগ করল না? তার কারণটা এখন স্পষ্ট। বৈদ্যকে চিত্রবর্মা হত্যা করেছিল নিজেরই তরবারি দিয়ে, যার হাতলে রাজচিহ্ন খোদাই করা আছে। অতএব সে-অস্ত্র তার পক্ষে ঘটনাস্থলে ফেলে আসা কোনোমতেই সম্ভব ছিল না।

চক্রাচার্যর মৃতদেহর কথা স্মরণে এল জীবসিদ্ধির। গোটা রহস্য তার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। চাণক্য অন্যমনস্কভাবে কেশশিখায় হাত বুলিয়ে বললেন,

— বৈদ্যর গৃহে গিয়ে তাঁর অধ্যয়ন কক্ষে ছড়িয়ে থাকা বই দেখে আমার মনে সন্দেহ হয় যে, সম্ভবত তিনি কোনো এক পুথিতে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছেন যার ফলে তাঁকে হত্যা করা হল। হয়তো আমিও সেই তথ্য খুঁজে পাব যদি ভাগ্যদেবতা সহায় হয়। অতএব গোপনে সেইসমস্ত পুস্তক ও ভূর্জপত্র এখানে আনালাম। কারণ তোমারই মতো আমিও প্রথম দিন থেকেই চিত্রবর্মা ও শ্রীশৈলকে বিশ্বাস করিনি। তাই আমি চাইনি কেউ জানুক যে, আমি সেইসমস্ত পুস্তক পড়েছি। এবং, দু-দিন প্রচুর পুস্তক পাঠের পর অবশেষে তোমার হাতে ধরা ওই ভূর্জপত্রে, ওই বিশেষ অংশটি খুঁজে পাই। এরপর যতই ভাবতে থাকি, ততই প্রতিটা সূত্র একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে যেতে থাকল। এতদিন ধরে গোটা রহস্যের উপর থাকা অস্বচ্ছ পর্দাটা ক্রমশ সরে যায়। একবার এই বাণ-রহস্যের সমাধান হতেই বাকিটা সহজেই ধরা দিল।

জীবসিদ্ধির চোয়াল শক্ত হল। বলল,

— এর অর্থ দাঁড়ায় যে, চিত্রবর্মাও আচার্য শকুনির সঙ্গে তাঁর অশুভ ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়েছে।

হুমম। অতএব, উত্তর-পশ্চিমের যে সকল জনপদ মগধের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে, তার সংখ্যা পাঁচ নয়, ছয়। মলয়কেতু আর চিত্রবর্মা শত্রু নয়, বরং তারা একত্রে লিপ্ত হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে। কুলূতের সীমান্তে পর্বত্যকা রাজ্যের সেনাশিবির যে শুধুমাত্র একটি সাজানো নাটকের অংশ তা নিশ্চয়ই তুমি পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছ। এটা করা হয়েছে যাতে চিত্রবর্মার কথায় আমরা সহজে বিশ্বাস করি; যাতে মগধ বিশ্বাস করে যে, মলয়কেতু কুলুতে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। সেটাও আমাদের বিভ্রান্ত করার আরও একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

ভেবে দেখো হে, জীবসিদ্ধি। যদি মলয়কেতুর উদ্দেশ্য সত্যিই কুলূত আক্রমণের হয়ে থাকত, তবে তারা গত একমাস ধরে অপেক্ষা কেন করে থাকবে?

শুধুমাত্র মহারাজ সুবর্মা বেঁচে আছেন এই কারণে তারা কুলূতের সীমান্ত অতিক্রম করবে না এই যুক্তি কি আদৌ বাস্তবসম্মত?

জীবসিদ্ধি কিছুক্ষণ ভেবে প্রশ্ন করল,

শুধুই কি চিত্রবর্মা নাকি সঙ্গে শ্রীশৈলও এই চক্রান্তে জড়িত?

- নাহ্। তিনি জড়িত থাকলে একটু আগে আমার প্রশ্নের উত্তরে সত্য বলতেন না। মহারাজের বার বার গলা শুকিয়ে যাওয়ার কথা শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন সত্যিই। তিনি জড়িত থাকলে আমায় মিথ্যা বলতেন যে, সেরকম কিছুই ঘটেনি ওইদিন। তিনি মহারাজের হত্যার সঙ্গে জড়িত নন। তবে...

কথা শেষ না করে কিছু ভাবতে শুরু করলেন চাণক্য। জীবসিদ্ধির প্রশ্নে তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ল,

— তাহলে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, আচার্য? চিত্রবর্মাকে কি বন্দি করার নির্দেশ দেব আমাদের সেনাকে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় জীবসিদ্ধি বলল,

ওহ্! আরও একটা সংবাদ আপনাকে জানাই। গতকালকেই মগধের সেনা গোপনে প্রবেশ করেছে নাগরে। ছোটো ছোটো দলে আসায় কেউ সন্দেহ করেনি। তারা ইতিমধ্যে দুর্গের অন্দরে প্রবেশ করেছে এবং চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। আপনি আদেশ দিলেই এই দুর্গ আমরা দখল করতে পারি।

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

যাক, সময়মতো কাজ হয়েছে। কুলুতে প্রবেশ করার দিন, চিত্রবর্মাকে বলা একটা সামান্য মিথ্যা আমাদের পক্ষে লাভজনক হয়েছে। চিত্রবর্মা প্রশ্ন করায় আমরা জানিয়েছিলাম মগধ সেনা আমাদের দু-দিন পর রওনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের দু-দিন পূর্বেই কয়েকশো সেনা রওনা দিয়েছিল কুলূতের উদ্দেশে। তুমি পূর্বেই অনুমান করেছিলে যে, মূল সেনাবাহিনীকে পথে বিলম্বিত করার বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। চওড়া পাহাড়ি পথে ধস নামিয়ে সে-চেষ্টা ইতিমধ্যে করা হয়েছে। আমাদের শত্রুরা জানে যে, সেনা এখানে পৌঁছাতে আরও অন্তত তিনদিন সময় লাগবে। কিন্তু তারা যেটা জানে না তা হল, বিভিন্ন ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে, পায়ে হাঁটা পাহাড়ি পথে ইতিমধ্যে মগধের কয়েকশো সৈনিক এসে পৌঁছেছে এখানে। এরকম একটা দুর্দান্ত পরিকল্পনা ভেবে বের করার জন্যে তোমায় সাধুবাদ জানাই। কুলূতের এই দুর্গ দখল আমরা করতেই পারি। কিন্তু একটা সমস্যা আছে, জীবসিদ্ধি।

— কী সমস্যা, আচার্য?

- ভুলে যেয়ো না আমাদের কাছে কিন্তু চিত্রবর্মার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। সে গোটা বিষয়টা অস্বীকার করলে আমরা কী করব?

বিব্রত হল জীবসিদ্ধি। বলল,

তাহলে এখন উপায়?

চাণক্যর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন,

আরও একদিন আমরা চিত্রবর্মার এই নাটকে অংশগ্রহণ করব। তবে এইবার নাটকের লিপি আমরা লিখব। এই নাটকের সূত্রপাত আমাদের শত্রুরা করেছে, কিন্তু এর যবনিকাপাত আমরা করব হে, জীবসিদ্ধি।

তখনই কথায় বাধা পড়ল। দরজায় কেউ করাঘাত করল। জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

- কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল,

— গান্ধার থেকে জরুরি সংবাদ এসেছে, ব্রাহ্মণদেব।

২৮.

আচার্য,

প্রণাম নেবেন। অস্ত্রনির্মাতা বাবাক নিখোঁজ। আমরা সর্বক্ষণ তার গৃহের উপর নজর রাখছিলাম। অথচ সে নিজের গৃহের মধ্যে থেকেই অদৃশ্য হয়েছে।

ঠিক যেন কোনো জাদুবলে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে নিজের গৃহের চার দেয়ালের অন্দর থেকেই। তার পুত্রও আমাদের মতোই হতবাক। সন্দেহ করছি শকুনির লোক বাবাককে অপহরণ করেছে। কিন্তু কীভাবে এ সম্ভব হল জানা নেই। বাবাক আমাদের হাতের একমাত্র সূত্র ছিল শকুনি অবধি পৌঁছানোর। আপনার উপস্থিতি এই পরিস্থিতিতে একান্ত কাম্য।

ইতি,

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র,

শশাঙ্ক।

পত্র হাতে নিয়ে চাণক্য কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর কপালে ভ্রূকুটি। শকুনি পর্বত্যকা রাজ্যে মলয়কেতুর মহলে যাতায়াত করলেও তা করে সম্পূর্ণ গোপনে, অতি সন্তর্পণে। সেটা তার স্থায়ী ঠিকানা নয়। তার সকল ক্রিয়াপ্রণালী সে নিয়ন্ত্রণ করে অন্য কোনো স্থান থেকে। এই কেন্দ্রস্থলটার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত শকুনির অন্ত সম্ভব নয়। কোন রাজ্যে বসে শকুনি তার চক্রান্ত সাজাচ্ছে তা জানা প্রয়োজন। এমন কোনো স্থান যেখানে সে সকলের নজরের আড়ালে থাকছে, অথচ আর্যাবর্তর সকল সংবাদ তার নখদর্পণে থাকে। অথচ গত দু-বছরে গোটা আর্যাবর্ত খুঁজেও এরকম কোনো স্থান পাওয়া যায়নি। একমাত্র সূত্র ছিল এই বাণ। চাণক্যর উদ্দেশ্য যদি এই সূত্র ধরে একবার শকুনির ধনুর্ধরকে বন্দি করা যায়, তবে তার থেকে শকুনির মুখ্য কার্যালয়ের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হবে।

এহেন অবস্থায় যদি বাবাক মগধের গুপ্তচরদের বজ্রমুষ্টি থেকে বেরিয়ে যায়, তবে গত দু-বছরের সকল প্রচেষ্টা বৃথা হয়ে যাবে।

পত্র জীবসিদ্ধিও পাঠ করেছে। সেও চাণক্যর মতোই বিস্মিত। নিজের মনেই জীবসিদ্ধি বলে উঠল,

– এটা কীভাবে সম্ভব? আগের পত্র থেকে তো মনে হয়েছিল শশাঙ্ক আর তার গুপ্তচররা সম্পূর্ণ সুরক্ষাবর্তে ঘিরে রেখেছে বাবাককে। তবে সে কীভাবে তাদের চোখে ধুলো দিল? মিত্র শশাঙ্ক মূর্খ নয়, বরং সে অতি চতুর। তবে?

চাণক্য মাথা নেড়ে বললেন,

এ হতে দেওয়া যায় না, জীবসিদ্ধি। আগামীকালই আমরা রওনা হব। সবচেয়ে দ্রুতগামী দুটো ঘোড়া তৈরি রাখতে বলো। মগধের সম্পূর্ণ সেনা এখানে রেখে আমরা দু-জন গান্ধারের উদ্দেশে যাত্রা করব।

- আর এখানকার পরিস্থিতি?

আগামীকালই যে কুলূতের প্রতিষ্ঠাদিবস। এবং, কালকেই এখানকার ঘটনাক্রমের শেষ ধাপ ঘটবে। আগামীকালই কুলূতের পতন হবে এবং মগধের সেনা দখল নেবে রাজধানীর। পরবর্তী পদক্ষেপ সেনাপতি নিজেই নিতে পারবেন। তার জন্যে আমাদের এখানে সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না।

বেশ। কিন্তু কী হতে চলেছে আগামীকাল গুরুদেব?

চাণক্য উত্তর না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলেন জীবসিদ্ধির দিকে। হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন জীবসিদ্ধির দিকে। তার কাঁধে হাত রেখে অদ্ভুত কণ্ঠে বললেন,

– নিজের গুরুকে ক্ষমা করো, জীবসিদ্ধি। আমি নিজের অজান্তেই তোমার জীবন বিপন্ন করে ফেলছিলাম। একটি সরল সত্য আমি এতদিন চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাইনি। কৌটিল্য বোধ হয় বাস্তবেই বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে হে, জীবসিদ্ধি।

জীবসিদ্ধি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল গুরুর দিকে। চাণক্যর মুখে এ ধরনের কথা কোনোদিন আগে শোনেনি জীবসিদ্ধি।

আপনি কী বলছেন, আচার্য? আমি অনুধাবন করতে পারছি না আপনার কথার অর্থ।

চাণক্য জীবসিদ্ধির চোখে চোখ রেখে বললেন,

তুমি কি এখনও বুঝতে পারছ না যে, কুলূতের এই গোটা চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য কী? কেন আমাদের এখানে ডেকে আনা হল আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে সেই অশুভ বাণটি পাঠিয়ে? কেন মহারাজ সুবর্মাকে এরকম অদ্ভুত কৌশলে মরতে হল? কেন মহারাজের ভূমিকায় তোমাকে অবতীর্ণ হতে বলা হল? কেন মলয়কেতু ফাঁকা সেনা ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করছে কুলূতের সীমান্তে? কেন এত মিথ্যা আমাদের চারিদিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে?

কেন বুঝতে পারব না? কারণটা অতি সরল। আপনাকে মগধের বাইরে এনে হত্যার চেষ্টা করতে এই গোটা চক্রান্ত রচনা হয়েছে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু-দিকে তীব্র অসন্তোষের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন চাণক্য। না হে জীবসিদ্ধি, না। এখানেই ভুল। গোটা চক্রান্ত আমাকে মগধের বাইরে বের করে আনার জন্যে করা হয়নি, জীবসিদ্ধি। এই জাল রচনা করা হয়েছে তোমাকে মগধের বাইরে আনতে! গোটা ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হল তোমাকে হত্যা করা! হ্যাঁ জীবসিদ্ধি, শকুনির লক্ষ্য আমি নই। শকুনির মূল লক্ষ্য তুমি! -

এত কম সময়ের ব্যবধানে জীবসিদ্ধি কখনো এতবার পর পর বিস্মিত হয়নি। তার মস্তিস্ক এইবার ধীরে ধীরে সমস্ত সূত্র যেন জুড়ে ফেলতে পারছে। একটা আবছা চিত্র ফুটে উঠছে তার মনে।

চাণক্য বললেন,

এইবার বুঝতে পারছ, জীবসিদ্ধি? সব প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার হচ্ছে কি? জীবসিদ্ধি শুধু দুটি শব্দ বলতে পারল,

- কিন্তু কেন? -

— কারণটা আমি বলেছিলাম বহু আগেই, জীবসিদ্ধি। আমি বলেছিলাম যে, তুমি শত্রুদের জন্যে ক্রমেই ভয়ানক হয়ে উঠছ। মগধের শক্তির যে কয়েকটি স্তম্ভ আছে তার মধ্যে একটি হল মগধের শক্তিশালী গুপ্তচর বাহিনী; যারা গোটা আর্যাবর্তর প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে আছে। ঠিক যেন কোনো অষ্টপাদ মাকড়সার জাল যার একটি সরু শাখায় সামান্য আলোড়ন হলেও তা জানতে পারে কেন্দ্রে বসে থাকা সদাসতর্ক অষ্টপাদ। সে থাকতে মগধ সুরক্ষিত! কারণ সে থাকতে দেশের শেষপ্রান্তে যদি কোনো বৃক্ষ থেকে একটি পত্রও অসময়ে খসে পড়ে, তা আমার ও চন্দ্রগুপ্তর কানে পৌঁছে যায় তোমার মাধ্যমে। সেই জালের একটি শাখা কেটে দিলেও লাভ হয় না কারণ অষ্টপাদটি সেই জাল আবার পুনরায় বিস্তার করে। অতএব এই জালকে অকার্যকর করার একমাত্র উপায় সেই জালের কেন্দ্রে থাকা মূল অষ্টপাদকে শেষ করা। মগধের এই গুপ্তচর বাহিনীর জাল যে তোমারই বিস্তার করা, জীবসিদ্ধি। তুমিই সেই জালের কেন্দ্রে থাকা সদাসতর্ক মাকড়সা। তাই তোমাকে সরাতে পারলে মগধকে চরম আঘাত করা যাবে! মগধের এই শক্তিশালী গুপ্তচর চক্র সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। অভেদ্য মগধ হয়ে পড়বে দুর্বল, জেয়!

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পদচালনা শুরু করল জীবসিদ্ধি। বিড়বিড় করে বলল,

বুঝতে পারছি। এইবার গোটা চিত্র পরিষ্কার হচ্ছে। গত বছর চন্দ্রগুপ্ত আর দুর্ধরার বিবাহের সময়ে পাটলিপুত্রে গিয়ে চিত্রবর্মা আমায় দেখে। আমার সঙ্গে তার অগ্রজ রাজা সুবর্মার চেহারার সাদৃশ্য তার চোখে পড়ে। পরবর্তীকালে শকুনির সঙ্গে তার যোগাযোগ হলে এই কথাটি শকুনিকে কথাপ্রসঙ্গে সম্ভবত বলে ফেলেছিল চিত্রবর্মা। আর সেই তথ্য জানতে পেরেই এই সুবিশাল ষড়যন্ত্র রচনা করেন আচার্য শকুনি। হত্যা করা হয় রাজাকে। সুকৌশলে ব্যবহার করা হয় সেই বিশেষ বাণ। শকুনির নির্দেশে মলয়কেতুর সেনা ছাউনি ফেলে কুলূতের সীমান্তে। এই কারণেই পত্রে আমায় আসার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল। আমরা ভাবি যে সত্যিই কুলূত বিপন্ন। আমরা এখানে এলাম এবং শকুনির জালে ধরা দিলাম।

হ্যাঁ, জীবসিদ্ধি। এবং, জেনো যে, নিশ্চিতভাবেই ঠিক যেভাবে রাজা সুবর্মাকে হত্যা করা হয়েছে, আগামীকাল সেভাবেই তোমাকেও হত্যা করার চেষ্টা করা হবে। এবং, তখনই আমরা এই খেলায় আমাদের শেষ দান দেব।

জীবসিদ্ধি পুনরায় বসে পড়ল। বলল,

– কিন্তু... কিন্তু আচার্য, আমি আজীবন অদৃশ্য থেকেছি। আমায় সকলেই শুধুমাত্র আপনার ছায়াসঙ্গী, আপনার অনুগত শিষ্য হিসাবেই জানে। আমায় শকুনি হত্যা করতে চাইছে, এর তাৎপর্য আপনি বুঝতে পারছেন?

মুখের ভাব গম্ভীর হল চাণক্যর। বললেন,

- হুমম। বুঝতে পারছি হে, জীবসিদ্ধি। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, শকুনি জানে যে, তুমিই মগধের গুপ্তচরদের প্রধান। যে তথ্য আমাদের অত্যন্ত কাছের বিশ্বস্ত কিছু ব্যক্তি ব্যতীত কারুর জানার কথা নয়। অর্থাৎ, আমাদের অত্যন্ত কাছের কেউ, বিশ্বস্ত কেউ শকুনির সঙ্গে যুক্ত!

২৯.

কুলূতের রাজধানী নাগর আজ আবার উৎসবের জন্যে সেজে উঠেছে। রাজমহল থেকে খবর এসেছে যে, মহারাজ সুবর্মা এখন অনেকটাই সুস্থ। মহলের বারান্দা থেকে প্রজাদের দেখা দেবেন। তাতে শত্রুদের কাছে এই বার্তা যাবে যে, তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কুলূত এখনও শত্রুদের জবাব দিতে পারে, কারণ তার রাজা এখনও জীবিত। তাই আজকে আবার মহল জুড়ে সাজো সাজো ব্যবস্থা।

তবে এইবার সুরক্ষাব্যবস্থার উপর আরও জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাঙ্গণের প্রতিটি কোণে, প্রাচীরের উপরে দু-হাত অন্তর দূরত্বে, সৈনিক মোতায়েন করা একটি হয়েছে। তারা সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে চলেছে চারিদিকে। তির ধনুক দূর, পক্ষী আকাশ থেকে নীচে নামলেও তা সৈনিকদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না। অতএব প্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।

আর কিছুক্ষণ পরেই উৎসব শুরু হবে। নাগরের জনগণের প্রাঙ্গণে আসা শুরু হয়ে গিয়েছে সকাল থেকেই।

জীবসিদ্ধির কক্ষে প্রবেশ করলেন চাণক্য। দু-জন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী জীবসিদ্ধিকে রাজবেশে সাজিয়ে তুলেছে। তার তদারকি করছেন স্বয়ং যুবরাজ চিত্রবর্মা ও মন্ত্রী শ্রীশৈল। জীবসিদ্ধির পরনে রেশমের বস্ত্র, স্বর্ণ অলংকার, মাথায় চেপেছে রাজার উষ্ণীষ।

তার মাথায় এখন শোভা পাচ্ছে কাঁধ অবধি নেমে আসা কাঁচাপাকা চুল, ঠোঁটের উপরে সরু গোঁফ। চাণক্যকে দেখে জীবসিদ্ধি হাসল।

চিত্রবর্মা চাণক্যকে দেখে বলে উঠলেন,

দেখুন আচার্য চাণক্য, আপনার শিষ্য কেমন রাজার ভূমিকায় সাবলীল - অভিনয় করছে।

এই কথায় চাণক্য নিজের মনে হাসলেন। জীবসিদ্ধি শুধু রাজার ভূমিকায় নয়, পৃথিবীর যেকোনো পেশার মানুষের ভূমিকাতেই সাবলীল অভিনয় করতে পারে। বাস্তবের ঝুঁকিপূর্ণ জীবনটাই একসময় তার রঙ্গমঞ্চ ছিল।

বাইরে দিনের দ্বিতীয় প্রহর শুরুর ঘণ্টা শোনা গেল। শ্রীশৈল বললেন,

সময় হল, মহাশয় জীবসিদ্ধি। এইবার চলুন ধীরে ধীরে বারান্দার দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। আপনি প্রস্তুত তো?

— হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।

আমি নিজে সুরক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ আয়োজন করেছি। তাই আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কোনো বাণের ক্ষমতা নেই আপনার অবধি পৌঁছানোর। আগেরবার যে অলৌকিক উপায়েই তা ঘটে থাকুক, এইবার তা হবে না। তবুও, আপনি যে আমাদের রাজ্যের স্বার্থে এতবড়ো ঝুঁকি নিচ্ছেন সে-কারণে আমরা আপনার কাছে অন্তর থেকে ঋণী।

চিত্রবর্মা যোগ দিলেন,

হ্যাঁ, জীবসিদ্ধি। আমি হৃদয়ের গভীর থেকে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। আসুন, আজকের এই উৎসব শুরু হওয়ার পূর্বে আমরা কুলূতের সৌভাগ্য কামনায় সোমরস পান করি।

জীবসিদ্ধি বলল,

কিন্তু মহারাজ, আমি আর গুরুদেব যে মদিরা পান করি না। তবে, আপনাদের শুভকামনায় দ্রাক্ষারস পানে আপত্তি নেই।

– বেশ, বেশ। আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।

বলে সাজিয়ে রাখা পানপাত্র দুটি তুলে নিয়ে চিত্রবর্মা চলে গেলেন। সকলের অলক্ষে চাণক্য ও জীবসিদ্ধি নিজেদের মধ্যেই দৃষ্টি বিনিময় করল।

শ্রীশৈল আবারও আশ্বস্ত করার জন্যে বললেন,

প্রত্যেককে আগে তল্লাশি করে তবেই মহলের প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার দেওয়া হচ্ছে। কারুর পক্ষেই, বাণ-ধনু তো দূরস্ত, একটি ছুরি পর্যন্ত নিয়ে প্রবেশ করা সম্ভব নয়, আচার্য।

কিছুক্ষণ পরেই দু-পেয়ালা উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারস এনে চিত্রবর্মা চাণক্য ও জীবসিদ্ধির হাতে তুলে দিলেন। প্রথমে চাণক্যর হাতে পেয়ালা তুলে দেওয়ার সময়ে চাণক্য ইচ্ছে করে তাঁর এগিয়ে দেওয়া হাত উপেক্ষা করে অন্য হাত থেকে অন্য পেয়ালাটি নিতে গেলেন, কিন্তু মুহূর্তে চিত্রবর্মা তার ডান হাতের পেয়ালাটি বাড়িয়ে দিলেন চাণক্যর হাতে। ঘটনাটা জীবসিদ্ধিও নজর করল। অর্থাৎ, শুধুমাত্র বাম হাতের পেয়ালাতেই বিষ আছে, যা শুধুমাত্র জীবসিদ্ধির জন্যেই বরাদ্দ। জীবসিদ্ধি নির্দ্বিধায় সেই পেয়ালাটি নিল।

দু-জন কর্মচারী ইতিমধ্যে কক্ষ ত্যাগ করেছে। চিত্রবর্মা এরপর নিজের এবং মন্ত্রীর জন্যে সোমরস ঢালতে, কক্ষের একপাশে রাখা পাত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। তখনই চাণক্য সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন করে শ্রীশৈলর নজর জীবসিদ্ধির দিক থেকে ঘুরিয়ে দিল। ঠিক সেই সুযোগেই মেজের উপর একটি ফুলদানের আড়ালে রাখা একটি দ্রাক্ষারস ভরতি পেয়ালার সঙ্গে জীবসিদ্ধি নিজের হাতের পেয়ালাটি বদলে ফেলল।

চাণক্য অনুমান করেছিলেন যে, এরকমই কিছু একটা করার চেষ্টা চিত্রবর্মা করবেন। কারণ, তিনি কর্মচারীদের থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে, প্রথমবারেও একই কাজ তিনি করেছিলেন। উৎসবের সূচনার আগে সকলে একসঙ্গে মঙ্গলকামনায় পান করেছিলেন। মানুষের প্রবৃত্তিই হল যে পথে একবার সাফল্য এসেছে, সেই পথই দ্বিতীয়বার অনুসরণ করা। কারণ তারা মনে করে একবার সফল হয়েছে মানেই তা বার বার হবে।

তাই পূর্বেই কক্ষে সাজিয়ে রাখা পানপাত্রের মধ্যে একটিতে দ্রাক্ষারস ভরে লুকিয়ে রেখেছে জীবসিদ্ধি। ঠিক করেই রেখেছিল যে, চাণক্য অথবা জীবসিদ্ধিকে পান করতে আমন্ত্রণ করলেই তারা দ্রাক্ষারস চাইবে সোমের বদলে। সোমরসের পেয়ালাও ইচ্ছে করেই কক্ষে শেষ কোণে রাখা হয়েছিল যাতে সেটি চিত্রবর্মা আনতে গেলে অন্তত কয়েক মুহূর্ত জীবসিদ্ধির দিক থেকে তাঁর নজর ঘুরে যায়, আর জীবসিদ্ধি তার হাতের দ্রাক্ষারসের পেয়ালা বদলে ফেলার সুযোগ পায়। জীবসিদ্ধির গোটা কক্ষটাই চাণক্যর সাজানো একটি নাটকের রঙ্গমঞ্চ।

চারজন নিজের পেয়ালা তুলে ঈশ্বরের উদ্দেশে মঙ্গলকামনা করল এবং পান করল। যতক্ষণ না জীবসিদ্ধি পেয়ালার সম্পূর্ণ পানীয় গলাধঃকরণ করল, ততক্ষণ চিত্রবর্মা তার উপর থেকে একবারের জন্যেও দৃষ্টি সরালেন না। পুরো পানীয় জীবসিদ্ধি পান করতে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। পান শেষে সকলে এগিয়ে গেল প্রাঙ্গণমুখী বারান্দার দিকে।

৩০.

কুলূতের প্রতিষ্ঠা দিবসের বার্ষিক অনুষ্ঠানে মেতে রয়েছে গোটা মহল। অনেক মানুষ এসেছে। আঞ্চলিক গীতি ও সেই তালে তালে নৃত্য প্রদর্শন, শারীরিক কলা প্রদর্শন, পুরস্কার বিতরণ ছাড়াও আরও হরেক অনুষ্ঠানে গমগম করেছে মহলের প্রাঙ্গণ। মহারাজকে বারান্দায় সুস্থ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সকলেই খুশি। তবে সৈনিকরা এরই মধ্যে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে সকলের উপর।

জীবসিদ্ধি রাজার পোশাকে দাঁড়িয়ে সব দেখছে এবং মাঝে মাঝে নীচে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। মাঝে মাঝে কয়েক বার জল চেয়েছে এবং গলা শুকিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে চিত্রবর্মাকে শুনিয়ে। হিসাবমতো আর কিছুক্ষণ বাদেই জীবসিদ্ধির অসুস্থ হয়ে ঢলে পড়ার কথা। চাণক্য আপাতত একটা বিষয় নিয়েই সন্দেহে আছেন। তাঁর উপস্থিতিতে জীবসিদ্ধির কাছে পৌঁছে চিত্রবর্মার পক্ষে তার শরীরে তির বিঁধিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সময়মতো চাণক্যকে সরিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেছে। সেটা কী হতে পারে তা চাণক্য অনুমান করতে পারছেন না।

অনুষ্ঠান যখন পূর্ণমাত্রায় পৌঁছেছে ঠিক সেইসময়েই কুলূতের এক সৈনিক বারান্দায় ঢুকে বলল,

– আর্য চিত্রবর্মা! মহলের ভেতরে একজন আগন্তুক ধরা পড়েছে! তার কাছে ধনুক আর কিছু অদ্ভুত আকারের বাণ পাওয়া গিয়েছে।

চিত্রবর্মা চেঁচিয়ে উঠলেন,

– সেকী? সেই লোক নিশ্চয়ই! এ-ই নিশ্চয়ই আমাদের কাঙ্ক্ষিত হত্যাকারী! তাকে এই মুহূর্তে বন্দি করে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন যে, আরও কোনো গুপ্তঘাতক মহলে প্রবেশ করেছে কি না।

একটু চুপ থেকে ইতস্তত করে চিত্রবর্মা বললেন,

– কিন্তু এই মুহূর্তে আমি বা মহারাজ উৎসব ছেড়ে যেতে পারি না। লোকের সন্দেহ হবে। অমাত্য শ্রীশৈল, আপনি আর আচার্য চাণক্য এই মুহূর্তে ওই গুপ্তঘাতককে জিজ্ঞাসাবাদ করুন! জীবসিদ্ধির সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

চাণক্য তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন,

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন কুমার। আমি এখুনি যাই, এ-ই নিশ্চয়ই সেই হত্যাকারী যাকে আমরা এতদিন ধরে খুঁজছি। চলুন, মহামাত্য মহাশয়! শীঘ্র চলুন! চাণক্য দ্রুত একবার জীবসিদ্ধির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে শ্রীশৈলকে নিয়ে বারান্দা ছেড়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। বারান্দায় রইল জীবসিদ্ধি এবং চিত্রবর্মা। তাদের থেকে বেশ কিছুটা তফাতে দাঁড়ানো জনাদশেক মগধ ও কুলূতের দেহরক্ষী সৈনিক।

চাণক্য শ্রীশৈলর সঙ্গে মহলের ভেতরে এলেন। চাণক্য জানেন নীচে গিয়ে যে ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে সে বেচারা সম্ভবত নিরীহ কোনো প্রজা যাকে অচেনা কেউ অর্থের লোভে ধনু-বাণ নিয়ে প্রবেশ করতে বলেছে। চিত্রবর্মা একাধিক বিষাক্ত বাণ রেখেছে সঙ্গে। তারই মধ্যে কিছু এই ব্যক্তির সঙ্গেও দিয়েছে। এই ধরা পড়া ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে কিছুই তথ্য পাওয়া যাবে না।

কিছুটা এগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শ্রীশৈলর হাত ধরে তাঁকেও দাঁড় করালেন। যে সৈনিকটির পিছু পিছু তাঁরা নামছিলেন চাণক্য তাকে নির্দেশ দিলেন,

-তুমি যাও। ওই আততায়ীকে বন্দি করে রাখো। তবে অকারণ প্রহার বা অত্যাচার কোরো না। আমরা পরে যাব।

সৈনিকটি কিছুটা অবাক হল এরকম নির্দেশে কিন্তু কিছু বলল না, চলে গেল। মন্ত্রী শ্রীশৈল অবাক হয়ে বলল,

আমরা যাব না, আচার্য? কুমার চিত্রবর্মা যে বললেন...

চাণক্য ততক্ষণে শ্রীশৈলকে টেনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললেন,

না, অমাত্য মহাশয়, এখন আমাদের বারান্দায় উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ এই আটক লোকটি এই নাটকের একটি সামান্য পার্শ্বচরিত্র মাত্র। মূল পর্বের যবনিকাপাত যেখানে হবে সেটা প্রত্যক্ষ করতে হবে তো। চলুন, চলুন! শীঘ্র চলুন। চরমক্ষণ আসন্ন!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা জীবসিদ্ধি তার উপর চিত্রবর্মার সতর্ক দৃষ্টি টের পাচ্ছে। যেভাবে শিকারি চতুষ্পদ তার শিকারকে লক্ষ রাখে সেভাবেই তার পতনের অপেক্ষা করছেন চিত্রবর্মা। ধীরে ধীরে জীবসিদ্ধি ও নিজের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনছেন, যাতে জীবসিদ্ধি পড়ে গেলেই তিনি সবার আগে পৌঁছে যান তার কাছে। কিন্তু খুব কাছে গেলে হবে না। ব্যবধান রাখতে হবে যাতে উপস্থিত মগধের সৈনিকরা বলে যে, জীবসিদ্ধির পতনের সময়ে তার কাছে চিত্রবর্মা ছিল না। তাঁর উপর কোনো সন্দেহ আসবে না।

প্রমাদ গুনছে জীবসিদ্ধি। এইবার...!



অসুস্থ হয়ে টলে গিয়ে ভারসাম্য হারানোর ভঙ্গিতে পড়ে গেল জীবসিদ্ধি। নীচে প্রাঙ্গণে উপস্থিত নাগরিক ও সৈনিকদের মধ্যে আলোড়ন উঠল। একদিকে কাত হয়ে বারান্দার মেঝেতে পড়ল। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই টের পেল চিত্রবর্মা তার কাছে এসে ঝুঁকে পড়লেন তার উপর।

চিত্রবর্মা দ্রুত নিজের অঙ্গাবস্ত্রের ভাঁজ থেকে লুকানো বিষাক্ত বাণ বের করে আনলেন। সৈনিকরা এসে পড়েছে প্রায়! অচৈতন্য জীবসিদ্ধির কণ্ঠ লক্ষ করে বাণ বসিয়ে দিতে গেলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে চিত্রবর্মা টের পেলেন তাঁর নিজের কণ্ঠে ধারালো ধাতব একটি স্পর্শ।

চিত্রবর্মা খেয়াল করলেন জীবসিদ্ধির চোখ খোলা, সম্পূর্ণ সজাগ এবং ডান হাতে একটি ছুরি ধরে আছে তাঁর গলায়। বিদ্যুদ্বেগে অন্য হাত দিয়ে জীবসিদ্ধি চেপে ধরল চিত্রবর্মার বিষাক্ত তির ধরা হাতটা। জীবসিদ্ধি শান্ত শীতল কণ্ঠে বলে উঠল,

খেলা শেষ, চিত্রবর্মা। কথা দিচ্ছি তোমার হাত সামান্য নড়লেই এই মুহূর্তটিই তোমার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত হবে।

প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই চিত্রবর্মার পেছন থেকে চাণক্যর গলা ভেসে এল,

কোনোরকমের চতুরতার চেষ্টা বৃথা হবে, কুমার। জীবিত থাকতে চাইলে হাত থেকে ওই অশুভ জিনিসটা ফেলে দিন।

চিত্রবর্মা ডান হাত আলগা করতেই বিষাক্ত বাণটা মেঝেতে পড়ল। চাণক্য ততক্ষণে চিত্রবর্মা আর জীবসিদ্ধির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পা দিয়ে বাণটা একদিকে সরিয়ে দিলেন। চিত্রবর্মা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। জীবসিদ্ধির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,

– কি… কিন্তু কীভাবে? বিষ তো প্রভাব বিস্তার করছিল।

হেসে উঠলেন চাণক্য। জীবসিদ্ধি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,

তোমার বিষ আমি পান করিনি। বার বার জল চাওয়া, অসুস্থ হওয়ার ভঙ্গি করা গোটাটাই অভিনয়। তুমি তো আমায় এখানে অভিনয় করাতেই ডেকে এনেছিলে, কুমার। আমি আর আচার্য শুধুমাত্র তার দৃশ্যটা নিজেদের মতো করে অভিনয় করেছি।

চিত্রবর্মার গলায় ততক্ষণে মগধের সৈনিকরা তরবারি ধরেছে। কুলূতের সৈনিকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীশৈলও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখে যাচ্ছে। চিত্রবর্মা পরিস্থিতি নিজের দিকে চালনা করার শেষ চেষ্টা করল। চিৎকার করে নিজের সৈনিকদের আদেশ দিল,

তোমরা দেখছ কী? নিজের ভাবি রাজাকে রক্ষা করো!

চাণক্য হাত তুলে কুলূতের সৈনিকদের উদ্দেশে বললেন,

- ইনিই তোমাদের মহারাজের হত্যাকারী। মহামাত্য শ্রীশৈল, আপনি আদেশ দিন সৈনিকদের। মহারাজের মৃত্যু হয়েছে এবং পরবর্তী রাজা যেহেতু ঘোষণা হয়নি, অতএব নিয়ম অনুযায়ী সেনা আপনার আদেশে চলবে। আপনি গোটা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

শ্রীশৈল হাত তুলে কুলূতের সেনাদের নিরস্ত করলেন। বললেন,

- অস্ত্র নামাও।

চিৎকার করে উঠলেন চিত্রবর্মা,

– বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না, শ্রীশৈল! আমিই তোমার যুবরাজ!

শ্রীশৈল চাণক্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

কী হচ্ছে আমি কিছুটা অনুমান করতে পারলেও পুরোটা বুঝতে অক্ষম, আচার্য। কী ঘটছে এখানে? কেন কুমার জীবসিদ্ধিকে হত্যা করতে চাইছিলেন?

চাণক্য বললেন,

আপনাকে, অমাত্যদের ও কুলূতের সেনাপতিকে আমি সকল কথা বুঝিয়ে বলব। সকলকে এখানে উপস্থিত হতে বলুন। কিন্তু তার আগে, মগধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে, মহারাজ সুবর্মা ও বৈদ্য চক্রাচার্যকে হত্যার অভিযোগে এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর মিত্র জীবসিদ্ধিকে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে চিত্রবর্মাকে মগধ বন্দি করল।

কুলূতের সকল অমাত্য ও সামন্তরা হাজির হলে চাণক্য তাদের সকলকে গোটা ঘটনা শুরু থেকে বুঝিয়ে বললেন। অবশ্যই জীবসিদ্ধিকে হত্যার আসল উদ্দেশ্যের কথাটা সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন ব্যাখ্যা দেওয়ার সময়ে। সবশেষে চাণক্য বললেন,

আরও একটি তথ্য আপনাদের জানিয়ে রাখি। মগধের সেনা এই মহলের চারিদিক ঘিরে ফেলেছে এবং মহলের অন্দরেও তারা উপস্থিত। অতএব আমরা চাইলে এখুনি কুলূতের পতন হবে। মগধ নিজের মৈত্রীধর্ম পালন করতে কুলূতের সাহায্যে সেনা পাঠিয়েছে। কিন্তু মগধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমরা কুলূতকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতেই পারি। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র কুলূতের থেকেও তাদের প্রিয় মহারাজ সুবর্মাকে কেড়ে নিয়েছে। তাই মগধ আর কুলূত উভয়েই চিত্রবর্মার এই ষড়যন্ত্রের শিকার। একজন ব্যক্তির অধার্মিক আচরণে আমি চাই না মগধের সঙ্গে কুলূত সংঘাতে যাক। আমি চাই কুলূত সসম্মানে মগধ সাম্রাজ্যের অংশ হোক। কথা দিচ্ছি কুলূতকে বঞ্চিত করা হবে না।

চাণক্যর প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া, কুলূতের কারুর আপত্তির কারণ বা উপায় কোনোটাই ছিল না। অতএব মন্ত্রী পরিষদ ইচ্ছায় হোক বা বাধ্যতায়, সম্মতি জানাল রাজসভায়।

সভাশেষে সকল মন্ত্রী, অমাত্য রাজসভা ত্যাগ করল। শুধু চাণক্য, জীবসিদ্ধি এবং শ্রীশৈল রয়ে গেল। মাথায় হাত দিয়ে বৃদ্ধ শ্রীশৈল বললেন,

আমি এখনও ভাবতেই পারছি না। এত গভীর ষড়যন্ত্র? সত্যি বলতে সুবর্মার সঙ্গে চিত্রবর্মার বহুদিন ধরেই মতভেদ চলছিল। প্রজারাও চিত্রবর্মাকে পছন্দ করে না। মহারাজের হত্যার নেপথ্যে যে সে থাকতেও পারে এরকম একটা সম্ভাবনা যে আমার মনে ছিল না তা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে আমি নিরুপায় ছিলাম। -

চাণক্য কিছুক্ষণ চুপ করে শ্রীশৈলর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। নিজের কেশশিখায় হাত বুলিয়ে বললেন,

– হুমম। কুলূত পর্ব তবে শেষ হল। আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই আমি আর জীবসিদ্ধি রওনা হব। কিন্তু সব রহস্যের যখন সমাধান হয়েই গেল, তখন আপনিই-বা বাকি থাকেন কেন? স্বীকারোক্তি করেই ফেলুন মহামাত্য মহোদয়। জীবসিদ্ধি বিস্মিত হল, কীসের কথা বলছেন চাণক্য? কিন্তু শ্রীশৈলর দিকে চোখ পড়তেই জীবসিদ্ধি দেখল বৃদ্ধর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধ আমতা আমতা করে বললেন,

আমি... কী বললেন... মানে বুঝলাম না, মহামতি?

চাণক্য ঠোঁটের একপাশে হাসি এনে বললেন,

– কেন অস্বীকার করছেন, মহাশয়? আপনি ভালো করেই জানেন আমি কীসের কথা বলছি। আপনি কি বাস্তবে ভেবেছিলেন যে, আমি ভুলে গিয়েছি এত বড়ো একটা ঘটনা? আপনি ছাড় পেয়ে যাবেন? আপনি নিশ্চয়ই জানেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জানতে পারলে এই অপরাধের শাস্তি কী বরাদ্দ করবেন।

বৃদ্ধ আসন ছেড়ে ভূমিতে বসে চাণক্যর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

– আমায় ক্ষমা করুন, আচার্য! বড়ো ভুল করে ফেলেছি! আমার উপায় ছিল না, আচার্য! রাজা সিন্ধুসেনা আমায় জোর করে এই কাজ করিয়েছিল!

জীবসিদ্ধি বিস্মিত হয়ে চাণক্যর কাছে জানতে চাইল,

–– আচার্য, কী হচ্ছে এটা? কীসের অপরাধের কথা বলছেন অমাত্য?

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

- আমাকে হত্যার চেষ্টায় সিন্ধুপ্রদেশের রাজা সিন্ধুসেনার সঙ্গে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ হে, জীবসিদ্ধি। বলেছিলাম না? এই কাজ চিত্রবর্মার নয়, অন্য কারুর। চিত্রবর্মা ব্যতীত

প্রধানামাত্য ছাড়া আর কেই-বা পারে গভীর রাতে মহলের অন্দরে গুপ্তঘাতকের প্রবেশপথ করে দিতে গোপনে?

শ্রীশৈল চাণক্যর কাছে হাতজোড় করে বললেন,

– আমি জানতাম না, আচার্য। রাজা সিন্ধুসেনা আমায় একবারও বলেনি যে, সে আপনাকে হত্যা করতে লোক পাঠিয়েছে। সে বলেছিল যে, আপনার কাছে সে গোপনে রাত্রিবেলা দূত মারফত জরুরি পত্র পাঠাবে। তাই আমি রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু পরের দিন যখন জানতে পারলাম যে, আপনাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে সেরাত্রে, তখন ভয়ে আমি আর সেকথা স্বীকার করতে পারিনি, মহামতি চাণক্য। আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন, আচার্য! আমি ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে।

চাণক্য কিছুক্ষণ ভাবলেন। যদিও জীবসিদ্ধি বুঝতে পারল চাণক্য শুধুমাত্র ভাবার ভঙ্গি করছেন। জীবসিদ্ধি নিশ্চিত যে চাণক্য পূর্বেই পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করে রেখেছেন। চাণক্য বললেন,

– বেশ, উঠুন অমাত্য। আপনি যেহেতু বলছেন যে, আপনি জানতেন না সিন্ধুসেনার প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাই আপনার এই অপরাধ এই একবারের জন্যে আমি মার্জনা করে দিতে পারি। কিন্তু তার বদলে আপনাকে মগধের অধীনে কাজ করতে হবে, অমাত্য। শপথ করুন নিজের পূর্বপুরুষদের নামে যে, আপনি মগধের অনুগত থাকবেন আজীবন।

– আমি নিজের পূর্বপুরুষের, আমার সন্তানদের নামে শপথ করছি, আচার্য।

- হুমম। তবে ক্ষমা করলাম আপনাকে। আপনার অপরাধের কথা আমার ও জীবসিদ্ধির মধ্যেই থাকবে। শুধু তাই নয়, আপনাকে মগধের প্রতিনিধি হিসাবে কুলূতের শাসনভার দিলাম। মগধের অন্যান্য প্রতিনিধি ও সামন্তরা আপনাকে একাজে সাহায্যে করবে। মগধের আদেশ অনুযায়ী কাজ করলে কুলূত সুরক্ষিত থাকবে।

– বেশ, আচার্য। তাই হবে।

হুমম। আপনি আসতে পারেন। তবে যাওয়ার আগে একটা কথা মনে রাখবেন, শ্রীশৈল। মগধের সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা আপনি বা আপনার কোনো মন্ত্রী করলে কিন্তু আপনার অপরাধের কথা মগধাধিপতি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর কানে পৌঁছে যাবে। আমার শিষ্যরা আবার আমায় নিয়ে একটু বেশিই রক্ষণশীল। তাই এই কথা সম্রাট জানতে পারলে তিনি সম্ভবত শত্রু-মিত্র বিচার নির্বিশেষে গোটা কুলূত রাজ্যকে ধূলিসাৎ করবে। এই ধ্বংসের জন্যে কিন্তু আপনি দায়ী থাকবেন। অতএব, আশা রাখি আপনি আগামীতে এই সম্ভাবনা বিচার করেই প্রতিটি পদক্ষেপ নেবেন। ধন্যবাদ।

৩১.

মলয়কেতু আখেটে বেরিয়েছে। জঙ্গালের মধ্যে তার একটি প্রমোদ প্রাসাদ আছে। সেখানে একদল সৈন্য নিয়ে সে আপাতত থাকছে। তবে আখেটের চেয়ে সে বেশি উৎসাহী এখন অন্য একটি বিষয়ে। সেটি হল— পদ্মা। পদ্মা মেয়েটির মধ্যে কী যেন জাদু আছে। মলয়কেতু রাজা হয়েও সেই মেয়েটিকে এখনও নিজের সম্পূর্ণ বশে আনতে পারেনি। তার আর পদ্মার মধ্যে যেন এক প্রেমময় ধরা-ছোঁয়া খেলা চলে। মলয়কেতু এই খেলা খুবই উপভোগ করছে। মলয়কেতুর দুই রানি বিষয়টা ভালো চোখে দেখছেন না। কারণ তাঁদের মনে আশঙ্কা যে, স্বামীর যা মতিগতি তাতে শীঘ্রই সম্ভবত ওই স্ত্রীলোক ছলে ভুলিয়ে রানি হয়ে বসবে। নিজেদের সম মর্যাদা এক কুলহীন নর্তকীকে তাঁরা দিতে নারাজ।

পদ্মা দুই রানির সর্বক্ষণের বিষদৃষ্টি থেকে বাঁচতেই যখন মহারাজকে প্রস্তাব দিল যে, এই মহল ছেড়ে, কয়েক দিনের জন্য যদি অন্য কোথাও যাওয়া যায় মলয়কেতু সে-সুযোগ লুফে নিয়েছে। আখেটে সে সৈন্য, অস্ত্র ছাড়াও সঙ্গে নিয়েছে পদ্মাকে।

আজকেও ভোরবেলায় শিকারে বেরিয়েছে মলয়কেতু। তার রথে তার সঙ্গেই পদ্মাও আছে। গত দু-দিনও সে ছিল। নিরীহ বন্যপ্রাণীদের হত্যা করে নিজের বীরত্ব দেখিয়ে নারী হৃদয়কে প্রভাবিত করার সুযোগ মলয়কেতু ছাড়েনি।

আখেট অতি বিপজ্জনক তোমার মতো একজন কোমল নারীর পক্ষে, প্রিয়ে।

মলয়কেতুর এই কথায় পদ্মা মলয়কেতুর হাত চেপে ধরে উত্তর দিয়েছিল, পঞ্চনদের সবচেয়ে শক্তিশালী বীর সম্রাটের সঙ্গে থাকলে আমার কীসের ভয়?

দিনের প্রথম প্রহর শেষের দিকে। কিন্তু আজ শিকার সেভাবে পায়নি মহারাজ মলয়কেতু। আসলে তার মন আজ শিকারে নেই। তার রাজধানী থেকে সংবাদ এসেছে গতকাল। সিন্ধুসেনা তার সৈন্যদের সমরের জন্যে তৈরি করেছে। তারা রাজধানী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে গতকালই।

মলয়কেতুর বারংবার সেই বোবা গুপ্তচরটির কাছ থেকে পাওয়া পত্রের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সিন্ধুসেনার পত্রে 'কেতু' নামে উল্লেখ করা ব্যক্তি যে চাণক্য সেটা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল। সিন্ধুসেনা পত্রে ইঙ্গিত দিয়েছিল যে কেতুকে কুলূতেই হত্যা করবে সে। চাণক্যর উপর গুপ্তঘাতকের যে আক্রমণ হয়েছিল সেসংবাদ মলয়কেতুর কানে

এসেছে ইতিমধ্যে। সব যে মিলে যাচ্ছে! ওই শকুনি, রাক্ষস, আর সিন্ধুসেনা মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এ ধারণা প্রতিমুহূর্তে তার মনে আরও মজবুত শেকড় গজিয়ে চলেছে। কিন্তু মলয়কেতু হয়তো পর্বতেশ্বর পুরুর মতো বীর নয়, কিন্তু সে এখনও পঞ্চনদ ভূভাগের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। সে জীবিত থাকতে কি সিন্ধুসেনা তার নগরে আক্রমণ করার বোকামি করবে? শকুনি কি তবে রাত্রির অন্ধকারে দুর্গের প্রবেশদ্বার খুলে দিয়ে শত্রুদের ঢোকার পথ করে দেবে? কিন্তু তাহলে শকুনি কেন চাইছে যেন চাণক্যর হত্যা না করা হয়? মহামাত্য সুদীপ্তক তাঁকে বলেছেন অগ্র-পশ্চাৎ বিচার না করে কোনো নির্ণয় না নিতে। কিন্তু চিত্ত বিচলিত হয়ে আছে মলয়কেতুর।

গহিন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে রথ ছুটছিল মলয়কেতুর। সামনের দিকে একদল সৈনিক জঙ্গল কেটে তার এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিচ্ছে। তবে গতি মন্থর হয়েছে এখন সেই কারণে। রথে দাঁড়িয়ে, জঙ্গালের দিকে দৃষ্টি রেখে মলয়কেতু এগিয়ে চলেছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে পদ্মা। হঠাৎই একটা ঘটনা ঘটল যার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না।

একটি বড়ো, ঝুরিনামা গাছের পাশ থেকে রাজার রথ বেরোনোর সময়ে হঠাৎই পদ্মা চেঁচিয়ে উঠল,

মহারাজ! গাছের পাতার ফাঁকে ওটা কী?

পরমুহূর্তে উপরের গাছের ডাল থেকে একটি মানুষের শরীর ঝাঁপিয়ে নেমে এল মহারাজের রথে! আশেপাশের সৈনিকরা কিছু করে ওঠার আগেই সেই বিশালদেহী কৃষ্ণবর্ণ লোকটি একটি বড়ো তরবারি তুলে নামিয়ে আনল মলয়কেতুর গলা লক্ষ করে!



কিন্তু সেই তরবারি মলয়কেতুর গলার বদলে হাতে এসে বসল। কারণ সঠিক সময়ে ধাক্কা দিয়ে মলয়কেতুকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে পদ্মা! হিংস্র ভঙ্গিতে, ‘ভীমার কাজে বাধা দিস না! সরে যা বেশ্যা!’ বলে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। একধাক্কায় পদ্মাকে ছিটকে ফেলে দিল রথ থেকে এবং পুনরায় তরবারি তুলে নিল রাজার উপর আঘাত করার জন্যে।

– জয়, মহারাজ সিন্ধুসেনার জয়!

জয়ধ্বনি দিয়ে তরবারি নামিয়ে আনা হাতটা কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল। কারণ ততক্ষণে রাজার সঙ্গে থাকা সৈনিকদল আচমকা আঘাতের ঘোর কাটিয়ে সতর্ক হয়ে পড়েছে। তিনটি বাণ একসঙ্গে এসে বিঁধল ভীমার শরীরে! যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ভীমা। কিন্তু তার শরীরে আসুরিক শক্তি বরাবরই। তাই আরও একবার কাঁপা হাতেই তরবারি চালাল সে মলয়কেতুকে লক্ষ করে। কিন্তু মলয়কেতু সহজেই সেই আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, তরবারি ঢুকিয়ে দিল ভীমার পেটে। কিছুক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল ভীমা। যেন সময় থেমে গিয়েছে কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই রথ থেকে গড়িয়ে পড়ল ভীমার প্রাণহীন দেহ। ছুটে এল সৈনিকরা।

মহারাজ! আপনি ঠিক আছেন তো?

মলয়কেতুর হাতের আঘাত যথেষ্ট গভীর। খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে তার। কিন্তু মুখে বীরত্ব ফুটিয়ে বলল,

—আমি ঠিক আছি। কিন্তু... কিন্তু পদ্মা কই? পদ্মা, তুমি ঠিক আছ তো? পদ্মা তখন উঠে বসেছে। শরীরে ধুলো লেগে গিয়েছে। রথ থেকে পড়ে গিয়ে হাতের চামড়া ছড়ে গিয়েছে।

রথ থেকে নেমে মলয়কেতু এগিয়ে গেল পদ্মার দিকে। তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে আলিঙ্গন করল। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলল,

তুমি আমার জীবন রক্ষা করলে, প্রিয়ে! সঠিক সময়ে তুমি আততায়ীকে দেখতে না পেলে, আমায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে না দিলে আমার নিয়তিতে আজ নিশ্চিত মৃত্যু লেখা ছিল। পদ্মা, বলো তুমি কী চাও? যা চাইবে পর্বত্যকা মলয়কেতু তোমায় আজ তাই দেবে! না না, তুমি চাইবে কেন? আমিই দেব! তুমি হবে আমার রানি!

পদ্মা কাঁপা কণ্ঠে বলল,

– কিন্তু মহারাজ, এ কে ছিল? কে আপনাকে হত্যা করতে ঘাতক পাঠিয়েছে? দাঁতে দাঁত চেপে মলয়কেতু বলল,

— সিন্ধুসেনা! সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করেছে! সম্মুখসমরে আমার সেনার সঙ্গে যুদ্ধে সে পারবে না জেনেই এভাবে আমায় আগেই পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সে! এর সাজা সে পাবে! প্রত্যেকে পাবে!

আখেট— শিকার।

পঞ্চনদ অঞ্চল— ভারতের উত্তর অংশ যেখানে পাঁচটা নদী বয়ে গিয়েছে।

৩২.

শুকনো কাঠ, পাতা জড়ো করা আগুনে হাত সেঁকছে জীবসিদ্ধি। আগুনের গা ঘেঁষে, মুখোমুখি উলের দুটি আলোয়ানে আপাদমস্তক ঢেকে জবুথবু বসে আছেন চাণক্য। দূরে কোথাও জংলি পশু ডেকে উঠল।

চাণক্য ও জীবসিদ্ধির সঙ্গে আরও জনা কুড়ি সৈনিক গত কয়েক দিন যাত্রা করে এখন তারা গান্ধারের সীমানায় আছে। চাণক্যর ইচ্ছে ছিল শুধু ওঁরা দু-জন যাত্রা করবেন। কিন্তু এই ঠান্ডায় গরম পোশাক, তাঁবু ইত্যাদি ছাড়া দীর্ঘ পথ যাত্রা সম্ভব নয়। অতএব মগধের কয়েক জন সৈনিককে সঙ্গে নিতে হয়েছে। আজকে রাত্রের মতো তারা তাঁবু গেড়েছে একটি ছোটো পাহাড়ের পাদদেশে। উত্তর থেকে বইতে থাকা হিমেল হাওয়ার তীব্র ঠান্ডার থেকে পাহাড়টা তাদের কিছুটা আড়াল দিয়েছে।

চাণক্যর দিকে তাকিয়ে জীবসিদ্ধি বলল,

অদূরেই জঙ্গল, আচার্য। সাবধানে থাকবেন রাত্রে। পাহাড়ি নেকড়ে বা অন্য কোনো বন্যজন্তু আপনার সঙ্গে নীতিশাস্ত্র আলোচনা করতে আসতে পারে। চাণক্য শিষ্যের বক্রোক্তি উপেক্ষা করে উত্তর দিলেন,

রাতকীটদের ডাক শুনতে পাচ্ছ তো চারদিকে? বন্যজন্তুর আগমনে তাদের এই ডাক থেমে যাবে। কীটদের শব্দ কোনোদিক থেকে থেমে গেলেই সতর্ক হবে। আগুন একটু কমে গিয়েছে দেখে আগুনে আরও কিছু শুকনো কাঠ ফেলে দিল জীবসিদ্ধি।

গত দু-বছরের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার গান্ধার যাচ্ছি আমরা। যদি সময় থাকে তবে কি একবার তক্ষশিলা হয়ে যাবেন নাকি, আচার্য? প্রধানাচার্য আপনাকে দেখলে খুশি হবেন।

হুমম।

- আচার্য, আপনার কী মনে হয়? ওই অস্ত্রনির্মাতা বাবাক কি গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়েছে?

- মনে হয় না সে পালাতে সক্ষম হয়েছে। গোটা গ্রাম ঘিরে রেখেছে মগধের সৈনিক। আমার ধারণা তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

— কিন্তু তার উপর তো ছদ্মবেশে নজর রাখা হয়েছিল। তবে শকুনি কীভাবে জানল সেকথা?

— হয় বাবাক অথবা তার পুত্রের থেকেই জেনেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু হঠাৎ একজন ক্রেতাকে রক্ষা করতে পিতা-পুত্র কেন রাজদ্রোহের ঝুঁকি নেবে?

— কিন্তু সে-ব্যক্তির পুত্র তো গ্রামে রয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে শশাঙ্ক। সে নিজেও নিরুদ্দিষ্ট পিতাকে খুঁজছে।

হুমম। পিতা তার পুত্রকে ছেড়ে একা পালিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। তাই সম্ভাবনা আছে যে তাকে শকুনি জোর করে অপহরণ করেছে। কিন্তু কোন উপায়ে তা সম্ভব সেটা পত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

অর্থাৎ, এক জটিল রহস্যের সমাধান হতে-না-হতেই দ্বিতীয় একটি রহস্য এসে উপস্থিত হল।

ওহে জীবসিদ্ধি, বিশ্বের সকল রহস্যই জটিল থাকে, যতক্ষণ না তার

সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। একবার সমাধান পাওয়া গেলেই সব সরল মনে হয়। আরও একটা প্রশ্ন আমার মনে রয়ে গিয়েছে, আচার্য। কুলূতের উপর আক্রমণের আশঙ্কা যখন আর নেই এবং কুলূত আমাদের বশ্যতা স্বীকার করেই নিয়েছে, তবে কেন আমরা মগধের বিশাল সেনা সেখানেই রেখে এলাম? অন্তত অর্ধেক সেনা কি মগধে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়াই সমীচীন ছিল না?

মৃদু হেসে চাণক্য বললেন,

প্রয়োজন আছে, জীবসিদ্ধি। যথাসময়ে জানতে পারবে।

জীবসিদ্ধি কিছুক্ষণ চুপ করে

আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, - গান্ধার বরাবরই আর্যাবর্তর অন্যতম জরুরি একটি অঙ্গ। তার কারণ গান্ধার হল এই দেশের প্রবেশদ্বার। এখানে গোপনে মগধের গুপ্তচর নিযুক্ত করার আদর্শ স্থান হল বিশ্ববিদ্যালয়।

চাণক্য জীবসিদ্ধির কথার ইঙ্গিত ধরেই বললেন,

— হুমম। কিন্তু তুমি তো জানোই এই বিষয়ে প্রধানাচার্যের অভিমত কী। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির ঘোর বিরোধী। তিনি কিছুতেই আমাদের গূঢ়পুরুষদের নিজের বিহারে স্থান দেবেন না।

— ওই কারণেই বলছিলাম, যদি আবার একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আপনি নিজে কথা বলে আচার্যপ্রমুখকে রাজি করাতে পারেন।

— না হে, জীবসিদ্ধি। কোনো লাভ হবে না তাতেও। তুমি তো জানোই আচার্য কতটা জেদি ও একরোখা মানুষ। তিনি একবার যখন ঠিক করেছেন যে, তাঁর শিক্ষাস্থানে রাজনীতির প্রবেশ নিষেধ, তখন তিনি তাতেই অটল থাকবেন। জীবসিদ্ধি কিছুক্ষণ ভেবে বলল,

আমায় এই কথাটা বলার জন্যে মার্জনা করবেন। কথাটা আমি তাঁকে কোনোরকম অসম্মান না জানিয়েই বলছি। কিন্তু, যদি আমি প্রধানাচার্যকে না জানিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হিসাবে নিজের কোনো গুপ্তচরকে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করি? -

চাণক্য ক্ষীণ হেসে বললেন,

প্রধানাচার্য ভদ্রভট্ট আমার নিজের গুরু ছিলেন। আমার যা কূটনীতির শিক্ষা তিনিই আমায় প্রদান করেছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছে বলে একবারও এই ভ্রান্ত ধারণা মনে এনো না জীবসিদ্ধি, যে, তাঁর মস্তিষ্ক অচল। তোমার গুপ্তচররা ঠিকই ধরা পড়ে যাবে। তিনি একজন মহান শিক্ষক যিনি বিদ্যাদানকেই নিজের একমাত্র ব্রত করেছেন এবং কোনোদিন সক্রিয় রাজনীতিতে আসেননি। কিন্তু বৃদ্ধের মস্তিষ্ক আজও ক্ষুরধার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দু-বছর আগে তিনিও ধূমে মেশানো মাদকের প্রভাবে না থাকলে নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌতিক রহস্যের সমাধান করে ফেলতেন। আমার সাহায্যের তাঁর প্রয়োজন পড়ত না যদি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতেন।

জীবসিদ্ধি হতাশ ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চাণক্য আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,

- - রাত্রি গভীর হল, জীবসিদ্ধি। চলো, যে যার তাঁবুতে ফেরা যাক। কালকে সকালে আশা করি শশাঙ্কর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

***

প্রায় এক যোজন পথ পরের দিন সকালে অতিক্রম করে নির্দিষ্ট গ্রামের সীমানায় পৌঁছাল চাণক্য ও জীবসিদ্ধিসহ ছোট্ট দলটি। সীমানায় তাঁদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষায় ছিল শশাঙ্ক।

ছদ্মবেশের প্রয়োজন ফুরিয়েছিল তাই এখন তার পরনে সম্পূর্ণ রাজআধিকারিকের পোশাক। অঙ্গাবস্ত্রের রং তার উচ্চ পদমর্যাদার ইঙ্গিত করছে।

চাণক্যর সবচেয়ে কাছের ছয় ছাত্রের একজন সে। শশাঙ্কর হাতের একটি বিশেষ বালা সেই ইঙ্গিত বহন করে।

চাণক্য ও জীবসিদ্ধিকে দেখে শশাঙ্ক হাসিমুখে এগিয়ে গেল। প্রথমে নিজের গুরুদেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল এবং তারপর প্রিয় মিত্র তথা গুরুভ্রাতা জীবসিদ্ধিকে আলিঙ্গান করল।

- কেমন আছ, ভ্রাতা? প্রায় দেড় বছর পর সাক্ষাৎ হল তোমাদের সঙ্গে। চন্দ্র কেমন আছে?

জীবসিদ্ধি উত্তর দিল,

আমরা সকলেই ভালো আছি, ভ্রাতা। চন্দ্রগুপ্তও দাম্পত্য জীবন উপভোগ করছে তোমারই মতো। তোমার স্ত্রী এবং সদ্যোজাত কন্যাসন্তান কেমন আছে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে শশাঙ্ক বলল,

কী আর বলি, মিত্র। কন্যার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদটুকু পেয়েছি মথুরা থেকে। জানিয়েছে স্ত্রী ও কন্যা সুস্থ আছে। কন্যাকে চোখেও দেখার সুযোগ আমার হয়নি। কারণ তখন আমি এখানে। ভেবেছিলাম এদিকের কাজ মিটে যাবে শীঘ্র। কিন্তু অদৃষ্ট দেখো, সমস্যা সমাধান হওয়ার পরিবর্তে আরও জটিল হয়ে গেল। কিন্তু তুমি কবে বিবাহ করবে হে, জীবসিদ্ধি? গুরুদেব, আমার একটি অনুরোধ আছে।

- বলো, শশাঙ্ক।

আমার কন্যার নামকরণ আমি চাই আপনি করুন। আমার এই অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে, আচার্য।

চাণক্য হেসে বললেন,

- এ আমার পরম সৌভাগ্য, শশাঙ্ক।

আরও দু-এক কথা আলাপচারিতা করতে করতেই গ্রামে প্রবেশ করল তারা। একদল সেনা এখানে ছাউনি ফেলেছে। চাণক্য ও তার সফরসঙ্গী সৈনিকদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা ছিল আগেই।

জীবসিদ্ধি আর চাণক্যকে একটি তাঁবুতে এনে শশাঙ্ক বলল,

দীর্ঘ পথ যাত্রায় আপনারা ক্লান্ত। কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নিন আগে। চাণক্য আপত্তি করলেন,

বিশ্রাম নিতে আমরা আসিনি, শশাঙ্ক। কে বলতে পারে হয়তো তোমার সুরক্ষাবলয় ভেদ করে ইতোমধ্যে বাবাক লোকটি পলাতক হয়েছে। এবং, প্রতি মুহূর্তের বিলম্বে আমাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

শশাঙ্ক কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে বলল,

– না, আচার্য। আমি নিশ্চিত গ্রামের সীমানা সে পার করতে পারেনি। এমনিতেই আমার সৈনিকরা প্রতিটি প্রবেশপথে নজর রেখেছিল প্রথম থেকেই। বাবাক নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই গোটা গ্রাম আমরা ঘিরে ফেলি। গত কয়েক সপ্তাহ কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেওয়া হয়নি। সে নিঃসন্দেহে এই গ্রামেই কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই গ্রামটি বড়ো এবং অনেক বাসিন্দার বসবাস এখানে। তাই সম্পূর্ণ গ্রাম অন্ধের মতো খুঁজে দেখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া সেটা করতে যে লোকবল লাগবে, তা আমাদের নেই। আমাদের নজর এড়িয়ে কীভাবে যে নিজের গৃহ থেকেই অদৃশ্য হল... সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন।

চাণক্য বললেন,

এরকম না, গোড়া থেকে বলো, শশাঙ্ক।

বলব। বলব বলেই তো আপনার সাহায্য চাইলাম, আচার্য। কিন্তু আপনারা আগে একটু বিশ্রাম নিন। আমি আগামী প্রহর শুরু হতেই আসব। তখন আলোচনা করা যাবে। কিন্তু তার আগে আমায় কুলূতের সমস্ত ঘটনার কাহিনি শোনান আপনারা। -

শশাঙ্ক গুরুদেবের খাদ্যরুচির কথা মাথায় রেখেই চাণক্যর সম্মুখে গুড় মেশানো এক পেয়ালা ধূমায়িত দুধ রেখেছে। সে নিজে ও জীবসিদ্ধিও দুধের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে, তবে বলা বাহুল্য তাতে গুড়ের পরিমাণ চাণক্যর পেয়ালার এক চতুর্থাংশ। চাণক্য তৃপ্তি সহকারে চুমুক দিয়ে কিছুটা দুধ পান করে শশাঙ্ককে বললেন,

- গোটা ঘটনা খুলে বলো, শশাঙ্ক। অতি সামান্য কোনো বিষয়, তা যতই গুরুত্বহীন মনে হোক, সেটাও উহ্য রেখো না।

শশাঙ্ক গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ সারাদিন শুধু এই বিষয়েই ভেবেছে। অতএব ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

বাবাকের গৃহে শুধু সে আর তার পুত্র থাকে। তার স্ত্রী বহু বছর পূর্বে গত হয়েছে। গৃহেই তার নিজস্ব অস্ত্র নির্মাণের কর্মশালা যেখানে বাবাক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অস্ত্র বানিয়ে থাকে। সে নিজেই কারিগর এবং তার পুত্র পিতাকে সাহায্য করলেও সে নিজে কারিগরি এখনও শিখে উঠতে পারেনি এই কথা সে নিজেও স্বীকার করেছে এবং গ্রামের অন্যদের থেকেও তার কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। এই ছেলেটির নাম বিধোরক।

কমবুদ্ধি, সহজ, সরল বছর কুড়ি-একুশের যুবক। কাজ বলতে বাবার কাজে সাহায্য আর মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়তে কাজ করে সামান্য আয় হয়।

পিতা-পুত্র যে কুটিরে থাকে সেটার বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। যদিও আপনি স্বচক্ষেও দেখবেন খুব শীঘ্রই।

কুটিরটি গ্রামের মাঝামাঝি অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে। আশেপাশে অন্য কোনো গৃহস্থ কুটির নেই। কুটিরের দু-ধারে, উলটো কোণে দুটি দরজা যা থেকে দুটি পায়ে হাঁটা পথ দু-দিকে চলে গিয়েছে। যদিও দুই পথ দিয়েই গ্রামের হাটে যাওয়া যায়। কুটিরের মাঝ বরাবর উচু পাঁচিল থাকায় এবং এই দুই দরজার অবস্থান এরকমই যে একজন নজরদারের পক্ষে দুইটি দরজার উপরেই নজর রাখা সম্ভব নয়। অতএব, আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা চারজন নজরদার নিযুক্ত করতে হয়েছিল। এক-একটি দরজার জন্যে দু-জন বরাদ্দ। এদের মধ্যে একজন নজর রাখবে আর দ্বিতীয়জন যদি বাবাক কোনো দ্বার দিয়ে গৃহ ত্যাগ করে তবে সে তার পিছু নেবে। মোটকথা, বাবাককে কখনোই চোখের আড়াল হতে দেওয়া চলবে না। যদিও বাবাকের এই ব্যবস্থায় কোনো আপত্তি ছিল না। তার অস্ত্র এরকম ভয়ঙ্কর কাজে ব্যবহার হচ্ছে জেনে সে আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতেই রাজি হয়েছিল।

প্রথম দু-দিন পিতা বা পুত্র দু-জনেই কুটির ছেড়ে একবারও বের হয়নি। তৃতীয়দিন বিধোরক আমার কাছে কয়েক দিনের জন্যে তক্ষশিলা মহাবিদ্যালয়ে যাওয়ার অনুমতি চায়। সেখানে কিছু কাজে তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে জানায় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে তাও বলে। তাকে অকারণ আটকে রাখার কোনো কারণ ছিল না, তাই তাকে যেতে দিই। এবং, কথামতো সে ফিরেও আসে চারদিন পরেই।

এই মাঝের কয়েক দিন পিতা একলাই ছিল গৃহে। দু-একজন মানুষ আসত তার কাছে রোজই কিছু কিছু দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী নিতে বা মেরামত করতে। কোদাল, ছুরি, ইত্যাদি। কিন্তু তারা সকলেই এই গ্রামেরই বাসিন্দা। সন্দেহজনক কাউকেই এর মধ্যে আসতে দেখা যায়নি বাবাকের কাছে।

পুত্র ফিরে আসার পরেও তাদের জীবনযাপনে কোনো বিশেষ পরিবর্তন আসে না। মাঝে মাঝে কেউ বের হয়, হাটে যায়, ফিরে আসে। সত্যি বলতে আমরাও কিছুটা অধৈর্যই হয়ে পড়ছিলাম। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটছিল না প্রায়, একমাস কেটে গেলেও।

এরপরেই একদিন আচমকাই ঘটনাটা ঘটল। আমরা যা হওয়া কখনোই সম্ভব নয় বলে ভেবেছিলাম, সেটাই ঘটে। নজরদারদের অনেকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেও যেটুকু জেনেছি, তা আপনাকে বলি।

সেইদিন দিনের প্রথম প্রহরে পুত্র, মানে বিধোরক কুটির ছেড়ে বেরিয়েছিল। প্রহর শেষের দিকে বা দ্বিতীয় প্রহরের শুরুর সময়ে বাবাক বের হয় প্রথম দরজা দিয়ে অর্থাৎ প্রথম রাস্তা দিয়ে। নিয়মমতো তার পিছু নেয় সেখানে অপেক্ষায় থাকা আমাদের দুই গুপ্তচরের একজন। বাবাক গ্রামের হাটে পৌঁছায়। রোজকার মতো খাদ্যসামগ্রী কেনে, একটু শুঁড়িখানায় ঢোকে এবং মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে আসে সেখান থেকে একটি সুরাপাত্র সঙ্গে নিয়ে। এটাও নতুন কিছু নয়। মাঝে মাঝেই পিতা বা পুত্র সুরাপান করে। এরপর বাবাক সোজা নিজের কুটিরেই ফিরে আসে। কেউই সন্দেহজনক কিছু আচরণ লক্ষ করেনি সেদিন।

এরপরেই পুত্র বেরিয়ে এসে একজন নজরদারকে জিজ্ঞেস করে যে, তার পিতাকে সে বেরোতে দেখেছে কি না। কারণ পিতার তার সঙ্গে দুপুরের আহার করার কথা ছিল কিন্তু তিনি গৃহে নেই। প্রথম দরজার নজরদাররা জানায় যে, হ্যাঁ, বাবাক বেরিয়েছিল এবং বেশ কিছুক্ষণ আগে ফিরেও এসেছে। বিধোরক এরপর দ্বিতীয় পথে নজর রাখা দু-জনের কাছে একই কথা জিজ্ঞেস করে। তারা জানায় যে, বাবাককে তারা কেউই বেরোতে বা ঢুকতে দেখেনি। অতএব, তার পিতার গৃহেই থাকার কথা। কিন্তু বিধোরক বলল যে, পিতা গৃহে নেই। নজরদাররা একত্রিত হয় এবং তাদের বক্তব্য ও সময় মিলিয়ে দেখা যায় যে, বাবাক প্রথম পথ ধরে বেরিয়েছিল, গ্রামের হাটে যায় এবং সেই পথেই ফিরে আসে। সে যে ফিরছিল তার প্রমাণ হিসাবে কুটিরে তার ঝোলা, ক্রয় করা সবজি, চাল ও সুরা ভরতি পাত্রটিও পাওয়া যায়। এমনকী সে যে নিজের কার্যালয়ে আগুন জ্বেলে কাজ করছিল তার প্রমাণও দেখা যায়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে জলজ্যান্ত মানুষটিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা না বলে মাটির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে চাণক্য বসে রইলেন। দুধে চুমুক দিতেও ভুলে গিয়েছেন। খানিকক্ষণ ভাবার পর বললেন, সেদিন কুটিরের বাইরে নজর রাখার কাজে বহাল থাকা চারজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাদের এখানে পাঠাও, শশাঙ্ক। তবে, এক এক করে পাঠাবে। আমি প্রত্যেকের থেকে আলাদা আলাদাভাবে সেদিনের ঘটনার বিবরণ শুনতে চাই। এরপর প্রয়োজনে এতদিন ধরে যে কয়জন ব্যক্তি নজরদারির কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলব।

শশাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

বহুদিন আপনার সংশ্রবে থাকার দরুন আমি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম যে, আপনি তাদের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চাইবেন। তাই ওই চারজনকে ইতিমধ্যেই এই শিবিরে নিয়ে এসেছি। আমি এখুনি এক একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে। আমি জানি

এই রহস্যের সমাধান আপনি করতে পারবেন, আচার্য। আপনারই আশায় এতদিন আছি যে, আপনি একবার এসে পড়লেই আমার গৃহে ফেরার সময় হবে। নিজের কন্যার মুখ দর্শন করতে আমি যে বড়োই উদগ্রীব, আচার্য।

বলে হেসে তাঁবু থেকে প্রস্থান করল শশাঙ্ক।

৩৪.

দরজা ১, নজরদার ১।

চাণক্য প্রশ্ন করলেন,

তুমি ও তোমার সঙ্গী কতক্ষণ নজর রেখেছিলে সেইদিন?

আমাদের বরাদ্দ সময় ছিল দিনের চার প্রহর, মহামতি। গোটা সময়টাই আমি ছিলাম আমার স্থানে।

— হুমম। সঠিকভাবে স্মরণ করে বলো, তুমি সেইদিন কোন কোন ব্যক্তিকে ঢুকতে ও বেরুতে দেখেছিলে।

- বাবাক বেরিয়েছিল প্রথম প্রহরের শেষের দিকে।

— প্রথম প্রহর শেষের দিকে না দ্বিতীয় প্রহরের শুরুতে? -

— তা হতে পারে, মহামতি। নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।

— হুম। বেশ, তারপর? তুমি পিছু নিয়েছিলে?

আজ্ঞে না। আমি নিজের স্থানে অপেক্ষা করেছিলাম। আমার সঙ্গী পিছু নেয় বাবাকের।

— তারপর?

বাবাক ফিরে আসে দ্বিতীয় প্রহরের মাঝামাঝি এবং আমার সামনে দিয়েই - কুটিরে প্রবেশ করে।

— ভিতরে প্রবেশের পর সে আর বের হয়নি? -

— আজ্ঞে না। সে নিজের কার্যালয়ে ঢুকে কাজ শুরু করেছিল।

— কীভাবে জানলে সেটা?

কুটিরে তার কার্যালয় থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেছিলাম। সে আগুন জ্বালিয়ে অস্ত্র নির্মাণের কাজ করলে এই ধোঁয়া বেরোয়। আগেও দেখেছি।

- এরপর আর কেউ বেরিয়েছিল? -

— হ্যাঁ। বিধোরক একবার বের হয়েছিল হাটের পথে।

কখন বেরিয়েছিল? পিতা ফিরে আসার আগে, না, পরে? তাকে ফিরতে দেখেছিলে?

— ঠিক মনে করতে পারছি না। সম্ভবত পিতা ফেরার পূর্বেই। নিশ্চিত মনে নেই, মহামতি। তবে, তারপর আরও একবার তাকে বেরোতে দেখি তৃতীয় প্রহরের সময়ে, নিজের পিতার খোঁজ জিজ্ঞেস করে আমাদের কাছে।

- তুমি কী বললে?

- - আমরা জানালাম যে, বাবাক হাট থেকে বহু পূর্বেই ফিরে এসেছে। কুটিরে না থাকলে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় দ্বার দিয়ে আবার কোথাও বেরিয়েছে।

— আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে তুমি দেখোনি? গোটা সময়ের মধ্যে একবারও তুমি নিজের স্থান ত্যাগ করোনি?

না, আচার্য। কোনো তৃতীয় ব্যক্তি আসেনি বা বের হয়নি। আমি সর্বদাই সেখানে ছিলাম।

দরজা ১, নজরদার ২।

চাণক্যর প্রশ্ন,

— তুমি প্রথম কাকে কুটির থেকে বেরোতে দেখেছিলে?

দ্বিতীয় প্রহরের শুরুর সময়ে বাবাক বেরোয় হাটের উদ্দেশে।

- তুমি তার পিছু নিয়েছিলে? তার গতিবিধি কী ছিল সেদিন?

হ্যাঁ। আমিই তার পিছু নিয়েছিলাম। বাবাক প্রথমে খোলা বাজারে কিছু সওদা করে সবজি, আনাজ ইত্যাদি। তারপর একটি শুঁড়িখানায় প্রবেশ করে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে বেরিয়ে আসে।

— সেই সময়ে তুমি কোথায় ছিলে?

— বাইরে অপেক্ষা করছিলাম।

তার মানে ওই সময়ে সে তোমার নজরের আড়ালে ছিল।

সে মাত্র কিছুক্ষণ, আচার্য। বেরোনোর পূর্বে বাবাকের কাঁধের ঝোলা খুলে দেখা হয়েছিল, তাতে কোনো অস্ত্র বা শর ছিল না। তাই শুঁড়িখানায় কারুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলেও কোনো লাভ তার হত না। আর ওই শুঁড়িখানার একটিমাত্র দ্বার ছিল যেখানে আমি অপেক্ষায় ছিলাম। অতএব, অন্য পথ দিয়ে বাবাকের পলায়ন করারও সম্ভাবনা ছিল না।

হুমম।

তারপর সে সোজা কুটিরে ফিরে আসে। মাঝে কোথাও দাঁড়ায়নি। এরপর কুটির থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে বুঝি যে কাজে হাত দিয়েছে। -

— এরপর আর কাউকে বেরোতে বা প্রবেশ করতে দেখেছিলে?

বাবাক পুত্র বিধোরক একবার বেরিয়েছিল মনে হয় হাটের দিকে। দ্বিতীয়বার তাকে আবার বেরোতে দেখি যখন আমাদের কাছে পিতা কোথায় তা জানতে চায় বেরিয়ে

— হুমম। তুমি কতদূর থেকে পিছু নিচ্ছিলে বাবাকের?

- যাতে আশেপাশে কারুর সন্দেহ না হয় তাই বেশ কিছুটা দূর থেকেই কারুর উপর নজর রাখা নিয়ম। তাই আন্দাজ বিশ-পঁচিশ হাত দূরে দূরে আমি সর্বদা ছিলাম বাবাকের।

বেশ। তুমি আসতে পারো।

দরজা ২, নজরদার ১।

তোমার নজরদারির ভার কতক্ষণের ছিল?

— দিনের চার প্রহর, আচার্য।

— তুমি সেইদিন কাকে বেরোতে বা প্রবেশ করতে দেখেছিলে সেটা বলো। - দিনের প্রথম প্রহরে, প্রভাতে বিধোরক বেরিয়ে যায় এবং অনেক পরে ফিরে আসে।

কতক্ষণ বাদে?

— তা ধরুন, তৃতীয় প্রহরের শুরুতে।

হুমম। তাকে আর বেরোতে দেখেছিলে?

হ্যাঁ। তৃতীয় প্রহরের মাঝামাঝি সে আবারও বেরিয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসে। পিতাকে আমরা ফিরতে দেখেছি কি না জানতে চায়। আমরা জানাই যে, আমরা আজকে সকাল থেকে তার বাবাকে একবারও দেখিনি। তবে সে গৃহেই ছিল আগের প্রহরেও। কারণ তার কার্যালয় থেকে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছিল।

হুমম। গোটা সময়ে তুমি ছিলে নিজের স্থানে?

— হ্যাঁ, আচার্য। মাঝে অল্প সময়ের জন্যে যদি-বা আমি নাও থেকে থাকি, আমার সঙ্গীটি ছিল। কোনো সময়েই আমাদের দু-জনের নজর এড়িয়ে বাবাকের কুটিরে প্রবেশ বা বাহির হওয়া সম্ভব ছিল না।

- হুম। তুমি আসতে পারো। সেদিন তোমার সঙ্গী যে ছিল তাকে পাঠিয়ে দাও।

দরজা ২, নজরদার ২।

- সেইদিন কে বেরিয়েছিল এবং কে প্রবেশ করেছিল স্মরণ করে বলো।

- সকালে বিধোরক বেরিয়েছিল এবং, অনেক দেরিতে ফিরে এসেছিল।

- কতক্ষণ বাদে?

সঠিক বলতে পারব না। তবে, অনেক বেলায়। তৃতীয় প্রহর হবে।

- আর কাউকে প্রবেশ করতে দেখেছিলে?

না, ব্রাহ্মণদেব।

– তারপর?

-বিধোরক তার পিতার খোঁজ করতে আসে। বলে যে এতক্ষণে তো পিতার ফিরে আসার কথা, কিন্তু পিতা কুটিরে নেই। আমরা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি যে, চিন্তার কিছু নেই, তার সঙ্গে সর্বদাই আমাদের একজন থাকে। কিন্তু এর উত্তরে যখন ছেলেটা বলে যে উলটো দিকের দরজার দু-জন প্রহরী বলল যে, বাবাক ফিরে এসেছে, তখন আমাদের মনে সন্দেহ হয়। আমরা কুটিরে প্রবেশ করি, ওদিকের দু-জনকেও ডাকা হয়। এবং, যখন কোথাও বাবাককে খুঁজে পাওয়া যায় না তখন আমরা দলপতি শশাঙ্ককে খবর পাঠাই।

- কুটিরে প্রবেশ করে তোমরা কী দেখেছিলে?

- বাবাকের ঝোলা শুধু রাখা আছে। ওই ঝোলা নিয়েই সে হাটে গিয়েছিল বলে জানায় ওই দ্বারের দু-জন। এবং, সে যে ফিরে এসেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণও আমরা পাই। তার ঝোলায় টাটকা সবজি এবং সদ্য ক্রয় করা মদিরার একটি পাত্রও ছিল। শুধু তাই নয়, বাবাকের কার্যালয়ের চুল্লিতে তখনও নিভু নিভু আগুনের থেকে বোঝা যায় যে, সে খানিক পূর্বেও সেখানে নিজের কাজ করছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে কুটিরের ভেতর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা রীতিমতো দেয়াল, পাতাল পরীক্ষা করে দেখেছি যে, কোনো গোপন পথ আছে কি না কুটিরে। কিন্তু না আচার্য, বিশ্বাস করুন ওই দুটি দরজা ভিন্ন আর কোনো পথে ওই কুটিরে প্রবেশ বা বেরোনো সম্ভব নয়।

- হুমম।

শেষজন বেরিয়ে যাওয়ার পর জীবসিদ্ধি চাণক্যকে প্রশ্ন করল,

- কী বুঝলেন, গুরুদেব?

চাণক্য উত্তর দিলেন,

আমার আরও এক পেয়ালা মধু দেওয়া দুধের প্রয়োজন।

– এই তো এক পেয়ালা শেষ...

আহা! তুমি তো জানোই, জিভে মধুর ছোঁয়া না পেলে আমার মস্তিষ্ক সচল হয় না।

৩৫.

পর্বত্যকা রাজ্য।

মলয়কেতু মহল থেকে তার সেনাবাহিনীর প্রস্তুতিপর্ব নিরীক্ষণ করছে। তার এককাঁধে আলতো করে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মা। মলয়কেতু তাকে

বলল, দেখো পদ্মে, দেখো এই হল পৌরবরাজের মহা পরাক্রমী সেনাবাহিনী। -আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় কার সাহস আছে, পদ্মা? আমার বিরুদ্ধে যারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছে তাদের তৃণের ন্যায় পদদলিত করতে চলেছি আমি। তাদের সবার মিলিত সেনাবলও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ধরে না।

পদ্মার চোখে দৃশ্যত প্রশংসা ফুটে উঠল মলয়কেতুর জন্যে। বলল,

- হ্যাঁ মহারাজ, আপনাকে হারানোর ক্ষমতা এই পঞ্চনদে কারুর নেই। কিন্তু...

– কিন্তু? কীসের সংশয় তোমার আমার প্রতি, পদ্মে?

ক্ষমা করুন, মহারাজ। আপনার প্রতি আমার কোনো সংশয় নেই। যুদ্ধে

আপনাকে আপনার শত্রুরা পরাজিত করতে পারবে না, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সঠিক নিয়মে যুদ্ধ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি বিজয়ী হবেন, আমি জানি।

– তবে? তবে কীসের সংশয় তোমার মনে?

যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে নয়, আমি অন্দরের শত্রুকে নিয়ে ভাবছি।

মলয়কেতু পদ্মার হাত নিজের হাতে নিল। বলল,

আমি বুঝেছি তুমি কার কথা বলছ। ওই আচার্য শকুনির দিকে তোমার ইঙ্গিত। আমার প্রমোদ আখেটে কোথায় যাওয়ার কথা ছিল সেই তথ্য মাত্র কয়েক জন জানত, যাদের মধ্যে শকুনি একজন। ও-ই যে সিন্ধুসেনাকে সেতথ্য জানিয়েছে, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ওই দুষ্ট বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণকে আমি আমার ত্রিসীমানায় আর ঘেঁষতে দেব না। নিশ্চিন্তে থাকো।

মহারাজ। ওই ব্রাহ্মণ গত এক বছর আপনার অন্দরমহলে নিত্য অবাধ যাতায়াত করেছে। আপনি কি মনে করেন সে আপনার সেনার বিষয়ে সকল তথ্য ইতিমধ্যে জেনে ফেলেনি? ওই দুষ্ট ব্রাহ্মণ নিঃসন্দেহে সেই সকল তথ্য সিন্ধুসেনা ও তার সঙ্গের কুচক্রীদের জানিয়ে দেবে যাতে তাদের এই যুদ্ধে সুবিধা হয়।

মনে আশঙ্কা দেখা দিল মলয়কেতুর। কথাটা মিথ্যা নয়। যুদ্ধে শত্রুর সেনাবাহিনীতে ঘোড়ার সংখ্যা, হাতির সংখ্যা, তিরন্দাজের সংখ্যা ইত্যাদি তথ্যের সঠিক হিসাব জানলে যুদ্ধে কোন রণনীতি অবলম্বন করা হবে তা স্থির করা সুবিধা হয়ে যায়। অনেক শক্তিশালী সেনাবাহিনীকেও শুধুমাত্র সঠিক রণনীতির সাহায্যে তার চেয়ে ঢের দুর্বল সেনার হাতে পরাজিত হতে হয়েছে এরকম উদাহরণ বহু আছে।

তুমি কী করতে বলো তবে, পদ্মে?

পদ্মার মুখ গম্ভীর হল। বলল,

- তাকে আটকাতে হবে, মহারাজ। সম্ভবত এখনও ব্রাহ্মণ জানে না যে, আপনি তার ষড়যন্ত্রের কথা জেনে গিয়েছেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন, মহারাজ। ওই ব্রাহ্মণকে তথা তার দলে যোগ দেওয়া অন্যান্য রাজাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অছিলায় ডেকে পাঠান এখানে। এবং তারপর, সুযোগ বুঝে...

কথা শেষ করল না পদ্মা। কোমল এই মেয়েটাকে যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে মলয়কেতু। সেইসঙ্গে সে ততই দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করছে তার প্রতি। ডান হাত মুঠো করে মুখের সামনে ধরে মলয়কেতু বলল,

— ঠিক বলেছ! ওই বিশ্বাসঘাতক বিভীষণকে আগে সরাতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে পদ্মা বলল,

- তাতে আরও একটি সুবিধা হবে, মহারাজ।

— কী সুবিধা? -

— শুনেছি এই ব্রাহ্মণকে মগধ রাজদ্রোহী হিসাবে ঘোষণা করেছে। অতএব তার ছিন্ন মস্তক পেলে মগধরাজ প্রসন্ন হয়ে আপনাকে নিজের নিকটে পুনরায় স্থান দেবেন। এবং, কে বলতে পারে, হয়তো ভবিষ্যতে, উপযুক্ত সময়ে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তকে পথ থেকে সরিয়ে গোটা আর্যাবর্তর একচ্ছত্র অধিকার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার সুযোগও আসতেই পারে। তাই নয় কি?

মলয়কেতু ও পদ্মা খেয়াল করল না যে, একজন ভৃত্য তাদের দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের সমস্ত আলোচনা শুনছিল। নিঃশব্দে সে সেই স্থান থেকে সরে গেল। এই সংবাদ তাকে যে করেই হোক আচার্য শকুনি অবধি পৌঁছাতে হবে!

***

পাটলিপুত্র, মগধ।

প্রধানামাত্য মহোদয় সম্রাটের সাক্ষাৎ পেতে দ্বারে অপেক্ষারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দ্বাররক্ষীর ঘোষণা শুনে বললেন,

— বিরাজ করুন, মহামাত্য।

কক্ষে প্রবেশ করলেন মহামাত্য রাক্ষস। মুখ তাঁর যথারীতি ভাবলেশহীন। প্রবেশ করে চন্দ্রগুপ্তকে অভিবাদন জানিয়ে তিনি বললেন,

মহারাজ। সময় আসন্ন।

চন্দ্রগুপ্ত সতর্ক হয়ে নড়েচড়ে বসলেন,

— নির্দেশ এসেছে? যাক! অবশেষে! -

উত্তর না দিয়ে একটি পত্র তিনি এগিয়ে দিলেন সম্রাটের দিকে। চন্দ্রগুপ্ত সেই ভূর্জপত্র খুলে নিঃশব্দে পাঠ করলেন। তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। বললেন,

— আপনি তৈরি হতে বলুন। প্রস্তুতি দেখে নিন তাদের।

সকলে প্রস্তুত, সম্রাট। আমি পূর্বেই তাদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম পরিকল্পনা মতো। শুধু আদেশের অপেক্ষায় আছে।

বেশ।

— কিন্তু সেনাপতি সিংহরণের অবর্তমানে তাদের নেতৃত্ব কে দেবে, সম্রাট?

উত্তরে হেসে উঠল চন্দ্রগুপ্ত।

৩৬.

আচার্য। আসতে পারি?

সকালের পূজা, প্রার্থনা শেষ করে ধ্যান করতে বসেছিলেন চাণক্য। জীবসিদ্ধির গলা পেয়ে তিনি চোখ খুললেন।

- হ্যাঁ। ভেতরে এসো হে, জীবসিদ্ধি।

জীবসিদ্ধি একা নয়, তার সঙ্গে শশাঙ্ক এবং অচেনা একটি যুবক প্রবেশ করল। নবাগত যুবকটি বিদেশি, টানা চোখ-মুখ, শরীরের বর্ণ দেখেই চাণক্য অনুমান করলেন এ নিশ্চয়ই বিধোরক। তাঁকে নির্ভুল প্রমাণ করে পরমুহূর্তে শশাঙ্ক পরিচয় করিয়ে দিল,

— আচার্য, এই হল বাবাক পুত্র বিধোরক। -

চাণক্যকে প্রণাম জানাতে চাণক্য তাদের আসন দেখিয়ে দিলেন। চাণক্য লক্ষ করলেন যে, বিধোরক সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে।

ছেলেটি বসে প্রথমেই চাণক্যকে প্রশ্ন করল,

- আমার পিতা কোথায়, আচার্য?

শশাঙ্ক বলল,

— উনি তোমার পিতাকে খুঁজে দেবেন বলেছি, বিধোরক। পিতা কোথায় আছে তা উনি জানেন এমন কথা বলিনি।

- ও।

কেমন যেন হতাশ হয়ে চুপ করে গেল যুবক। শশাঙ্ক পত্রতে ঠিকই লিখেছিল, যে, ছেলেটি মন্দবুদ্ধি, হাবাগোবা। মনে মনে ভাবল জীবসিদ্ধি।

চাণক্য বিধোরককে প্রশ্ন করলেন,

— তোমার কী মনে হয়? তোমার পিতা কোথায় আছেন?

মাথা না তুলেই বিধোরক উত্তর দিল,

— জানি না। হয়তো রাগ করে চলে গিয়েছে।

- রাগ?

হ্যাঁ। আমি কাজ শিখতে পারিনি বলে বাবা আমার উপর রাগ করতেন। বলতেন আমি বোকা।

— আমার তা মনে হয় না, বিধোরক।

— তাহলে নিশ্চয়ই কেউ জোর করে নিয়ে গিয়েছে।

কীভাবে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়? তোমার গৃহের মধ্যে থেকে যে উনি নিখোঁজ হয়েছেন।

উত্তর না দিয়ে বসে থাকল সে। চাণক্য ফের প্রশ্ন করলেন,

আচ্ছা, এই শঙ্কুমণি নামে যে ব্যক্তি তোমার পিতার কাছে আসত, তাকে দেখেছ নিশ্চয়ই? তাকে কেমন দেখতে মনে আছে?

হ্যাঁ। দীর্ঘকায়, কাঁধ অবধি কেশ, বলিষ্ঠ যোদ্ধার মতো চেহারা তার। এদেশের মানুষ। কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যবয়সি।

চাণক্য কিছুক্ষণ বিধোরকের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবলেন। শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে বললেন,

— নাহ্, ওকে প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই। ওকে গৃহে ফেরত পাঠাতে পারো। শশাঙ্ক বিধোরককে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ বাদেই পুনরায় একা এসে ঢুকল তাঁবুতে। জীবসিদ্ধি এতক্ষণ চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছিল।

শশাঙ্ক ঢুকতে চাণক্যকে প্রশ্ন করল,

আচার্য, বাবাকের কুটির একবার আপনি নিজে পর্যবেক্ষণ করলে ভালো হয় না? হতে পারে অন্যদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে কোনো গোপন দ্বারের প্রবেশপথ।

চাণক্য অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নিজের কেশশিখায় হাত গুপ্ত পথ সুবিশাল দুর্গে থাকে হে, জীবসিদ্ধি। কোনো কুটিরে সাধারণত তা থাকে না। আর থাকলেও তা বাবাকের কুটিরে অন্তত নেই। শশাঙ্ক প্রশ্ন করল,

বুলিয়ে উত্তর দিলেন,

— কিন্তু একথা আপনি এত নিশ্চিত হয়ে কীভাবে বলছেন, আচার্য? আপনি তো সশরীরে সেইস্থানে পদার্পণও করেননি!

না, করিনি। এবং, তার প্রয়োজনও নেই। সত্যি বলতে, বাবাককে বৃথা খোঁজার চেষ্টা করেও লাভ নেই। সম্ভবত সে এখন ভিন্ন কোনো রাজ্যে আত্মগোপন করে আছে।

শশাঙ্ক উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে,

- সেকী? কিন্তু... কিন্তু আমরা তো বাবাক নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই গ্রাম ঘিরে ফেলেছিলাম। আমাদের অজান্তে একটি পারাবতও গ্রাম ছেড়ে বেরোতে পারবে না আমি নিশ্চিত, আচার্য!

চাণক্য শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে করুণাসূচক সামান্য হেসে বললেন,

— তোমার ও মগধের গুপ্তবাহিনীর কর্মক্ষমতার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, শশাঙ্ক। কিন্তু সমস্যাটা হল যে, তুমি এই গ্রামকে নিশ্ছিদ্র সুরক্ষা বলয়ে ঘিরে ফেলার অনেক পূর্বেই বাবাক গ্রাম ত্যাগ করেছিল সেইদিন। জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

অর্থাৎ, আপনি অনুধাবন করতে পেরেছেন বাবাক তার বন্ধ গৃহ থেকে কীভাবে উধাও হয়েছিল?

— হুমম। তোমরাও সহজেই তা অনুধাবন করতে পারতে। যদি গোটা ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটা সবাই অবহেলা না করতে।

কোন সূত্র?

বাবাকের কার্যালয় থেকে নির্গত আগুনের ধোঁয়া।

শশাঙ্ক ও জীবসিদ্ধি পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

চাণক্য তাদের দিকে দেখে মৃদু হেসে বললেন,

তোমার নজরদাররা কুটিরে প্রবেশ করে দেখেছিল বাবাকের কার্যালয়ের চুল্লিতে তখনও নিভু নিভু আগুন রয়েছে। অর্থাৎ, সেখানে কিছু জ্বালানো হয়েছিল। যেহেতু সেটি অস্ত্র নির্মাণের কার্যালয়, অতএব তোমরা ধরেই নিয়েছ যে, সেখানে বাবাক কাজ করছিল নিশ্চয়ই নিরুদ্দেশ হওয়ার পূর্বে। অথচ একবারও তোমাদের মনে সন্দেহ হল না যে, সেখানে কোনো তপ্ত ধাতুর অর্ধনির্মিত অস্ত্র কেন পাওয়া গেল না সেক্ষেত্রে?

বিস্মিত ভঙ্গিতে শশাঙ্ক প্রশ্ন করল,

কিন্তু তা, আপনি কী করে জানলেন যে সেখানে কোনো অর্ধনির্মিত অস্ত্র আমার পাইনি? -

কারণ আমি জানি সেখানে অস্ত্র নির্মাণ করা হয়নি সেইদিন। আগুন জ্বালানো হয়েছিল সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন প্রয়োজনে।

জীবসিদ্ধি ঘাড় নেড়ে বলল,

বরাবরের মতোই আমার কাছে আপনার ইঙ্গিত স্পষ্ট নয়, গুরুদেব। ভ্রাতা শশাঙ্কর অবস্থাও যে আমারই মতো সেটাও আমি বুঝতে পারছি। তবে, আমার মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে। ওই বিধোরক সম্ভবত গোটা ঘটনায় যুক্ত। সে মোটেই যেরকম নির্বোধ সেজে আছে, বাস্তবে তা নয়। সে-ই তার পিতাকে একাজে সাহায্য করেছে।

– হুম। ঠিকই অনুমান করেছ হে, জীবসিদ্ধি। শশাঙ্ক আর তোমার জন্যে আরও একটা সূত্র রইল। তক্ষশিলা থেকে ফেরার পর থেকে বাবাক পুত্র বিধোরকের পা খুঁড়িয়ে চলারও এই গোটা ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

শশাঙ্ক সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে নিজের আসনে বসে পড়ল। আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল চাণক্যর প্রতি।

চাণক্য তাকে দেখে মৃদু হেসে পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন,

- বাবাকের এই বন্ধ গৃহ থেকে বিলীন হয়ে যাওয়ার বিষয়টা নিয়ে আমার মনে প্রথম থেকেই একটা অনুমান ছিল ঘটনাটা পত্রে পাঠ করার পর থেকেই। এখানে এসে চারজন নজরদারের কথায় সেই অনুমান সম্পূর্ণ একটি ধারণা নিয়েছে। কিন্তু আমি সে নিয়ে চিন্তিত নই। আমি অন্য একটি বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তিত যা একটু আগে আমি দেখলাম।

দু-জনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করল,

— কী দেখলেন?

চাণক্যর ললাটে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। বললেন,

তোমরা বোধ হয় লক্ষ করোনি। বিধোরকের ডান হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মাথায় এবং বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যবর্তী স্থানে চামড়া শক্ত হতে কড়া পড়ে গিয়েছে।

৩৭.

সিন্ধুপ্রদেশ। উপত্যকার নিকটেই নিজের সেনাশিবির সাজিয়েছে মলয়কেতু। নিজের তাঁবুতে বসে সে মহামাত্যর সঙ্গে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করছে।

- মহারাজ মলয়কেতুর জয় হোক।

- কী সংবাদ এনেছ, পত্রবাহক?

পত্রবাহক তার হাতের ভূর্জপত্র এগিয়ে দিল রাজার দিকে। মলয়কেতু সেটি খুলে পাঠ করল।

পত্রের শুরুতেই প্রথম সম্বোধনটা দেখে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল মলয়কেতুর। তাকে রাজা বলে সম্বোধন পর্যন্ত করেনি ওই দুষ্ট ব্রাহ্মণ! এত বড়ো আস্পর্ধা তার?

পত্রের সম্পূর্ণটা পাঠ করে ক্রোধে মুখ আরক্ত হয়ে উঠল মলয়কেতুর।

মলয়কেতু,

জ্ঞানী পণ্ডিতরা বলেন মূর্খ মিত্রর সঙ্গ করার চেয়ে চতুর শত্রুর সঙ্গও উত্তম হয়। এই বাক্যটি কতটা সত্য তা আপনার সঙ্গে মৈত্রী করে উপলব্ধি করলাম। যদিও আপনার মতো মেরুদণ্ডহীন শাসকের থেকে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করিনি। মূর্খরা বরাবরই নিজেদের পতন ডেকে আনে। আপনিও তাই করলেন। তবে এই তথ্য জেনে রাখুন যে, আপনাকে আর্যাবর্তর সম্রাট করার কোনো অভিপ্রায় আমার কোনোদিনই ছিল না। সে-যোগ্যতা আপনার নেই। আমি চাণক্য নই, আর্যাবর্তর শাসন আমার লক্ষ্য নয়। আর্যাবর্তর ধ্বংসই আমার মূল লক্ষ্য।

আমি জানি আপনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জেনে রাখুন আমি পঞ্চনদের অন্য শাসকদের ইতিমধ্যে সে-সংবাদ দিয়েছি। তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে সহজ জয়ের যে মনোবাসনা আপনার ছিল, তা আমি হতে দেব না।

আমাকে আলোচনার আমন্ত্রণ পাঠিয়ে যে আমাকে আপনি হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছেন তা আমি জানি। শকুনির চোখ ও কান আপনার আশেপাশেই আছে যা আপনি নিজেও জানেন না। তাই আপনার আমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করলাম।

আপনার বিনাশ আসন্ন।

ইতি,
শঙ্কুমণি।

পত্রটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলল মলয়কেতু। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা মহামন্ত্রী সুদীপ্তকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,

- সেনা তৈরি?

সুদীপ্তক উত্তর দিলেন,

- হ্যাঁ, মহারাজ।

- আর সিন্ধুর সেনাদের অবস্থান কী?

সিন্ধুসেনার সেনাবাহিনী উপত্যকার মধ্যে অবস্থান করছে। আগামীকাল - তারা উপত্যকায় প্রবেশ করবে।

- আর আমাদের সেনার অবস্থান?

পর্বতের মাঝের সরু পথ দিয়ে সিন্ধের সেনা প্রবেশ করবে। খোলা প্রান্তরে আমাদের সেনা তাদের অপেক্ষা করছে। সিন্ধের সেনাবাহিনী সরু পথে প্রবেশ করলেই তারা ফাঁদে পা দেবে। খোলা প্রান্তর থেকে আমরা তাদের উপর আক্রমণ করলে সহজেই আমরা গোটা বাহিনীকে ধ্বংস করতে পারব। তারা পিছিয়ে সরু উপত্যকার পথ ছেড়ে বেরোতে বেরোতে আমরা তাদের অর্ধেক সেনাবল ধ্বংস করে দিতে পারি।

— দারুণ রণকৌশল নিয়েছেন, মহামাত্য! সাধু।

- ধন্যবাদ, মহারাজ।

আর বাকি দুই রাজ্যেও আমরা আক্রমণ করব। সে প্রস্তুতি কি হয়েছে?

হ্যাঁ, মহারাজ। মলয়নগর ও কাশ্যপনগরের সীমান্তে আমাদের সেনা প্রস্তুত। শুধুমাত্র আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছে। -

- - অতি উত্তম। আগামীকালই তবে আমাদের বিজয় অভিযান শুরু হোক! কালকেই একসঙ্গে তিন স্থানে আক্রমণ করবে পর্বত্যকা সেনা!

কিছুটা ইতস্তত করে মহামাত্য সুদীপ্তক বললেন,

- মহারাজ। তিন ভিন্ন স্থানে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত সেনাবল ব্যবহার করতে হয়েছে। আমাদের নিজেদের রাজ্যে এই মুহূর্তে সেনাবাহিনী নেই বললেই চলে। আমি আপনাকে একবার বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করব যে, এরূপ নিজেদের রাজধানীকে অরক্ষিত রাখা কি সমীচীন?

আমাদের আক্রমণ যারা করতে চলেছিল, তাদের উপরেই আমরা আগে আক্রমণ করতে চলছি, মহামন্ত্রী। অতএব আমাদের কিছুর ভয় নেই।

আপনি বোধ হয় আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য কুলূতের কথা ভুলে যাচ্ছেন, মহারাজ।

তাদের তো নিজেদেরই রাজ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা। মহারাজ সুবর্মাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতদিন সেই সংবাদ গোপন রাখা হয়েছে বলে প্রজারা অসন্তুষ্ট। এদিকে শুনলাম চিত্রবর্মাকে বন্দি করা হয়েছে রাজাকে হত্যার অপরাধে। অতএব তাদের পক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে সেনা সংগঠিত করা অসম্ভব এই মুহূর্তে।

কিন্তু আপনি একজনের কথা ভুলে যাচ্ছেন, মহারাজ।

কে? কার কথা বলছেন?

চাণক্য! শেষ পাওয়া সংবাদে সে কিন্তু কুলূতেই অবস্থান করছে। আমি নিশ্চিত সে ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে পঞ্চনদের পাঁচ রাজ্য ও পারস্যের সঙ্গে শকুনির যোগাযোগের কথা। সে বিস্ময়করভাবে গোটা ব্যাপারে উদাসীন। আমার এই লক্ষণ ভালো লাগছে না, মহারাজ।

সে তো কুলূত অধিগ্রহণে ব্যস্ত। আর তা ছাড়া সেই-বা কী করে নেবে? যদি তর্কের স্বার্থে ধরেও নিই যে চাণক্য আমাদের রাজধানীতে আক্রমণ করল। তাতেই-বা লাভ কী? আমাদের সেনা সিন্ধুসেনাকে পর্যুদস্ত করে আমাদের বাজধানীতে ফিরে গেলে সহজেই তাদের মুষ্টিমেয় মগধ সেনাকে পরাজিত করে রাজ্যছাড়া করতে পারি।

সুদীপ্তক সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না। কিন্তু মুখে কিছু না বলে শুধু চুপ থাকলেন। তাঁর কেন জানি মন বলছে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, ঘটনাক্রম ততটা সহজ হবে না। চাণক্য! এই এক ব্রাহ্মণকে নিয়ে তিনি বড়োই চিন্তিত থাকেন। এই ব্রাহ্মণ শিক্ষকটির সঙ্গে তাঁর একবার দেখা হয়েছিল অনেক বছর আগে একটি জ্ঞানসভায়। সেসময়ে চাণক্য নিজের কেশশিখা খুলে রাখতেন। শোনা যায় তিনি নন্দ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন এবং যতদিন না তাঁর উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে ততদিন নিজের কেশশিখা না বাঁধার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই কুরূপ, দাঁত উঁচু, কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ ও তাঁর প্রতিজ্ঞা নিয়ে সকলেই পরিহাস করছিল তাঁর অজ্ঞাতে। কিন্তু যখন চাণক্য মঞ্চে উঠলেন, সভার সকলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুদীপ্তকের আজও মনে আছে চাণক্যর প্রতিটা কথা। রাজ্য, দেশ, জনপদ, রাজা ইত্যাদি নিয়ে তিনি সেদিন যা ধারণা ও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সভায়, তা এককথায় বৈপ্লবিক। সুদীপ্তক বুঝেছিল যে, এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কোনো সাধারণ মানুষ নন। সম্ভবত চাণক্যর প্রতিজ্ঞা অন্যের কাছে যতটা অসম্ভব মনে হচ্ছে, চাণক্যর নিজের কাছে বোধ হয় তা ততটা অসম্ভব নয়। তার কয়েক বছর পরেই সুদীপ্তকের অনুমান ঠিক প্রমাণিত করে মৌর্য সাম্রাজ্যের স্থাপনা হয়।

- কোথায় হারিয়ে গেলেন, মহামাত্য?

মলয়কেতুর ডাকে তাঁর চিন্তাজালে ছেদ পড়ল। বর্তমানে ফিরে এলেন সুদীপ্তক। মলয়কেতু বলল,

আপনি আমার আদেশ পাঠিয়ে দিন আমার সেনার কাছে। আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ শুরু হোক। আমাদের বিজয়রথ যাত্রা শুরু করুক! সদীপ্তক দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে বললেন, -

যথা আজ্ঞা।

জ্ঞানসভা— প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাজারা তাঁদের রাজ্যে পণ্ডিতদের আলোচনা সভার আয়োজন করতেন। দেশি ও বিদেশি বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গুণীজনদের আমন্ত্রণ করা হত তাঁদের বক্তব্য রাখতে।

৩৮.

চাণক্য সম্মুখে তাকিয়ে থাকলেও কিছু দেখছেন না। কপালে গভীর ভ্রূকুটি থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি কিছু ভাবছেন। শশাঙ্ক তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, জীবসিদ্ধি তাকে হাত তুলে থামতে ইশারা করল। চাণক্যর চিন্তাসূত্রে ছেদ না পড়াই ভালো। চাণক্য সময়মতো নিজেই ব্যাখ্যা করবেন।

কিন্তু চাণক্যর চিন্তায় বাধ সাধল তাঁবুর বাইরে থেকে এক প্রহরীর ডাকে।

— পাটলিপুত্র থেকে আচার্য চাণক্যর জন্যে পত্র আছে।

জীবসিদ্ধি উঠে গিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পত্র নিয়ে প্রবেশ করল। চাণক্যর দিকে বাড়িয়ে দিতে চাণক্য সেটা না নিয়ে তাকেই বললেন, পাঠ করে শোনাও।

জীবসিদ্ধি ভূর্জপত্র খুলে পড়তে শুরু করল,

> প্রিয় আচার্য চাণক্য,
>
> প্রণাম নেবেন। জনগণনার কাজের শেষ ধাপ আসন্ন। আপনাদের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সময় এসেছে।
>
> কাত্যায়ন।

পত্র পাঠ করে হতাশ ভঙ্গিতে চাণক্যর দিকে চাইল। বলল,

জীবসিদ্ধি আপনার আর অমাত্য রাক্ষসের এই রহস্যময় পত্রালাপ আমার কাছে বড়োই পীড়াদায়ক হয়ে যাচ্ছে। দয়া করে ব্যাখ্যা করুন। চাণক্য আলগা হেসে বললেন,

- তুমি নিশ্চয়ই এতদিনে কিছু অনুমান করেছ?

হ্যাঁ। অনুমান করতে পারি ‘জনগণনা’ কথাটি এই ক্ষেত্রে সাংকেতিক গুপ্ত শব্দ।

হুমম। তবে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার সময় এখনও আসেনি হে, জীবসিদ্ধি। এইটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, দীর্ঘ সময় মগধের বাইরে থাকার পর এবার আমাদের নিজগৃহে ফেরার সময় এসেছে।

শশাঙ্ক তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে অভিমানী সুরে বলল,

– না না, আপনি ও ভ্রাতা জীবসিদ্ধি কিন্তু প্রসঙ্গ পালটে দিচ্ছেন, আচার্য। এ ভারি অন্যায় তোমার, জীবসিদ্ধি। মানছি, বর্তমানে গুরুদেবের ভার চন্দ্রগুপ্ত তোমার উপর দিয়েছেন। কিন্তু, তাই বলে কি আচার্য চাণক্য শুধুই তোমার? আমাকে অন্ধকারে রেখে, এই বাবাকের উধাও হওয়ার রহস্যের সমাধান না করেই তোমরা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করতে পারো না!

কথা শেষে তিনজনই হেসে উঠল। চাণক্য সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন,

তোমার অভিযোগ যথার্থ হে, শশাঙ্ক। তোমায় তোমার পরিবারের থেকে আলাদা রেখে দেওয়া আর আমার উচিত নয়। গান্ধারের অধ্যায় শেষ করে তোমাকে নিজগৃহে ফেরার অনুমতি এবার দিতেই হবে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চাণক্য বললেন,

– কিন্তু গান্ধার পর্ব যে এই সমস্ত ঘটনার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ, তা ভাবলে কিন্তু ভুল করবে। পক্ষান্তরে আমি বলব এই রহস্য অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। আমি যতটা অনুমান করেছিলাম প্রথমে, এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে এখানকার ঘটনাক্রম আমার ধারণার চেয়েও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। আসন গ্রহণ করো, জীবসিদ্ধি। চেষ্টা করি তোমাদের ধূম্রমোচন করার।

চাণক্য কিছুটা ভেবে নিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করলেন,

গোটা ঘটনায় মূল ভূমিকা যে পালন করেছে এবং এখনও করে চলেছে সে হল বাবাক পুত্র বিধোরক। সে প্রথম থেকেই তোমাদের চোখে ধুলো দিতে নিজের যে 'নির্বোধ' ছবি প্রক্ষেপ করেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি নিশ্চিত তার ও তার পিতার শকুনির সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

জীবসিদ্ধি বিস্মিত স্বরে বলল,

— এমন অনুমান আমারও হয়েছিল। কিন্তু, আপনি নিশ্চিত কীভাবে হচ্ছেন, আচার্য?

– সে-প্রসঙ্গে শেষে আসছি। প্রথমেই বলি যে বাবাককে গুরুত্ব দিয়ে, তার পুত্র বিধোরককে উপেক্ষা করাটা শশাঙ্কের ক্ষেত্রে বড়ো ভুল হয়েছে। যেহেতু সে অস্ত্রনির্মাণ শিল্পে অশিক্ষিত তাই তাকে প্রথম থেকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বিষয়টা পত্রে জানানোর

পরেও শশাঙ্ককে সঠিক নির্দেশ দেওয়া আমারও উচিত ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেইসময়ে কুলুতের রহস্যমৃত্যু নিয়ে এতটাই জড়িয়ে ছিলাম যে, এই বিষয়ে গভীরে তলিয়ে ভাবা হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে আমার ভুল।

সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছে বিধোরককে তক্ষশিলায় বিনা নজরদারিতে একলা যেতে দেওয়া। তোমরা অনুমানই করতে পারোনি যে, তার মতো অল্পবুদ্ধি একটি যুবক কিছু করতে পারে। আসলে কাজের অজুহাতে বিধোরক তক্ষশিলায় গিয়েছিল শকুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে শকুনির দেওয়া একটি অস্ত্র নিয়ে সে ফিরে আসে এখানে।

শশাঙ্ক কথায় বাধা দিয়ে বলল,

না, আচার্য। বিধোরক গ্রাম ছাড়ার ও পুনরায় প্রবেশ করার সময়ে তার সমস্ত জিনিসপত্র, কাঁধের ঝোলা থেকে প্রতিটি বস্তু পরীক্ষা করা হয়েছিল। সে কোনো নতুন অস্ত্র নিয়ে ফেরেনি।

চাণক্য ঠোঁটের এককোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে উত্তর দিলেন,

— এ জগতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র যা, সেটা কোনো খাপ বা শরাধারে নিয়ে মানুষ চলে না। এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র হল 'বুদ্ধি', যা মানুষ নিজের মস্তিষ্কে নিয়ে চলে। যা বাইরে থেকে দেখা যায় না, অনুমান করা যায় না। একজন মানুষ তার মস্তিষ্কে কত ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা সযত্নে লালন করে চলেছে তা বাইরে থেকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। বিধোরকও তক্ষশিলা থেকে ফিরে এসেছিল একটি পরিকল্পনা নিয়ে, যা আচার্য শকুনির মস্তিষ্কপ্রসূত।

প্রথম থেকে শুরু করা যায়। বাবাক আসলে জেনেশুনেই সেই বিশেষ ধরনের বাণ বানায় শকুনির সেই তিরন্দাজ হত্যাকারীর জন্যে। সে এবং তার পুত্র গান্ধারের একটি গ্রামে থাকে তাই তাদের ধারণা ছিল যে, শুধুমাত্র একটি তিরের সাহায্যে ওদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া ওই বাণ ব্যবহার করে ইতিমধ্যে আমাদের জন্যে জাল ফেলা হয়েছে। অতএব, আমাদের শত্রুপক্ষ একটা ভুল করে ফেলে। তারা ধরেই নেয় যে, আমরা শুধুমাত্র তাদের এগিয়ে দেওয়া সূত্র ধরেই এগোব। অন্য পথ ধরেও যে আমাদের গুপ্তচররা সমান্তরাল পথে অনুসন্ধান চালিয়ে যাবে তা ওরা ধারণা করতে পারেনি।

কিন্তু গুপ্তচরদের অনুসন্ধানে লাভ হল। মাত্র কয়েকটি বাণ বাদে আর কোনো সূত্র ছিল না, তাই একবছরেরও বেশি সময় লাগল বটে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাবাকের কুটিরে শশাঙ্ক হাজির হল। বাবাক আর তার পুত্র পড়ল বিপদে। বাবাক ও তার পুত্র যে যথেষ্ট চতুর তা বোঝা যায় তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ থেকে।

বাবাক বুঝতে পারল, বাণের কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। মগধের সৈনিকরা সংবাদ নিয়েই এসেছে। অস্বীকার করলে বরং তাদের মনে সন্দেহ হবে যে, তার সঙ্গে শকুনির যোগাযোগ আছে। তা ছাড়া কুটির খুঁজলেই যেখানে ইতিমধ্যে জমিয়ে রাখা তিরগুলো পাওয়া যাবে, সেখানে অস্বীকার করা বৃথা। অতএব, এখানে খুবই বুদ্ধিমানের মতো সে তিরের কথা স্বীকার করল, কিন্তু সেই বাণ কে বা কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে সেই বিষয়ে সে নিজের অজ্ঞতা জানাল। সেই মুহূর্তেই শশাঙ্কর সন্দেহ তার দিক থেকে অনেকটাই সরে গেল। তাই নয় কি, শশাঙ্ক?

লজ্জিত ভঙ্গিতে 'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নাড়ল শশাঙ্ক। চাণক্য তার উদ্দেশে বললেন, - তোমার নিজেকে দোষী ভাবার কারণ নেই, শশাঙ্ক। এটাই মানুষের সাধারণ মনস্তত্ত্ব, মানুষের প্রকৃতি। এরপর আরও একটা দুর্দান্ত চাল দিল বাবাক। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল তার সেই ক্রেতার নাম, সে কোন নাম বলল? শঙ্কুমণি! ভেবে দেখো হে শশাঙ্ক, এইখানে তোমার প্রশ্নের উত্তরে যদি সে বলত যে ওই ব্যক্তির নাম তার জানা নেই, তবেই আবারও তোমার সন্দেহ জাগত তার প্রতি। তাই বাবাক আমাদের দিকে সেই নামটা ছুড়ে দিল, যা আমরা ইতিমধ্যে জানি! আচার্য শকুনি বা শঙ্কুমণি নামটা বলায় তার দিক থেকে সন্দেহ আরও কমল, কিন্তু আমরা কি বাস্তবে কোনো নতুন তথ্য পেলাম? একদমই না। অন্য কোনো নাম বললে আমরা সেই নামের সূত্র ধরে খোঁজ নিতে পারতাম। কিন্তু শকুনির নাম বলায় আমরা বুঝেই গেলাম যে সেটা ছদ্মনাম এবং ওই নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

চাণক্য কিছুটা থেমে বললেন,

তার সেই ক্রেতার চেহারার বর্ণনা দেওয়ার সময়ও সে আরও একটি চাতুর্যের নজির দিয়েছিল বটে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। আপাতত এই অবধি বলে তাৎক্ষণিক রক্ষা হল বটে। কিন্তু এবার তোমাদের বজ্রমুষ্টি থেকে পালাবে কোন উপায়ে? কারণ তুমি তাদের জানালে যে, মগধের গুপ্তচররা তাদের উপর নজর রাখবে অষ্টপ্রহর। বাবাক ও তার পুত্র বুদ্ধিমান বটে এই চক্রব্যূহ থেকে বেরোনোর মতো উপায় তারা অনেক ভেবেও স্থির করতে পারল না। শশাঙ্কর থেকেই জেনেছি যে, নজরবন্দি হওয়ার প্রথম কয়েক দিন তারা কেউই বিশেষ কুটির থেকে বের হয়নি। আসলে সেইসময়ে তারা উপায় ভাবছিল। কিন্তু কোনো উপায় না পেয়ে শেষে তারা স্থির করল যে, এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে তাদের আচার্য শকুনির পরামর্শের প্রয়োজন। পিতার উপর সর্বক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে, অতএব শকুনির কাছে যেতে হবে পুত্র বিধোরককেই। তাই তক্ষশিলায় কাজে যাওয়ার অছিলায় সে যোগাযোগ করল শকুনির সঙ্গে।

শশাঙ্ক আবারও বাধা দিয়ে বলল,

কিন্তু বিধোরক সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয়তে গিয়েছিল। আমি তক্ষশিলার প্রধানাচার্য ভদ্রভট্টর কাছে খোঁজ নিয়েছিলাম বিধোরকের কথার সত্যতা যাচাই করতে, আচার্য। বাস্তবে সে সেখানে মাঝে মাঝে কাজ করে বলে জানিয়েছেন তিনি।

- হুমম। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পথে কোথাও যে শকুনির সঙ্গো সাক্ষাৎ করেনি, সেকথার নিশ্চয়তা কী?

মুখ থেকে আফশোসের শব্দ নির্গত হল শশাঙ্কর। চাণক্য পুনরায় তাঁর ব্যাখ্যায় ফিরলেন,

আচার্য শকুনির মস্তিষ্ক থেকে আরও একটি দুর্দান্ত পরিকল্পনা জন্ম নিল। বিধোরক ফিরে এল গ্রামে। কিন্তু সে ফিরে এল এক পা খোঁড়া হওয়ার ভান করে। এসে জানাল সে পায়ে চোট পেয়েছে।

জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

— অর্থাৎ, ছেলেটি আসলে খোঁড়া নয়? কিন্তু, এই ভান করে তার কী লাভ হল? এরকম অপ্রয়োজনীয় একটি কাজ করার উদ্দেশ্যই-বা কী, আচার্য?

চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

কী বলছ হে, জীবসিদ্ধি? অপ্রয়োজনীয় কোনটাকে বলছ? এই গোটা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সবচেয়ে অপরিহার্য অঙ্গ হল ওই বিধোরকের পা টেনে টেনে হাঁটার মিথ্যা অভ্যাসটা!

৩৯.

হতভম্বভাবে চাণক্যর দিকে তাকিয়ে রইল জীবসিদ্ধি ও শশাঙ্ক।

তাদের মুখ দেখে চাণক্যর মনে পড়ে গেল তাদের ছাত্রাবস্থার স্মৃতি। ঠিক এভাবেই হতবুদ্ধি হয়ে তাঁর ছাত্ররা বসে থাকত পাঠের শুরুতে তাঁর গুরুকুলে। নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র অতি গম্ভীর বিষয়। ছাত্ররা প্রথমেই ভূর্জপত্রের কঠিন শ্লোক পাঠ করে হতবুদ্ধি হয়ে যেত। তখন চাণক্য তাদের সেই শ্লোকের সহজ ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। অতি কঠিন কিছুকেও সরলভাবে বোঝানোর জন্যে আচার্য চাণক্যর সুখ্যাতি ছিল। চাণক্য বলতেন, নিজের শেখার ইচ্ছা থাকার পরেও কোনো পাঠ যদি শিক্ষকের বোঝানোর পরেও কঠিন মনে

হয়, তবে জানবে তুমি ভুল শিক্ষকের কাছে পাঠ নিতে গিয়েছ। ত্রুটি বিদ্যার থাকে না, ত্রুটি থাকে শিক্ষক অথবা ছাত্রদের মধ্যে।

শশাঙ্ক ও জীবসিদ্ধির মুখের বিহ্বল ভাব দেখে তাঁর পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। যেন মনে হয় এই সেদিনের কথা, অথচ মাঝখানে কতগুলো ঋতু এসে চলে গিয়েছে। চাণক্য নিজের অন্তরে জানেন যে, তিনি জীবনে সবচেয়ে সুখী ছিলেন সেই সময়টাতে। জীবন তাঁকে বহু ভূমিকায় পরিচিতি দিয়েছে। রাজনীতিবিদ, তার্কিক, বিদ্রোহী, কৌটিল্য, সাম্রাজ্য-পতনকারী, সাম্রাজ্যনির্মাণকারী, মহামাত্য — কিন্তু তিনি অন্তর থেকে শুধুই একজন শিক্ষক। তাই তো এত বছর বাদেও নিজেকে তিনি তক্ষশিলার আচার্য হিসাবেই পরিচয় দেন।

চন্দ্রগুপ্তসহ এই পাঁচ সন্তানসম ছাত্র তাঁর বড়োই প্রিয়। মনে মনেই হেসে উঠলেন চাণক্য। তক্ষশিলায় তাঁর দিনগুলো ছিল বড়োই মধুর। গোটা দিন তাঁর কাটত তাঁর প্রিয় বস্তু ও মানুষদের মাঝে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ব প্রাঙ্গণ, পুস্তক, তাঁর প্রিয় ছাত্ররা, পিতাসম তাঁর প্রধানাচার্য ভদ্রভট্ট এবং... ।

শেষ নামটা মনে পড়তেই মনের গভীরে একটি সুপ্ত যন্ত্রণা যেন বহুদিন পর আবার জেগে উঠল। ভালোলাগার স্মৃতি কেটে গিয়ে গভীর বিষাদময় একটা একটা নাম, কিছু স্মৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল চাণক্যর হৃদয়ে।

অতীতের ঘোর কাটিয়ে চাণক্য জোর করে বর্তমানে ফিরে এলেন। জীবসিদ্ধি ও শশাঙ্ক তাঁর ব্যাখ্যার অপেক্ষায় অনুগত ছাত্রর মতোই উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে। চাণক্য পুনরায় তাঁর কথার রেশ ধরে বললেন,

কী জানি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, বিধোরকের খোঁড়া হওয়ার ভান করার বিষয়ে। বেশ, তবে এবার মূল রহস্যের সমাধানে আসি।

কয়েক মাস আগে শশাঙ্কর লেখা পত্রতেই একটি তথ্যের উল্লেখ ছিল যা বাবাক উধাও হয়ে যাওয়ার সংবাদ জানার পরেই আমার মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক করে। বাবাক ভিনদেশি চৈনিক। এবং, পত্রে এও উল্লেখ ছিল যে, চেহারার দিক থেকে পিতা পুত্রের অনেক মিল আছে। যদিও পিতা বয়স্ক এবং পুত্র যুবক।

আরও একটা তথ্য এখানে এসে জানলাম যে, বাবাকের মুখে গোঁফ ও দাড়ি ছিল। ছেলের মুখে তা নেই, তাই তাদের দেখতে সম্পূর্ণ ভিন্ন লাগে। কিন্তু যদি কোনোভাবে সেই পার্থক্যটুকু মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে অতিক্রম করা যায়, তবে? চাণক্য একটি ভূর্জপত্র টেনে নিয়ে কালিতে খাগের কলম ডুবিয়ে নিয়ে লিখতে

শুরু করলেন,

দরজা ২– পুত্র বেরোয়, প্রথম প্রহর

দরজা ১—– পিতা বেরোয়, প্রথম প্রহরের শেষে/দ্বিতীয় প্রহরের শুরুতে

দরজা ১—– পিতা ফিরে আসে, দ্বিতীয় প্রহরে

দরজা ১– পুত্র বেরোয়, সময়ের কথা প্রথম নজরদার সঠিক বলতে পারেনি।

দরজা ২—– পুত্র ফিরে আসে, তৃতীয় প্রহর।

কয়েকটি বাক্য পর পর লিখে ভূর্জপত্রটি এগিয়ে দিলেন দুই শিষ্যের দিকে। বললেন,

দেখো, এই হল চার নজরদারের বক্তব্য থেকে পিতা-পুত্রের কুটির থেকে বেরোনোর ও প্রবেশ করার ক্রম। পুত্র অর্থাৎ বিধোরক প্রথম দ্বার দিয়ে দ্বিতীয়বার কখন বেরিয়েছিল তা প্রথম নজরদার সঠিক বলতে পারেনি। সে আমাকে জানিয়েছে সম্ভবত পুত্র পিতার ফেরার পূর্বেই ফিরেছিল। কিন্তু কথাটা ভুল। কারণ বাবাককে প্রথম দ্বার দিয়ে বেরোতে সেই দ্বারের দ্বিতীয় নজরদারও দেখেছিল। স্মরণে রেখো যে, এই দ্বিতীয় নজরদার কিন্তু বাবাকের পিছু নিয়েছিল এবং তার সঙ্গেই দ্বিতীয় প্রহরে ফিরেছিল। অতএব, যদি বিধোরক পিতার আগেই কুটির থেকে বেরিয়ে থাকে প্রথম দরজা দিয়ে, তবে সেসময়ে দ্বিতীয় নজরদারের থাকার কথাই নয়। অথচ সে জানাচ্ছে সে বিধোরককে একবার বেরোতে দেখেছে। অতএব, আমরা নির্দ্বিধায় ধরে নিতে পারি, বিধোরক পিতার ফিরে আসার পরেই বেরিয়েছিল প্রথম দরজা দিয়ে।

তাকে এরপর ফিরতে দেখা যায় তৃতীয় প্রহরে, পেছনের দরজা, অর্থাৎ দ্বিতীয় দরজা দিয়ে। অতএব, দ্বিতীয় দরজার দুই নজরদার ধরেই নেয় যে, সেই যে সকালের প্রথম প্রহরে পুত্র বেরিয়েছিল, সে-ই ফিরে এসেছে। অতএব, কারুর মনেই কোনোরকমের সন্দেহের উদ্রেক হয়নি।

কিন্তু ভালো করে এই তালিকাটা দেখো। এখানে বিধোরককে মোট দু-বার বেরোতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু কুটিরে ঢুকতে দেখা গিয়েছে মাত্র একবার। তাই নয় কি?

চাণক্য খানিকটা থেমে আবার বললেন,

পিতা মানে বাবাক প্রথম দ্বার দিয়ে বেরোয় এবং হাটে যায়। তার সঙ্গে থাকা নজরদার সর্বক্ষণ তার উপর দৃষ্টি রেখেছিল, শুধুমাত্র এক জায়গায় বাদে। বাবাক শুঁড়িখানায় প্রবেশ করে এবং মাত্র কিছুক্ষণ বাদেই বেরিয়ে আসে। এই... এইখানেই গোটা রহস্যের মূল উত্তর লুকিয়ে আছে। শুঁড়িখানায় যে প্রবেশ করেছিল সে পিতা বাবাক বটে, কিন্তু যে বেরিয়ে এসেছিল সে ছিল পুত্র বিধোরক। আগে থেকেই পিতার সেদিনের পরিধান করা বস্ত্রের অনুরূপ বস্ত্র পরিধান করে শুঁড়িখানায় অপেক্ষা করছিল পুত্র। আর

তার মুখে ছিল পিতার মতোই নকল গোঁফ দাড়ি। এই শুঁড়িখানার মালিকটি নির্ঘাত গোটা ঘটনায় যুক্ত। তাকে বন্দি করতে হবে।

যাই হোক, পিতা শুঁড়িখানায় ঢুকল, পুত্র আগে থেকেই পরিকল্পনামতো তার অপেক্ষায় ছিল সেখানে। পিতার থেকে কাঁধের ঝোলাটি নিয়ে তারই ছদ্মবেশে শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে এল পুত্র। নজরদার তার উপর দৃষ্টি রাখছিল কুড়ি হাত দূর থেকে। অতএব, ওই দূরত্বে শরীরের আকৃতি, উচ্চতা এক হওয়ায় পুত্রকে পিতা ভেবে নেওয়াটা তার পক্ষে স্বাভাবিক। তার মনে যদিও-বা কোনো সন্দেহ আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল, সেটাও সেইসময়ে থাকল না কেন জানো?

-কেন, আচার্য?

চাণক্য হেসে বললেন,

এখানেই শকুনি তোমার গুপ্তচরদের মাত দিয়ে গিয়েছে হে, শশাঙ্ক! পিতাকে পুত্র বলে সন্দেহ হয়নি কারণ চেহারার সামান্য পার্থক্য বাদেও তোমাদের মস্তিষ্কে তাদের মধ্যে আরও একটা পার্থক্য ততদিনে শেকড় গজিয়ে ফেলেছে। এবং, সেটা হল পুত্রের ওই পা খুঁড়িয়ে চলার বিষয়টা! তক্ষশিলা থেকে ফেরার পর থেকেই প্রায় একমাস ধরে তোমরা দেখেছিলে বিধোরককে খুঁড়িয়ে হাঁটতে। অতএব, তোমাদের মস্তিষ্কে এই কথাটা গেঁথে বসেছিল যে, ‘পিতা স্বাভাবিক হাঁটে, পুত্র খুঁড়িয়ে হাঁটে’! তাই যখন শুঁড়িখানা থেকে পিতার ছদ্মবেশে পুত্র বেরিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে কুটিরে ফেরার পথ ধরল, তোমার নজরদারের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রইল না যে, সেই ব্যক্তি বাবাক নয়, সে বিধোরক!

চাণক্য কিছুক্ষণ চোখ বুজে দৃশ্যটা মানসপটে দেখার চেষ্টা করলেন। মনে মনে আচার্য শকুনির বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে তিনি পারলেন না। চোখ খুলে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বসে থাকা দুই শিষ্যের উদ্দেশে বললেন,

ওহে জীবসিদ্ধি, ওহে শশাঙ্ক, মনুষ্যের মস্তিষ্ক অতি অদ্ভুত বস্তু। যে মানুষের সাধারণ মনস্তত্ত্ব ও স্বভাবের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচিত হয়, তার পক্ষে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া, বা, কাউকে নিজের ইচ্ছেমতো চালনা করা কতটা সহজ তার উদাহরণ এই ঘটনা। শকুনি এ খেলায় অসম্ভব পারদর্শী তা নিশ্চয়ই তোমরা অনুমান করতে পারছ। অর্থাৎ, সামনের প্রথম দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ যে করেছিল সেইদিন দ্বিতীয় প্রহরে, সে বাবাক নয়, সে ছিল তার পুত্র বিধোরক। আমি নিশ্চিত নজরদার পিতা বলে ভুল করে পুত্রের পিছু নিতেই বাবাক শুঁড়িখানা থেকে ছদ্মবেশ ধরে গ্রাম ত্যাগ করেছিল। অতএব, বুঝতেই পারছ শশাঙ্ক, তোমার এই গ্রাম সুরক্ষাবেষ্টনীতে ঘিরে ফেলার এক প্রহর পূর্বেই

বাবাক গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করেছে। যথেষ্ট সময় ছিল তার হাতে, সে সময় তাকে তার পুত্র করে দিয়েছিল।

এইবার পুত্র বিধোরক তার আসল খেলা শুরু করল। নিপুণভাবে নিজের ভূমিকা পালন করল। মনে করে দেখো, চারজন নজরদারই জানিয়েছে যে, বাবাক কুটিরে ফিরে এসে তার কার্যালয়ের চুল্লিতে আগুন জ্বেলেছিল। সকলেই ধরে নিয়েছিল যে, বাবাক কাজ করছে কিন্তু বাস্তবে তো সেসময়ে কুটিরে বাবাক ছিলই না। ছিল পুত্র বিধোরক যে অস্ত্রনির্মাণের কাজ জানেই না। তাহলে সে আগুন কেন জ্বালল পিতার চুল্লিতে?

উত্তরের আশায় পুনরায় শিষ্যদের দিকে চাইলেন চাণক্য। কিন্তু উত্তর না আসায় নিজেই উত্তরটা দিলেন,

— কারণ বিধোরকের পরিধানের ওই পিতার ছদ্মবেশ, নকল গোঁফ-দাড়ি জ্বালিয়ে ফেলা নিতান্তই প্রয়োজনীয় ছিল! ভেবে দেখো, যদি বাবাকের উধাও হওয়ার খবর পেয়ে কুটিরে প্রবেশ করে তোমরা দেখতে যে, বাবাকের পরনের কাপড় পড়ে রয়েছে তার কাঁধের ঝোলার সঙ্গে, তবে কি পরমুহূর্তেই তোমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হত না? সম্ভাবনা ছিল যে, গোটা পরিকল্পনাটাই তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সেই বস্ত্র পেলে। তাই সেগুলো আগে আগুন জ্বালিয়ে তাতে নিক্ষেপ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই কারণেই তোমরা পরের প্রহরে প্রবেশ করে দেখেছিলে যে, কার্যালয়ের চুল্লিতে খানিক আগেও কিছু জ্বালানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তপ্ত ধাতুর কোনো অর্ধনির্মিত অস্ত্র তোমরা পেলে না। কারণ কোনো অস্ত্র সেখানে তপ্ত করা হয়নি! আগুনে জ্বালানো হয়েছিল বিধোরকের ছদ্মবেশের বস্ত্র!

অনেকক্ষণ টানা কথা বলায় চাণক্যর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। চাণক্য পাশে রাখা পেয়ালা থেকে দু-ঢোঁক জল পান করে বললেন,

- হুমম। এর পরের কাজ সহজ ছিল। ছদ্মবেশ ছেড়ে, তা পুড়িয়ে, বিধোরক আরও একবার বেরোয় প্রথম দরজা দিয়ে এবং বাজারের পথ হয়ে পেছনের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে পুনরায় কুটিরে প্রবেশ করে। অবশ্যই পিতার ছদ্মবেশ ছাড়ার পর থেকে গোটা সময়টা সে পুনরায় খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। তৃতীয় প্রহর অবধি পরিকল্পনামতো সে অপেক্ষা করল। কারণ পিতা বাবাককে যথেষ্ট সময় দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যাতে সে গ্রামের সীমানা ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারে সেই সময়ের মধ্যে। তৃতীয় প্রহরে সে একে একে দুই দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে পিতার খোঁজ করল এবং নজরদারদের জানাল যে, তার পিতা কুটিরে নেই। তোমরা প্রবেশ করে দেখলে বাবাকের কাঁধের ঝোলাটা রাখা থাকলেও, সে নেই। পরবর্তী ঘটনা তো তুমি আমার থেকে বেশিই ভালো করে জানো, শশাঙ্ক।

মহারাজ সিন্ধুসেনা! মহারাজ!

- কী? কী হয়েছে, সেনাপতি? পূর্বের দিক থেকে এত কোলাহল কীসের? - - - মহারাজ! আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছে! দুই পাহাড়ের মাঝের গিরিপথ ধরে উপত্যকা পার করার সময়ে আমাদের সেনার উপর অতর্কিত শর-বৃষ্টি শুরু হয়! আমাদের সেনা দুই পাহাড়ের মাঝের মৃত্যুকূপে আটকে পড়েছে, মহারাজ!

৪০.

— কিন্তু... কিন্তু কে? কে আক্রমণ করল আমাদের?

মহারাজ, আমাদের উপর পর্বতেশ্বরের সেনা আক্রমণ করেছে।

চমকে উঠল সিন্ধুসেনা,

পর্বতেশ্বর? মানে, মলয়কেতু? কিন্তু সে কেন আমাদের উপর আক্রমণ করবে?

সিন্ধুপ্রদেশের প্রধানামাত্য পাশ থেকে বললেন,

- মহারাজ, মলয়কেতু কি তবে মগধের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?

সিন্ধুসেনার কপালে স্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছে। মগধ অবধি কোনোরকম আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না সে। মগধেও যেহেতু তার দ্বার খুলে দেওয়ার কথা অমাত্য রাক্ষসের অতএব সেখানেও সহজ জয় নিশ্চিত জেনেই যুদ্ধে এগিয়েছে সে।

তখনই আরও একটা সংবাদ তার কাছে নিয়ে এল আর এক গুপ্তচর,

মহারাজ! মহারাজ! পার্বত্য প্রদেশ থেকে ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ আছে।

কী সংবাদ এনেছ, গুপ্তচর?

মলয়কেতুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল মলয়নগরের রাজা সিংহনাদ, কাশ্যপনগরের রাজা পুষ্করক এবং পারস্যের রাজা মেঘনন্দ। মলয়কেতু তার আলোচনা সভার মধ্যেই মহারাজ সিংহনাদ আর পুষ্করককে হত্যা করেছে। সঠিক সময়ে আচার্য শকুনির থেকে সংবাদ পেয়ে মেঘনন্দ মাঝপথ থেকে ফিরে গিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে!

রাগে দাঁতে দাঁত চেপে সিন্ধুসেনা বলে উঠল,

— বিশ্বাসঘাতক মলয়কেতু! এইবার আমি নিশ্চিত হলাম যে, সে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার পিতার মতোই মগধের সঙ্গে মৈত্রী করেছে! আমি ওকে ছাড়ব না!

তখনই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ এল আরও একবার,

মহারাজ! দুঃসংবাদ আছে!

সিন্ধুসেনা গম্ভীরমুখে বললেন,

- হায় ইন্দ্রদেব! তুমি আজকে কেন এমন বিরূপ হলে আমার প্রতি? বলো দূত! কী ঘটছে এখন পূর্বে?

মহারাজ, আমাদের সেনা পরাজয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। অর্ধেক সেনা নিহত হয়েছে। আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছে তারা।

সিন্ধুসেনা একবার তার মন্ত্রী এবং সেনাপতির দিকে তাকাল। দু-জনই বিষণ্ণ চিত্তে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

সিন্ধুসেনা আদেশ দিল, – সেনাদের পিছিয়ে আসতে বলো। আমরা পরাজিত হয়েছি।

***

একটা উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করছে মলয়কেতু। তার জয় নিশ্চিত। সিন্ধুসেনার সেনাবাহিনী পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমশই। সিন্ধের অর্ধেক সেনা নিহত হয়েছে। উচিত জবাব দিতে পেরেছে সে ষড়যন্ত্রকারীকে। বাকি দু-জনকে সে হত্যা করেছে গতকালই। পারস্যের কাপুরুষটা পালিয়েছে, তবে জীবনে আর তার রাজ্যে পা দেওয়ার সাহস করবে না। শুধু আফশোস একটাই রয়ে গেল যে, শকুনি পালাতে পেরেছে। মহলের অন্দরেই যে তার গুপ্তচর আছে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই মলয়কেতুর। কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না। মহামাত্য এবং পদ্মা বাদে কেউ এই মুহূর্তে তার বিশ্বাসের পাত্র নয়।

– পর্বতেশ্বর মহারাজ মলয়কেতুর জয়!

মলয়কেতু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজের সেনাপতির দিকে দৃষ্টি ফেরাল। বলো, কী সংবাদ?

আমরা বিজয়ী হয়েছি, মহারাজ! সিন্ধের সেনা পিছিয়ে যাচ্ছে। আপনার আদেশ কী, মহারাজ? আমরা কি তাদের পিছু ধাওয়া করে আক্রমণ করব? নাকি তাদের পালিয়ে যেতে দেব?

কখনোই নয়! পালিয়ে যেতে দেব না ওদের। এটাই আমাদের সুযোগ! আমরা ওদের পিছু নিয়ে ধাওয়া করব এবং ওদের সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দেব।

সাবধান, মহারাজ। এ কাজ কিন্তু খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হবে। সিন্ধুর সেনার যা অবস্থা হয়েছে দুই পাহাড়ের মাঝের সরু পথে আটকে গিয়ে তা আমাদের সঙ্গেও ঘটতে পারে।

সুদীপ্তক এই সাবধানবাণী পাশ থেকে বললেন মহামাত্য। কিন্তু জয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মলয়কেতু তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। সে বলে উঠল,

ঝুঁকি না নিলে বড়ো কিছু অর্জন করা যায় না, মহামাত্য। সেনাপতি, সামন্তদের বলুন সিন্ধুসেনার বাহিনীকে ধাওয়া করে আক্রমণ চালিয়ে যেতে।

সেনাপতি একবার সুদীপ্তকের দিকে চেয়ে উত্তর না দিয়ে রাজার প্রতি নিঃশব্দ অভিবাদন জানিয়ে প্রস্থান করল। সুদীপ্তক শুধু একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন এইবার তাঁর মনের আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হয়।

***

কুলূতের রাজধানী নাগরের দুর্গের প্রাঙ্গণে হেঁটে বেড়াচ্ছেন সেনাপতি সিংহরণ। তিনি মগধের সেনাপতি এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর একান্ত বিশ্বস্ত মানুষ। চাণক্য গান্ধার যাওয়ার আগে তাঁকেই কুলূতের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে এও বলে গিয়েছেন যে, খুব শীঘ্রই আগামী পদক্ষেপের জন্যে তৈরি থাকতে। আজীবন যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েও সিংহরণ যুদ্ধ পছন্দ করেন না। এই পুষ্পবাগিচা তাঁকে অনেক বেশি শান্তি দেয়। লাল রক্তের চেয়ে লাল গোলাপ তাঁর কাছে বেশি কাঙ্ক্ষিত। অথচ গোটা আর্যাবর্ত তাঁকে এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলে জানে। শুধু তাই নয়, এককালে তিনি যখন গান্ধারের সেনাপতি ছিলেন, সেসময়ে চাণক্য তাঁর কাছে কিশোর চন্দ্রগুপ্তকে পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধকলা শিখতে। তাই তিনি সম্রাটের অস্ত্রগুরুও বটে।

— সেনাপতি সিংহরণ।

এক সামন্ত এসে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানাল তাঁকে। সিংহরণ তার দিকে ঘুরতে একটি পত্র বাড়িয়ে দিল সৈনিক। বলল,

গান্ধারের সীমান্ত থেকে আচার্য চাণক্যর পত্র এসেছে।

সিংহরণ পত্রটি নিয়ে দ্রুত পাঠ করলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। বললেন,

মলয়কেতুর আদেশে সমস্ত সেনা রাজধানী ছেড়ে যুদ্ধ করতে রাজ্যছাড়া। রাজধানী অরক্ষিত রয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনী তৈরি তো, সামন্ত?

হ্যাঁ, সেনাপতি। মগধের সঙ্গে কুলূতের সেনা জুড়ে আমরা এই মুহূর্তে যথেষ্ট শক্তিশালী।

আশা রাখি, আমাদের শক্তি প্রদর্শনের বিশেষ প্রয়োজন পড়বেও না। আমাদের দিক থেকে প্রায় রক্তপাতহীন হবে এই যুদ্ধ।

আদেশ করুন, সেনাপতি।

আজকে দ্বিতীয় প্রহরেই আমরা দু-লক্ষ সেনা নিয়ে পর্বত্যকা রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যে কুচ করব। আমাদের উদ্দেশ্য হবে মলয়কেতু সিন্ধুর সেনার সঙ্গে যুদ্ধশেষে তার রাজধানী ফিরে আসার আগেই রাজধানী দখল করা।

— কিন্তু সেনাপতি, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

— বলুন, সামন্ত।

আমরা মাত্র দু-লক্ষ সেনা নিয়ে অরক্ষিত রাজধানীর দখল নিতে পারব ঠিকই। হয়তো দুর্গের আড়ালে থেকে কয়েক দিন মলয়কেতুর সেনাকে প্রতিহতও করতে পারব। কিন্তু তা বেশিদিনের জন্যে নয়।

— জানি, সামন্ত। তার বেশি প্রয়োজনও আমাদের পড়বে না।

একথা এত বিশ্বাসের সঙ্গে আপনি কীভাবে বলছেন সেনাপতি?

- কারণ আমি আচার্য চাণক্যর উপর বিশ্বাস রাখি।

৪১.

জীবসিদ্ধি এবং শশাঙ্ক কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে রইল। বিস্ময়ের ঘোর এখনও মুখে কথা জোগাচ্ছে না। গোটা ব্যাপারটা প্রথম থেকে গুছিয়ে ভাবার চেষ্টা করছে তারা।

জীবসিদ্ধি প্রশ্ন করল,

— কিন্তু গুরুদেব...

চাণক্য উৎসাহী ভঙ্গিতে জীবসিদ্ধির দিকে চেয়ে বলল,

বলো, জীবসিদ্ধি। যা প্রশ্ন মনে আছে, তা বলে ফেলো।

— সবই এখন স্পষ্ট হল, আচার্য। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না। বাবাক ও বিধোরকের এত কিছু করার প্রয়োজন কী? তারা কেন এক অচেনা তিরন্দাজকে রক্ষা করতে নিজেরা এত কিছু করল? গোটা বিষয়টায় কোনো একটা দিক যেন এখনও উন্মোচন হওয়া বাকি আছে।

চাণক্য গম্ভীর হলেন। বললেন,

- হুম। ঠিকই বলেছ হে, জীবসিদ্ধি। পিতা-পুত্র কেন এত কিছু করল? তারা তো কিছু না করেও নিজেদের দৈনন্দিন জীবন কাটিয়ে যেতে পারত। একদিননা-একদিন মগধ হতাশ হয়ে ফিরে যেত তাদের নজরবন্দি দশা থেকে মুক্তি দিয়ে। তবে কোন গূঢ় কারণে এত আয়োজন? এই প্রশ্ন আমিও কুলূত থেকে গান্ধার আসার পথে বারংবার ভেবেছি।

কিন্তু উত্তর পাইনি। তোমারই মতো আমারও মনে হয়েছে কোনো একটা রহস্য আছে যা আমরা ধরতে পারছি না। উত্তরটা আমি এখানে এসে খুঁজে পেলাম বিধোরকের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর।

বিধোরক?

- হুমম। এবার তাকে বন্দি করার সময় এসেছে।

শশাঙ্ক বলল,

আমি এখুনি সৈনিকদের আদেশ দিচ্ছি ওই মিথ্যাবাদীকে বন্দি করে এখানে হাজির করতে। ওর মুখ খোলানো কঠিন হবে না। আমরা শকুনির তিরন্দাজ হত্যাকারীর সম্বন্ধে কিছু সূত্র নিশ্চয়ই খুঁজে পাব।

চাণক্য হাত তুলে শশাঙ্ককে বাধা দিয়ে বললেন,

— না, শশাঙ্ক। তাকে এখান অবধি বন্দি করে আনাটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। -

আমরা নিজেরাই বরং তার কুটিরে যাব তাকে বন্দি করতে। তোমরা সঙ্গে অস্ত্র নাও এবং দশজন সৈনিককে সঙ্গে আসতে বলো।

শশাঙ্ক কিছুটা অবাক হয়ে বলল,

— ঝুঁকি? কীসের ঝুঁকি, আচার্য?

চাণকা উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দেখাদেখি জীবসিদ্ধি আর শশাঙ্কও উঠে দাঁড়াল।

বাবাকের কুটিরে যখন চাণক্য পৌঁছালেন তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে। আকাশে তখনও কিছুটা রক্তিম আভা লেগে আছে।

— বিধোরক! গৃহে আছ?

দরজার বাইরে থেকে শশাঙ্ক ডাক দিল। চাণক্যর কথামতো পেছনের দরজায় চারজন সৈনিক অপেক্ষায় রয়েছে এবং আরও চারজন সৈনিক গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। দরজায় শুধুমাত্র চাণক্য, জীবসিদ্ধি, শশাঙ্কসহ দু-জন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ বাদেই দরজা খুলে প্রদীপ হাতে বিধোরক বেরিয়ে এল। তাদের দেখে বলল,

- ও, আপনারা। পিতার কোনো খোঁজ পেলেন বুঝি?

শশাঙ্ক কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

উত্তর চাণক্য দিলেন,

- না, বিধোরক। পাইনি এখনও। আমরা এসেছি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে। এই কুটিরে কোনো গোপন দ্বার আছে কি না সেটাও আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই নিজে।

ও। আসুন।

দু-জন সৈনিকসহ তারা তিনজন কুটিরে প্রবেশ করল। তিনজন আসন গ্রহণ করল, মুখোমুখি বসল বিধোরক। তাদের মাঝখানে রাখা প্রদীপটা ঘরটাকে ভালোই আলোকিত করছে। দু-জন সৈনিক দাঁড়িয়ে রইল। চাণক্য বসে কিছুক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে বিধোরক বলল,

কই? আপনি গোপন দরজা খুঁজবেন না? আমিও সাহায্য করব। আমার বাবা ছাড়া কেউ নেই। তাঁকে খুঁজে দিন।

চাণক্য উত্তর না দিয়ে আরও কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, বিধোরক, ওই বিশেষ তির যে বানাতে দিয়ে যেত তোমাদের, তার বর্ণনা দাও।

সকালেই তো বললাম, ব্রাহ্মণদেব।

দয়া করে আরও একবার বলো।

মধ্যবয়স্ক, কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় শরীর। এই দেশের মানুষ।

চাণক্য হেসে বললেন,

প্রায় একই বর্ণনা তোমার পিতাও শশাঙ্কর কাছে বলেছিল শুনেছি। এই বর্ণনা শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। কেন জানো? কারণ এই বর্ণনার ঠিক বিপরীত হল— অল্পবয়সি কিশোর, গৌরবর্ণ বিদেশি। মধ্যম উচ্চতা, শরীর আর পাঁচটি কিশোরের মতোই সাধারণ। ভেবে দেখো জীবসিদ্ধি, এই বর্ণনা কার সঙ্গে মেলে?

পাঁচজনেরই দৃষ্টি একসঙ্গে ঘুরে গেল বিধোরকের দিকে। চাণক্য বললেন,

মানুষের মনস্তত্ত্ব বড়োই অদ্ভুত। ধরো কারুর কাছে এমন একজন ব্যক্তির বর্ণনা দিতে বলা হল যাকে সে আড়াল করতে চায়। তবে স্বাভাবিকভাবেই কী করবে? সে আসল ব্যক্তির ঠিক উলটো বর্ণনা দেবে যাতে আসল ব্যক্তির সঙ্গে কোনোভাবেই মিল খুঁজে পাওয়া না যায়।

বিধোরকের মুখে এখনও একইরকমের কৈশোরের সারল্য। সে চাণক্যর কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারছে বলে মনে হল না। শশাঙ্কর এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে চাণক্যর কথা! এ কীভাবে সম্ভব? এ কী বলছেন আচার্য চাণক্য?

চাণক্য দৃঢ়ভঙ্গিতে বলে চলেছেন,

– তোমার পিতার উধাও হয়ে যাওয়ার রহস্যের সমাধান অনেক আগেই আমি করতে পেরেছিলাম চার নজরদারের কথা থেকেই। কিন্তু এত কিছুর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হচ্ছিল না। যদি ধরেও নিই যে, তোমরা শকুনির কথায় কাজ করছ, তবুও তোমার পিতা তার নিজের এবং পুত্রের জীবন বিপন্ন কেন করবে এক ক্রেতাকে বাঁচাতে? কাকে আড়াল

করতে তোমার পিতা রাষ্ট্রদ্রোহের মতো চরম দণ্ডনীয় অপরাধ করতেও পিছপা হলেন না? এর উত্তর আমিও ভেবে পাইনি। উত্তরটা আমিও খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই পেলাম। স্বীকার করছি আমি আগে থেকে অনুমান করতে পারিনি তোমার বিষয়ে, বিধোরক। কিন্তু তোমার সঙ্গে সকালে সাক্ষাতের সময়েই দুটি বিষয় নিয়ে মনে সন্দেহ জাগে। প্রথমটা অবশ্যই ওই ব্যক্তির বর্ণনা নিয়ে যা বুঝতে পারি ঠিক তোমার বিপরীত। দ্বিতীয়ত যেটা চোখে পড়ে সেটা হল তোমার হাতের দুটি কড়া। একবার নিজের দু-হাত আলোর কাছে ধরবে, বিধোরক?

আজ্ঞাকারী ছাত্রের ন্যায় বিধোরক তার দু-হাত মেলে ধরল প্রদীপের কাছে। কক্ষে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তার হাতের উপর এসে পড়ল।

চাণক্য বললেন, – আজ সকালেই আমি এই দু-হাতের, দুটি ভিন্ন স্থানে এই কড়া দেখেছিলাম। কড়া পড়ে দীর্ঘ সময় ধরে চামড়ার একই জায়গায় ঘর্ষণের ফলে। যেমন কয়েক বর্ষ যাবৎ অত্যধিক লেখালেখির ফলে ইদানীং আমার ডান হস্তের তর্জনীর একধারে কড়া পড়ে যাচ্ছে। একজন হলধর কৃষকের যেমন দু-হাতের আঙুলের গোড়ায় কড়া থাকে। সেরকমই ডান হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মাথায় এবং বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যবর্তী স্থানে চামড়া শক্ত হয়ে কড়া পড়ে গিয়েছে। এই কড়া আমি আগেও দেখেছি কয়েক জনের হাতে। যেমন কুলূতে দেখেছিলাম এই একইরকমের কড়া বিন্দুর দু-হাতে। বহু বছর ধরে বাম হাতে ধনুক ধরে, ডান হাতের দু-আঙুলের সাহায্যে গুণে বাণ টেনে বাণ চালানোর অভ্যাস থাকলে হাতে এই বিশেষ দুই স্থানে এরকম কড়া পড়ে। তোমার আঙুলে এরকম কড়া পড়ার অর্থ হল যে, তুমি অমানুষিক রকমের অভ্যাস করেছ এবং তুমি একজন দক্ষ ধনুর্ধর। আমি কি ভুল বললাম, বিধোরক?

মুহূর্তের মধ্যে জীবসিদ্ধি ও শশাঙ্ক দেখল হাবাগোবা বিধোরকের মুখের ভাব বদলে তাতে একটি নৃশংস ভাব ফুটে উঠল। ঠিক যেন কোনো জংলি চতুষ্পদ শিকারিদের সম্মুখে এসে পড়েছে।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে গিয়ে কিছু করার আগেই আচমকা সামনে থাকা প্রদীপের শিখায় ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল বিধোরক! গোটা কুটির ডুবে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে!

৪২.

সেনাছাউনিতে নিজের রাজকীয় তাঁবুতে বসে আছে রাজা মলয়কেতু। তার সঙ্গী পদ্মা এবং প্রধানমন্ত্রী সুদীপ্তক। সবে সোমরসের একটি পাত্র শেষ করে দ্বিতীয় পাত্রে চুমুক

দিয়েছেন রাজা। তখনই উদ্বিগ্ন হয়ে সেনাপতি প্রবেশ করল। প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়ার কথাও তার মনে রইল না।

মহারাজ! মহারাজ!

মলয়কেতু কিছুটা বিরক্ত হলেও সেনাপতির মুখ দেখে অনুমান করতে পারল গুরুতর কোনো বিপদ হয়েছে। জানতে চাইল,

কী হয়েছে সেনাপতি? যুদ্ধ তো আমরা জয় করেছি। সিন্ধুসেনা মৃত। তাহলে কী কারণে তুমি উদ্বিগ্ন?

- মহারাজ! আমাদের সেনা আক্রান্ত! উপত্যকা পার করার সময়ে আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। কেউ একই রণনীতিতে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে, যেভাবে আমরা সিন্ধের সেনাকে ধ্বংস করেছি! –

সেকী? কিন্তু কে আক্রমণ করবে আমাদের উপর?

এখনও আমরা নিশ্চিত নই। এমনকী আমাদের শত্রুর সেনাসংখ্যা সম্বন্ধেও আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি! আক্রান্ত সৈনিক কয়েক জন এসে জানিয়েছে বিশাল এক সেনাবাহিনী আমাদের আক্রমণ করেছে!

মন্ত্রী সুদীপ্তক হায় হায় করে উঠলেন,

সর্বনাশ হয়েছে, মহারাজ! আমি পূর্বেই সাবধান করেছিলাম। ওই দুটি পাহাড়ের মাঝের গিরিপথ মৃত্যুফাঁদ। আমি সাবধান করেছিলাম যে, ওই পথে আমাদের সেনা যেন না এগোয়।

গলা কাঁপতে লাগল মলয়কেতুর,

– চ… চুপ করুন! একদম চুপ! সেনাবাহিনীর কত ভাগ আটকে আছে উপত্যকা অঞ্চলে?

শেষ প্রশ্নটা সেনাপতির উদ্দেশে করা হয়েছে। সেনাপতি উত্তর দিল,

– অর্ধেক সেনা আটকে আছে। -

বেশ। বাকি অর্ধেক তো আমাদের সঙ্গেই আছে। আমরা রাজধানীর কাছাকাছিই আছি। একবার আমাদের রাজধানীর সুরক্ষিত প্রাচীরের অন্দরে প্রবেশ করলেই আমরা সুরক্ষিত। আমরা যত দ্রুত সম্ভব রাজধানীর দিকে এগোব।

প্রধানমন্ত্রী সুদীপ্তক বললেন,

– কিন্তু আমাদের বাকি অর্ধেক সেনার কী হবে, মহারাজ? আমরা হয়তো সুরক্ষিতভাবে পৌঁছে যাব। কিন্তু যারা উপত্যকা অঞ্চলে অচেনা যুদ্ধে লিপ্ত? তাদের কী হবে?

মলয়কেতু উত্তর দেওয়ার পূর্বেই পদ্মা বলে উঠল,

রাজার জীবনের দাম সবচেয়ে বেশি। প্রতিটা যুদ্ধেই মূল লক্ষ্য থাকে যেন মহারাজের প্রাণসংশয় না ঘটে, তাই না প্রধানামাত্য মহাশয়? তাই আমার মনে হয় মহারাজ উচিত কথাই বলেছেন। আমাদের অর্ধেক সেনা নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করা উচিত।

পদ্মার কথায় মলয়কেতু দ্বিগুণ উৎসাহে বলল,

– হ্যাঁ। সেনাপতি, আপনি রাজধানীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। সেনাপতির মুখের অভিব্যক্তি কঠিন হল। বললেন,

বেশ, মহারাজ। আপনারা এগিয়ে যান। কিন্তু আমি আমার সহযোগীদের পরিত্যাগ করতে পারব না। আপনারা এগিয়ে যান। আমি ফিরে যাচ্ছি উপত্যকা অঞ্চলে। সৈন্যদের মধ্যে কেউও যদি আমার সঙ্গী হতে চায়, তাহলে আমি তাদের বাধা দিতে পারি না।

মলয়কেতু প্রচন্ড অপমানিত বোধ করলেও কিছু বলতে পারল না। মহামাত্য সুদীপ্তক বলে উঠলেন,

– আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই, সেনাপতি।

মলয়কেতুর আজ্ঞার অপেক্ষা না করেই দু-জন বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে। বিহ্বল মলয়কেতু একা দাঁড়িয়ে রইল তাদের গমনপথের দিকে চেয়ে। তখনই অনুভব করল নিজের হাতে নারী হাতের স্পর্শ। পদ্মা তার কানের কাছে মুখ রেখে বলল,

আপনার সঙ্গে আমি আছি, মহারাজ। আমি আমার মহারাজকে পরিত্যাগ করব না।

***

মাত্র কয়েক হাজারের সেনাদল নিয়ে রাজধানীর সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে মলয়কেতু। তার বেশিরভাগ সেনাই সেনাপতি ও মহামাত্যকে অনুসরণ করে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যুদ্ধক্ষেত্রেই গিয়েছে।

নগরের বন্ধদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে একজন সামন্ত এগিয়ে গেল দ্বারের কাছে। – দ্বার খোলো শীঘ্র! মহারাজ মলয়কেতু অপেক্ষা করছেন। আমাদের পশ্চাতে শত্রুসেনা ধাবমান! শীঘ্র আমাদের প্রবেশ করতে দাও।

কিন্তু ওদিক থেকে কোনো শব্দ এল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় সামন্ত বলল,

– কোথায় আছ, সৈনিকরা? দ্বার খোলো এখুনি! শত্রুরা যে কাছে এসে পড়ছে প্রতিমুহূর্তের বিলম্বে।

মলয়কেতু পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখল দিগন্তরেখা বরাবর ধুলোঝড় উঠেছে। বুক কেঁপে উঠল মলয়কেতুর। কারণ সে জানে ওটা ধুলোঝড় নয়। ওটা কোনো এক বিশাল সেনাবাহিনীর রণমত্ত, ক্রমধাবমান পদক্ষেপে ওঠা ধুলোর কুণ্ডলী! ওই, এখন তাদের

পতাকাটা দেখা যাচ্ছে। ধুলোর জন্যে সেটার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ক্রমশই তা স্পষ্ট হয়ে আসছে।

নগরের উঁচু প্রাচীরের উপর কাদের যেন পদক্ষেপ শোনা গেল। কিছুক্ষণ বাদেই ঠিক প্রধান দ্বারের উপরে এসে দাঁড়ালেন সিংহরণ। মলয়কেতু চেঁচিয়ে উঠল,

— কে রে তুই?

সিংহরণ চেঁচিয়ে উত্তর দিল,

— আমি মগধের সেনাপতি সিংহরণ। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর আদেশে এই নগর এখন মৌর্যদের অধীনে।

— কী বলছে এই উন্মাদটা? সামন্ত, এখুনি বাণ নিক্ষেপ করে একে হত্যা করো।

কিন্তু পরমুহূর্তে প্রাচীরের উপরে সারিবদ্ধভাবে কয়েক হাজার মগধের সৈনিক উঠে দাঁড়াল প্রত্যেকের হাতের ধনুক, বাণ চড়িয়ে নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সেনাবাহিনীর দিকে নিশানা বাঁধা। হয়তো-বা মলয়কেতুর সেনার সিংহরণের সেনার যুদ্ধ শুরু হত। কিন্তু তার আগেই এক সৈনিক কাঁপা গলায় বলল,

— ম... মহারাজ! দেখুন!

কয়েক জন সৈনিক পেছন থেকে আসতে থাকে সেনাবাহিনীর দিকে। একটি উঁচু টিলার উপর রাজধ্বজা হাতে কয়েক জন ঘোড়সওয়ারকে এখন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। পতাকার চিহ্ন স্পষ্ট হয়েছে। নীল-সবুজ ধ্বজে শোভা পাচ্ছে স্বর্ণালি পেখম মেলা ময়ূর চিহ্ন। পতাকা দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসতেই বুক কেঁপে উঠল মলয়কেতু ও তার সেনাবাহিনীর। অপরদিকে চরম উল্লাসে ফেটে পড়ল প্রাচীরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদল। কারণ এই ধ্বজা, এই চিহ্ন সকলের পরিচিত। ভয়ভীত কণ্ঠে গুঞ্জন উঠল মলয়কেতুর সেনার মধ্যে। একটাই শব্দ তারা উচ্চারণ করল সকলে,

মৌর্য!

দূরে ছোটো টিলার উপর দাঁড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ সামরিক সাজে ঘোড়ার উপর বসে মৌর্যবাহিনীকে যে সেনানায়ক পরিচালনা করছে, তাকে তার সেনাদলের কেউ চিনতে না পারলেও মলয়কেতু ঠিকই চিনেছে। বিশাল মৌর্য বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং তাদের সম্রাট!

চন্দ্রগুপ্ত বহুদূর থেকেও যেন মলয়কেতুর হৃদয়ের ভয় টের পেল। সম্মুখ ও পশ্চাৎ দু-দিক থেকে দ্বৈত আক্রমণে অসহায় মলয়কেতুর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রগুপ্তর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। নিজের তরবারি মাথার উপর তুলে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হুংকার দিয়ে উঠল,

আক্রমণ!

* * *

স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মলয়কেতু। তার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। তীব্র ভয়ে তার মস্তিষ্ক জবাব দিয়ে দিয়েছে। তার সেনা তার নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকেই যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়ছে। মলয়কেতু বজ্রাহতর মতো নিজের ঘোড়ার পিঠে স্থাণু দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে।

পদ্মা তার হাত ধরে টান দিল,

মহারাজ! এখুনি এই যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়তে হবে আমাদের।

মলয়কেতু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার পাশের ঘোড়ায় বসে থাকা পদ্মার দিকে। আবার বলল সে,

চলুন, মহারাজ! আর বিলম্ব নয়! চলুন, আমার সঙ্গে। আমরা বনের ভেতরের সেই প্রমোদ কুটিরে পালিয়ে যাই। আমি সঙ্গে আছি আপনার মহারাজ! চলুন!

মলয়কেতু ভাবনা চিন্তা করার অবস্থায় এমনিতেও ছিল না। অতএব ঘোরলাগা অবস্থায় পুতুলের মতো পদ্মার দেখানো পথে তাকে অনুসরণ করল।

***

মৌর্যদের জয় নির্বিকল্প হয়েছে। সিন্ধ ও পর্বত্যকা রাজ্যের সর্বত্র এখন ময়ূর চিহ্নের বিজয়পতাকা উড়ছে। মলয়কেতু আবারও তার সেনা, তার রাজ্যকে পরিত্যাগ করে ভীরুর ন্যায় পালিয়েছে।

বন্দি অবস্থায় আনা হয়েছে মহামাত্য সুদীপ্তক ও সেনাপতিকে। হঠাৎ প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে সেনাদের মধ্যে থেকে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল এক দীপ্তমান যুবক। যুবক তাদের দু-জনের পরিচিত হলেও, পরনে সামরিক সাজ, বর্ম ও চারিদিক থেকে ওঠা হর্ষধ্বনি থেকে তাদের বুঝতে বাকি রইল না এই যুবকের পরিচয়।

‘মগধাধীশ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর জয়!’

‘মহা পরাক্রমী বীর, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর জয়!’

‘আর্যাবর্ত শাসক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর জয়!’

মাথার সামরিক শিরস্ত্রাণ খুলে চন্দ্রগুপ্ত বলল,

একী? এঁদের এভাবে বন্দি কেন করা হয়েছে? এখুনি মুক্ত করো মহামাত্য ও সেনাপতিকে।

দু-জন সৈনিক এগিয়ে এসে সুদীপ্তক ও সেনাপতিকে বন্ধনমুক্ত করল। চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমি হর্ষিত হলাম, আর্য সুদীপ্তক। আমার গুরু আচার্য চাণক্যর কাছে আপনার প্রশংসা শুনেছি। আর সেনাপতি, আপনি ধন্য! আপনি বিপদে নিজের সেনাকে পরিত্যাগ করেননি। আপনি বীর আর্য! চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর অভিবাদন গ্রহণ করুন।

সুদীপ্তক নিশ্চিত হতে পারছে না যে, তার সামনে দাঁড়ানো মগধপতি তাদের সঙ্গে পরিহাস করছে কি না। পরাজিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সেনাপতির প্রতি কোন বিজয়ী রাজা সম্মান প্রদর্শন করে?

চন্দ্রগুপ্ত আবারও বললেন,

— আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, আপনাদের সেনাবাহিনীর প্রাণহানি আমরা করিনি। অন্তত চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব রক্তপাতহীন হয় সেভাবেই রণকৌশল অবলম্বন করতে। আপনাদের অর্ধেক সেনা গিরিপথে আটকে আছে। আমরা শুধুই তাদের পথ আটকে তাদের উপত্যকায় আটকে রেখেছি। প্রাণহানি তাদের হয়নি বলাই চলে।

এইবার বিস্মিত হলেন সুদীপ্তক ও সেনাপতি। সুদীপ্তক বললেন, বেশ, শুনে খুশি হলাম, সম্রাট। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আপনি কী করতে চান?

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই চন্দ্রগুপ্ত উত্তর দিলেন,

আমার ইচ্ছা আপনি আমাদের মৌর্যদের মার্গদর্শন করুন! আমি আচার্য চাণক্য ও মহামতি রা— মানে কাত্যায়নের আশীর্বাদ পেয়েছি ইতিমধ্যে। আপনি ও সেনাপতি যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন তবে আমি খুবই খুশি হব। এটাই আমার একান্ত অনুরোধ আপনাদের প্রতি, আর্য।

সেনাপতি এবং সুদীপ্তক একে অন্যের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিল। সেনাপতি বলল,

- - আর যদি আমরা আপনার সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করি?

তবে আপনারা মুক্ত।

আমরা মুক্ত? আপনি আমাদের নিঃশর্তে মুক্তি দেবেন?

অবশ্যই। এই আমার গোটা সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি কথা দিলাম। আপনারা যদি আমায় সাহায্য করতে ইচ্ছুক না হন তবে আপনারা মুক্ত। আপনাদের সৈনিকদের জন্যেও একই কথা প্রযোজ্য। তারা যদি স্বইচ্ছায় মৌর্যসেনার অংশ হতে চায় তবে তারা স্বাগত। অন্যথায় তারা মুক্ত।

সেনাপতি সিংহরণ এতক্ষণ সব শুনছিলেন। সম্রাটের কথা শেষ হতে তিনি বন্দি সেনাদের উদ্দেশে বললেন,

- শুনলে? শুনলে তোমরা আমাদের সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর কথা? এইবার বলো! তোমরা কি সেই রাজার বিশ্বস্ত থাকতে চাও যে রণভূমিতে তোমাদের পরিত্যাগ করে কাপুরুষের মতো নিজের প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করে? নাকি, সেই সম্রাটকে নিজেদের অধিনায়ক হিসাবে পেতে চাও যে নিজের সৈনিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের রক্ত ঝরিয়ে তাদের গৌরবময় জয় এনে দেয়?

অন্যদিকে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল মগধের সেনা আবারও প্রবল জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। মলয়কেতুর সেনাদের মন বুঝতে অভিজ্ঞ সুদীপ্তক ও সেনাপতির সময় লাগল না। সুদীপ্তক জানে গোটা ঘটনাটা এমনভাবেই ঘটানো হয়েছে যাতে বিনা যুদ্ধে, স্বইচ্ছায় পর্বত্যকার সেনা মৌর্যদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই গোটা পরিকল্পনা কার মস্তিষ্কপ্রসূত সেটাও অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছে না তার। নাহ্, সত্যিই আপনি এযুগের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আচার্য। মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না সুদীপ্তক।

– তাহলে? আপনাদের নির্ণয় কী, মহামাত্য? সেনাপতি?

প্রশ্নটা করে হাসিমুখে নিজের ডান হাত তাঁদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। প্রথমে সুদীপ্ত এবং তারপর সেনাপতি সেই বাড়িয়ে দেওয়া হাতের উপর নিজেদের ডান হাত রাখলেন।

এইবার মৌর্যসেনার হর্ষধ্বনিতে যোগ দিল পর্বত্যকা সেনাবাহিনী।

৪৩.

কুটির অন্ধকার হতেই জীবসিদ্ধি তার সহজাত প্রবৃত্তি অবলম্বন করেই, তরবারি হাতে চাণক্যর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে টের পেল পাশ থেকে একজন প্রহরী ও শশাঙ্ক চিৎকার করে ঝাঁপাল বিধোরক যেখানে বসে ছিল সেদিকে। অন্ধকারে ধস্তাধস্তির মধ্যেই কেউ একজন সবেগে দরজার দিকে ছুটল বলে মনে হল, পেছনে কেউ ধাওয়া করল। কিন্তু হঠাৎ প্রথমজনকে থেমে যেতে হল।

পরমুহূর্তে দরজার দিক থেকে আলো ঢুকল ঘরে, দু-জন প্রহরী কুটিরে প্রবেশ করল। একজনের হাতে খোলা তরবারি, অন্যজনের হাতেও তাই, সঙ্গে অন্য হাতে মশাল। তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিধোরক। মাটি থেকে উঠছে শশাঙ্ক আর একজন সৈনিক। তার হাতে একটা ছোটো ছুরি। সেটা সে সম্ভবত এতক্ষণ নিজের কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে রেখে বসে ছিল। শশাঙ্কর হাতে এক জায়গায় সামান্য কেটেছে দেখল জীবসিদ্ধি।

সম্ভবত ওই ছুরির আঘাতেই। জীবসিদ্ধি অনুমান করতে পারল কী ঘটেছে। ঘর অন্ধকার করে পালানোর চেষ্টা করেছে বিধোরক, শশাঙ্ক আর এই প্রহরীর সঙ্গেই ধস্তাধস্তি হচ্ছিল। কিন্তু চিৎকার শুনে বাইরে লুকিয়ে থাকা সৈনিকরা দরজা দিয়ে ঢুকে আসায় বিধোরক পালাতে পারেনি।

দ্রুত ঘুরে গিয়ে পেছনের দরজার দিকে দৌড়াল বিধোরক। কিন্তু কুটিরের ভেতরে থাকা দ্বিতীয় সৈনিক তার পথ আটকে দাঁড়াল। ততক্ষণে পেছনের দরজা দিয়েও দু-জন সৈনিক ঢুকে এসেছে। বিধোরককে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাটিতে যে সৈনিকটি পড়ে ছিল সেও উঠে দাঁড়িয়েছে। পেছন থেকে সে ঝাঁপিয়ে বিধোরকের ছুরি ধরা হাত চেপে ধরল। অপর হাতটি ততক্ষণে শশাঙ্ক ধরে ফেলেছে।

নিষ্ফল প্রতিরোধ কোরো না, বিধোরক! তুমি যতই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হও না কেন, মগধের ছ-জন প্রথম সারির সশস্ত্র যোদ্ধার সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে না।

চাণক্য বলে উঠলেন ঠান্ডা গলায়। জীবসিদ্ধি আশা করেনি চাণক্যর কথায় ফল হবে। কিন্তু তা হল। বিধোরক তার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা বন্ধ করল। ধীরে ধীরে হাতের মুষ্টি আলগা করে দিতে তার হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেল মেঝেতে। সৈনিক দু-জন মুহূর্তে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বিধোরকের দু-হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। বিধোরককে হাঁটুতে ভর করে মেঝেতে বসাল সৈনিকরা। চাণক্য ধীর পায়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন,

বিধোরক। তোমায় আমি কিছু প্রশ্ন করব। সেগুলোর যথাযথ উত্তর পেলে তোমার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব আমি নিতে পারি এবং তোমায় কোনো নির্যাতন করা হবে না, কথা দিতে পারি। অন্যথায় তুমি জানো তো, লোকে বলে মগধের কারাগারের সামন্তদের সামনে প্রস্তরখণ্ডও মুখ খোলে। -

বিধোরক এতক্ষণ মাথা নীচু করে ছিল। এইবার চোখ তুলে চাণক্যর চোখে চোখ রাখল। বলল,

আমি জীবন মৃত্যুর কথা কেই-বা বলতে পারে, চাণক্য? ওই যে দেখো, এই কক্ষে মৃত্যুর ঘ্রাণ পাচ্ছি, চাণক্য। তুমি কি পাচ্ছ তার গন্ধ? সে কিন্তু ইতিমধ্যে থাবা বসিয়েছে।

তার চোখের দৃষ্টিতে ও কথায় যেন কিছুর অশুভ ইঙ্গিত পেল জীবসিদ্ধি। সম্ভবত চাণক্যও সেরকমই কিছু অনুভব করেছেন কারণ জীবসিদ্ধি দেখল চাণক্য তাঁর অন্তরভেদী চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বিধোরকের দিকে, যেন তিনি তার মনের কথা বোঝার চেষ্টা করছেন। হঠাৎই চাণক্যর চোখে তীব্র আতঙ্ক ফুটে উঠল। না! না না না! হে বিষ্ণু! না!

ভয়মাখা কণ্ঠে চাণক্য কথা বলতে বলতেই তাকালেন শশাঙ্কর দিকে। জীবসিদ্ধি আচার্যর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেল কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ছে শশাঙ্ক! তার চোখের মণি উলটে যাচ্ছে। প্রবল খিঁচুনিতে মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তার।

শশাঙ্কর দিকে ছুটে গেল জীবসিদ্ধি ও চাণক্য। শশাঙ্কর শরীর ধরে ফেলল তারা দু-জন। চাণক্য উন্মাদের মতো শশাঙ্কর শরীর ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করছেন,

— না, না! বিষ্ণু রক্ষা করো! চোখ খোলো, শশাঙ্ক! দয়া করে চোখ খোলো!

জীবসিদ্ধিও হতবুদ্ধির মতো শশাঙ্ককে ডাকছে,

- কী হচ্ছে তোমার, মিত্র? কী হচ্ছে শশাঙ্কর, আচার্য?

- ওই ছুরির ফলায় বিষ ছিল! যে বিষ বাণে ব্যবহার করা হত!

- শশাঙ্কর মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোনো শুরু হয়েছে। মস্তিষ্কে বায়ু পৌঁছাতে না পেরে মুখ নীল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। গ্যাঁজলা ওঠা মুখেই শশাঙ্ক শুধু উচ্চারণ করল,

আচার্য... কন্যা... নাম...

শেষবারের মতো একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল শশাঙ্ক। পাথরের মতো তার মাথা নিজের কোলে নিয়ে চাণক্য বসে রইল, শশাঙ্কর এক হাত নিজের দুহাতে চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল জীবসিদ্ধি।

জীবসিদ্ধির কানে হাসির আওয়াজ এল। ভেজা চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল বিধোরক হাসছে! অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছে সে তাদের দেখে।

জীবসিদ্ধি সহ্য করতে না পেরে তরবারি তুলে বিধোরককে হত্যা করতে উদ্যত হতে চাণক্য তার হাত চেপে থামাল। শশাঙ্কর নীল হয়ে যাওয়া মুখের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই, 'না' সূচক ঘাড় নেড়ে তাকে থামতে ইঙ্গিত করল।

বিধোরক এখনও হেসে চলেছে। হাসতে হাসতেই বলল,

কী চাণক্য? হত্যা করো আমায়! শিষ্যর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে নাকি আমায় জীবিত রেখে শকুনির সন্ধান জানবে? কী করবে তুমি কৌটিল্য? আরও জোরে হেসে উঠল সে। বলল,

- তোমার এক শিষ্যকে রক্ষা করতে পেরেছ বটে কিন্তু দ্বিতীয়জনকে পারলে না? জানো চাণক্য, আমার আচার্য আমাকে বলেছিল যে, তুমি যদি একবার এখানে পৌঁছে যাও তবে আমাদের কৌশল তুমি সহজেই ধরে ফেলবে। তাই আমি আজকে সকাল থেকেই তৈরি ছিলাম তোমার জন্যে। ভেবেছিলাম অপূর্ণ কাজ আমি সম্পূর্ণ করে দিতে পারব। গুরুদেব বলে জীবসিদ্ধি সদাসতর্ক। তাই আশা করেছিলাম কুটির অন্ধকার হতেই

জীবসিদ্ধি আমাকে ধরতে ঝাঁপাবে, ছুরি চালানোর সময়ও ভেবেছিলাম তোমার এই দ্বিতীয় ছাত্রকেই আঘাত করলাম। কিন্তু অদৃষ্টের কী পরিহাস দেখো, জীবসিদ্ধি! তুমি আমায় না আটকে নিজের গুরুকে রক্ষা করতে গেলে, আর তোমার জায়গায় প্রাণ দিল শশাঙ্ক।

জীবসিদ্ধি এগিয়ে গিয়ে পর পর কয়েক বার বিধোরকের মুখ লক্ষ করে ঘুসি চালাল।

রক্তাক্ত অবস্থাতেও তার হাসির বেগ আরও বাড়ল। চাণক্য এখনও শশাঙ্কর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছেন। জীবসিদ্ধি থামতে প্রশ্ন করলেন,



কীভাবে? কীভাবে শকুনি এত কিছু জানল আমাদের বিষয়ে? আমার ছাত্রদের পরিচয়, তাদের অভ্যাস, এইসব কীভাবে সে জানল?

মুখ থেকে একদলা থুথু আর সঙ্গে জীবসিদ্ধির আঘাতে ভেঙে যাওয়া কয়েকটা দাঁত মেঝেতে ফেলে বিধোরক উত্তর দিল,

বিস্মিত হলে, কৌটিল্য? তুমি অনুমানও করতে পারবে না কিছু, চাণক্য! গুরুদেব তোমাদের ও তোমার মূল শক্তিস্তম্ভ ছয়জন ছাত্র বিষয়ে সব কিছু জানেন! জানো চাণক্য, তোমায় আমি ঘৃণা করি! তোমার নিজের অহং পূর্ণ করতে তুমি অগণিত মানুষকে ব্যবহার করেছ। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে, দেশকে স্বাধীন করার মিথ্যা উদ্দেশ্য দিয়ে নিজের সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলে; আমার তিন ভ্রাতাও ছিল। তোমার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা যুদ্ধে গিয়েছিল মগধের বিরুদ্ধে। মনে পড়ে পাটলিপুত্রে তৃতীয় তথা শেষ আক্রমণের কথা? যে ছোটো সৈন্যদল তোমার কথায় বিশ্বাস রেখে সেদিন পাটলিপুত্র আক্রমণ করেছিল তাদের মধ্যে ওরাও ছিল। ওরা জানতই না যে, ওরা তোমার যুদ্ধজয়ের চতুরঙ্গে বলিপ্রদত্ত গুটি মাত্র!

চাণক্য স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন। বিধোরক আরও একবার বিষ উগরে দিয়ে বলল,

অবিভক্ত আর্যাবর্ত তোমার সর্বগ্রাসী উচ্চাভিলাষ মাত্র! মৌর্য সাম্রাজ্য শুধুমাত্র নন্দর দরবারে তোমার অপমানের প্রতিশোধের নিদর্শন! তোমার এই স্বপ্নের জন্যে যে মানুষরা প্রাণ দিয়েছে তাঁদের নাম কে মনে রাখল, কৌটিল্য? ইতিহাসে কি লেখা থাকবে তাঁদের নাম? না, সবাই ভুলে যাবে, ভুলে গিয়েছে! আমার তিন ভাইয়ের মৃতদেহ পর্যন্ত আমরা পাইনি! ভাইদের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে মা মারা যায় যুদ্ধের পরেই। তুমি মহান হলে আমার পরিবার ধ্বংসের মূল্যে। এরকম কত হাজার পরিবার আজ অবধি তুমি ধ্বংস করেছ তার সংখ্যা জানো, চাণক্য? আজ শশাঙ্কও তোমারই উচ্চাভিলাষের বলি হয়েছে।

জীবসিদ্ধি চেঁচিয়ে উঠল,

- শশাঙ্কর নাম তোর মুখে আমি শুনতে চাই না খুনি!

জীবসিদ্ধিকে উপেক্ষা করে বিধোরক আবার বলল,

আমরা যে স্বজন হারানোর শোক সহ্য করেছি তা এবার তুমি অনুভব করবে, কৌটিল্য! যেন সহজ মৃত্যু তোমার শাস্তি নয়; এই শোক, প্রিয় মানুষের মৃত্যুর সাক্ষী থাকার অসহায়তার অনুভূতিই তোমার সাজা! নিজের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার হতে দেখবে তুমি! মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হবেই!

চাণক্য বিধোরকের দিকে মুখ ফেরালেন। তাঁর মুখে কাঠিন্যের ভাব,

– শকুনির মুখ্যালয় কোথায় বিধোরক? কোথায় লুকিয়ে আছে সে? বিধোরক কয়েক মুহূর্ত চাণক্যর দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক দৃষ্টিতে। তারপর আবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। হাসি থামিয়ে বলল,

শকুনির সন্ধান চাও, চাণক্য? তবে জেনে রাখো, সে তোমার এক হস্ত দূরে এসে দাঁড়ালেও তুমি তাকে ধরতে পারবে না! আর্যাবর্তকে ধ্বংস সে করবেই।

শশাঙ্কর মাথা কোল থেকে সযত্নে মাটিতে নামিয়ে রেখে চাণক্য উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পদক্ষেপে হাঁটুর উপর বসে থাকা বন্দি বিধোরকের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। ঝুঁকে তার মুখের সামনে নিজের মুখ নিয়ে এসে বললেন,

- উত্তর আমার এখনই চাই। কৌটিল্য কতটা নৃশংস হতে পারে সে-ধারণা তোমার নেই। বিশ্বাস করো তুমি উত্তর না দিলে আমি নিজে তোমার সেই দশা করব যে মৃত্যুও তোমাকে দেখে ভয় পাবে। আমি আর মাত্র একবার প্রশ্ন করব বিধোরক— শকুনি কোথায়, বিধোরক?

চাণক্যর কণ্ঠে, কথা বলার ভঙ্গিতে কিছু একটা ছিল যা কক্ষে উপস্থিত সকলের হৃদয়ে ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দিল একমুহূর্তের জন্যে। চাণক্য শান্ত রয়েছেন, স্বাভাবিকের চেয়েও যেন অধিক শান্ত। কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দে যেন আসন্ন প্রলয়ের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

বিধোরকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। জীবসিদ্ধির মনে হল আজ সন্ধ্যা থেকে এই প্রথমবারের জন্যে বিধোরক ভয় পেয়েছে। বিধোরক কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল,

আচার্য শকুনির সন্ধান চাও তুমি? বেশ, তবে জেনে রাখো। সে মৃত!

কথাটা শেষ হতেই বিধোরকের মুখের ভেতর থেকে কিছু কামড়ানোর শব্দ হল। পরমুহূর্তে তার মুখ থেকে গলগল করে রক্ত ও সঙ্গে কিছু একটা মাংসপিণ্ড বেরিয়ে এল। জীবসিদ্ধির বুঝতে সময় লাগল যে, সেটা একটা মাড়ি থেকে ছিন্ন হয়ে যাওয়া জিহ্বা!

একজন সৈনিক চেঁচিয়ে উঠল,

হে ঈশ্বর! শয়তানটা নিজের জিভ কামড়ে কেটে ফেলেছে! আত্মহত্যা করতে চাইছে! ওকে বাঁচাতে হবে।

চাণক্য হাত তুলে সকলকে থামতে বললেন। বিধোরককে বাঁচানোর কোনো প্রয়াস করতে বারণ করলেন হাতের ইশারায়। জীবসিদ্ধি বলল, – কিন্তু আচার্য...

চাণক্য তাকে আবারও হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। চাণক্য স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা, ক্রমাগত মুখ থেকে রক্ত বেরোতে থাকা বিধোরকের দিকে। জীবসিদ্ধি সে-দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে ফেলল। প্রায় প্রত্যেকেই তাই করল। কিন্তু চাণক্য গোটা সময়টা স্থির, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। যতক্ষণ না বিধোরকের ছটফটানি থেমে গিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা রক্তের মধ্যে তার দেহ স্থির হয়ে গেল।

তারপর ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চাণক্য আবার শশাঙ্কর মৃতদেহর কাছে গিয়ে পুনরায় বসলেন। তাঁর পুত্রসম শিষ্যর মাথাটা আবার নিজের কোলে নিলেন এবং বিড়বিড় করে বললেন,

— আমায় ক্ষমা করো, শশাঙ্ক। আমায় ক্ষমা করো!

৪৪.

মলয়কেতু ও পদ্মা গত দু-দিন হল আত্মগোপন করে আছে জঙ্গালের ধারে নির্জন প্রান্তরে অবস্থিত একটি ভবনে। মলয়কেতু গত দু-দিন শুধুই মদ্যপান করেছে এবং বাকি সময়টুকু সেই নেশায় অঘোরে ঘুমিয়েছে। পদ্মা তার যত্নের ত্রুটি করেনি।

পদ্মার কোলে মাথা রেখে শুয়ে সোমরসের নেশার ঘোরে মলয়কেতু বলছে,

— সবাই ভাবছে আমি শেষ। আমি আর কিছুই করতে পারব না। ওরা, সবাই একসঙ্গে চক্রান্ত করেছে। কিন্তু ওরা ভুলে যাচ্ছে যে, আমি পৌরবরাজ মলয়কেতু! বীর পুরুরাজের রক্ত আমার ধমনীতে। আমি এবারের মতো হেরে গেলেও আবার আমি জিতব। ওই কুলহীন চন্দ্রগুপ্ত যদি পারে তবে আমি কেন পারব না? তাই না, পদ্মা?

পদ্মা মলয়কেতুর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে উত্তর দিল,

— হ্যাঁ, মহারাজ।

মলয়কেতু আবারও বলল,

— কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না, পদ্মা। আমার নিজের প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি আমার সঙ্গ ছেড়েছে। শুনলাম তারা চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে! এটা কি বেইমানির চরম নজির নয়?

হ্যাঁ, মহারাজ!

— শোনো পদ্মা, তোমায় ছাড়া আমি কাউকে বিশ্বাস করি না! কাউকে না! একবার আমায় নিজের করে নাও, পদ্মা! আর কত অপেক্ষা করাবে আমায়? আমি পুনরায় রাজসিংহাসনে বসলে তুমি হবে আমার রানি! রাজরানির সম্মান দেব আমি তোমায়!

— হ্যাঁ, মহারাজ। আর অপেক্ষা নয়।

পদ্মা ঝুঁকে পড়ে মলয়কেতুর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। গভীর চুম্বনে দুটি ঠোঁট আবদ্ধ থাকল বেশ কিছুক্ষণ। মলয়কেতুর শরীর নেশার মধ্যেও কেঁপে উঠছিল উত্তেজনায়।

মলয়কেতুর ঠোঁট ছেড়ে পদ্মা তাকে দেখে হাসল। মলয়কেতু তার কোলে মাথা রাখা অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে আরও একবার পদ্মাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চাইল। পদ্মা বলল,

মহারাজ। আপনি মত্ত।

আমি তোমার নেশায় মত্ত হয়েছি, পদ্মা! এসো, আজকে আমায় প্রত্যাখ্যান কোরো না।

কিন্তু মহারাজ, আপনার যে ঘুম পাচ্ছে।

মলয়কেতু যেন তার কথাতেই অনুভব করল যে, সত্যিই তার চোখ নিদ্রায় ভারী হয়ে আসছে। মলয়কেতু তন্দ্রা ও নেশার ঘোরে প্রশ্ন করল, তাহলে এখন কী করব, পদ্মা?

পদ্মা মলয়কেতুর চুলে আবারও আঙুল চালানো শুরু করেছে। বড্ড আরাম লাগে মলয়কেতুর তার মাথায় এভাবে কেউ আঙুল চালিয়ে দিলে। পদ্মা বলল,

আপনি আমার কোলে মাথা রেখে এভাবেই ঘুমিয়ে পড়বেন, মহারাজ।

কিন্তু আমার যে ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না, পদ্মা। কিন্তু নিদ্রা আমার চোখের পাতা ভারী করে দিচ্ছে। কী করি, পদ্মা?

– আপনি চোখ বন্ধ করুন, মহারাজ। আমি বরং আপনাকে একটি গল্প শোনাই।

গল্প শোনাবে, পদ্মা? কাহিনি? জানো পদ্মা, এভাবেই আমার মাতা আমাকে কাহিনি শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত ছোটোবেলায়। আমার না মাতাকে আজ অনেক বছর পর খুব মনে পড়ছে। পিতার কথাও মনে পড়ছে। তাঁকে আমি নিজের হাতে বিষ...

– ওকথা থাক, মহারাজ। আপনি নাহয় গল্প শুনুন। চোখ বুজে গল্প শুনুন।

মলয়কেতুর চোখের পাতা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাও সে বলল, – বেশ। কাহিনি শোনাও আমায় তুমি। কীসের কাহিনি শোনাবে আমায় তুমি? এই কাহিনির কোনো নাম নেই, মহারাজ। শুধু কাহিনিটা আছে। আপনি শুনবেন?

হুমম।

বেশ। এক দেশে একটি বালিকা ছিল। তার জন্ম হয়েছিল বড়ো অশুভ সময়ে। নক্ষত্রের দিশা অনুযায়ী সেই বালিকার জন্ম অশুভ। তাই তার জন্মের পরেই প্রথমে ঠিক করা হল, এই কন্যাকে জীবিত রাখা হবে না। তাই তার পিতা ও পরিবার চাইল তাকে তখনই হত্যা করতে। কিন্তু শুধু তার মাতার জন্যে সেযাত্রা সেই শিশুটি রক্ষা পেল। মহারাজ, আপনি কি জেগে আছেন?

– হ্যাঁ, বলো... তারপর?

তারপর সকলের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে মেয়েটি বড়ো হল, বালিকা থেকে কিশোরী বয়সে পদার্পণ করল। সে জানত না তার দোষ কী। শুধু জানত যে সে অশুভ! তার সংস্পর্শে কোনো পুরুষ কোনোদিন এলে, সেই পুরুষের মৃত্যু অনিবার্য। তাই সেই কন্যার বিবাহ কোনোদিন সম্ভব ছিল না। মাতার অকালে মৃত্যুর পর থেকে কেউ তাকে কোনোদিন ভালোবাসেনি, কোনোদিন ভালোবাসবেও না। সে বুঝতে পারে যে সে সুন্দরী, কিন্তু সে যে অশুভ। তাই পরিবারের কাছে সে ছিল বোঝা। সকলে বলত ও মেয়ে নয়, ও বিষকন্যা! মহারাজ, আপনি কি এখনও শুনছেন?

হুমম...

এরপর একদিন সেই মেয়েটার গ্রামে এক প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ এলেন। সকলে সেই ব্রাহ্মণকে খুব আদর আপ্যায়ন করল। এই ব্রাহ্মণ গ্রামে এসে সেই অশুভ কিশোরীটির কথা জানতে পারলেন। কী আশ্চর্য, সেই মেয়েটিকে কাছে ডাকলেন। বড়োমানুষদের কাছে লাঞ্ছনা, কামুক দৃষ্টি ও স্পর্শ পেতেই এতদিনে অভ্যস্ত। তাই যখন সেই প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ তার মাথায় সস্নেহে হাত রেখে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'মা, তোর বড়ো কষ্ট আমি জানি। তোর মতো অনেক মেয়ের অশ্রুজলে এই দেশের ভূমি সিক্ত হয়েছে, মা। এখানে তোর কিছুই নেই রে। যাবি আমার সঙ্গে? তোর মতোই অনেক কন্যা থাকে এক জায়গায়। ওখানে সবাই সমান, কেউ তোকে হীনদৃষ্টিতে দেখবে না, মা। যাবি আমার সঙ্গে সেখানে?' জীবনে সেই প্রথমবার আনন্দে চোখে অশ্রু এসেছিল মেয়েটার। সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গেই সেই কিশোরী আশ্রমে আসে। সেখানে আরও অনেক মেয়ের সঙ্গেই তাকে বিভিন্ন যুদ্ধকলা, ভাষা, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে বিষ তাকে দেওয়া হতে থাকল সেই ব্রাহ্মণ ও এক দক্ষ আয়ুর্বেদাচার্যর তত্ত্বাবধানে। সেই বিষের পরিমাণ বয়সের সঙ্গেসঙ্গেই বাড়ানো হত, যাতে যৌবনে সেই কন্যাদের শরীরে বিষের প্রাকৃতিক প্রতিষেধক গড়ে ওঠে। সেই কন্যাটিকে নতুন নাম দেওয়া হয়। যে পরিচয় আজীবন তার কাছে অভিশাপ ছিল, এই আশ্রমে সেই পরিচয়কে গর্বের সঙ্গে নিজের উপাধি নিয়েছিল সেই মেয়েটি। বিষকন্যা! হ্যাঁ, সে বিষকন্যা! মহারাজ, আপনি কি বিষকন্যাদের বিষয়ে শুনেছেন? নিশ্চয়ই শুনেছেন?

হুমম...

অস্পষ্ট অস্ফুট শব্দ এল মলয়কেতুর মুখ থেকে।

মহারাজ, একটি গোপন কথা বলি আপনাকে। কাউকে বলবেন না কিন্তু কথাটা। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বিষকন্যাদের শরীরে এত বিষ থাকে যে, তাদের স্পর্শে বা চুম্বনে বা দংশনে মানুষের মৃত্যু হয়। এ তথ্য একদমই ভুল। এই ভুল তথ্য ইচ্ছে করেই

মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের বিভ্রান্ত করতে, তাদের মনে ভয় সঞ্চার করতে। আসলে এই নারীরা সহজেই সাধারণের মতো জীবনযাপন করতে পারে। সাধারণ পরিস্থিতিতে তাদের থেকে কারুরই কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আসলে তাদের শরীরে বিষ থাকে বটে, তবে তা শুধুমাত্র তাদের নিজের শরীরকে কোনোরকম বিষের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখে। কিন্তু এর ফলে বিষকন্যারা এই বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গুপ্তঘাতকও বটে। সহজেই নিজেদের শরীরের বিভিন্ন অংশে, দাঁতে, যোনিতে বা ঠোঁটে তীব্র বিষ মেখে সহজেই স্বাভাবিক থাকতে পারে। কারণ, সেই বিষ ভুলক্রমে তাদের শরীরে প্রবেশ করলেও তাদের কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু, অন্য মানুষদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ, তাদের শরীরের অঙ্গে বা ঠোঁটে মাখা বিষের প্রভাবে তাদের চুম্বনে, দংশনে বা সংগমে অন্য ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এই তথ্য কিন্তু অতি গোপন। তাও আপনাকে বললাম, কেন জানেন? কারণ আমি বিশ্বাস রাখি যে, আপনি এই কথা কোনোদিন কাউকে বলবেন না। মহারাজ, আপনি কি এখনও জেগে আছেন?

কোনো উত্তর এল না মলয়কেতুর দিক থেকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল পদ্মা। মলয়কেতুর শরীরে নীলচে আভা ফুটে ওঠা অবধি বসে রইল সে অপেক্ষায়। যখন বুঝল যে মলয়কেতুর নিশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠছে, তখন তার মাথাটা নিজের কোল থেকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল পদ্মা। দ্বার খোলা রেখেই ভবন থেকে বেরিয়ে এল। দুটি ঘোড়া বাঁধা ছিল প্রাঙ্গণে। একটিকে বাঁধন খুলে ছেড়ে দিল পদ্মা, অপরটির পিঠে চড়ে বসে পূর্বের অভিমুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

* * *

শশাঙ্কর অন্তিম-ক্রিয়া তক্ষশিলার প্রাঙ্গণে সম্পূর্ণ রাজকীয় সামরিক সম্মানে সমাধা করা হয়েছে। মৃতদেহ মগধ অবধি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় জেনে চাণক্যই বলেছিলেন,

অন্তত তক্ষশিলা অবধি শশাঙ্ককে নিয়ে চলো, জীবসিদ্ধি। নিজের গুরুকুলের চেয়ে পুণ্যভূমি আর কীই-বা হতে পারে? আশা করি, শশাঙ্কর আত্মা কিছুটা হলেও শান্তি পাবে তাতে।

শশাঙ্কর চিতাভস্ম একটি মাটির ছোটো কলসে নিয়ে চাণক্য ও জীবসিদ্ধিসহ মগধ সেনার ছোটো দলটি পাটলিপুত্রর পথ ধরেছে।

গোটা পথে চাণক্য একবারের জন্যেও সেই কলসটি নিজের দৃষ্টির বাইরে হতে দেননি। বলেছেন এই অন্তিম চিহ্নটুকু শশাঙ্কর স্ত্রী, পরিবারের হাতে সমর্পণ না করা অবধি তিনি স্বস্তি পাবেন না। জীবসিদ্ধি এত বছরের পরিচিতিতে চাণক্যকে খুব কমই

দেখেছে এতখানি অনুভূতিপ্রবণ হতে। জীবসিদ্ধি উপলব্ধি করেছে যে, শিষ্যদের প্রতি তাঁর পাষণ-হৃদয় গুরুর মনে কতটা গভীর অথচ অব্যক্ত ভালোবাসা আছে।

পথে চাণক্য কথা বলেছেন খুব কম। জীবসিদ্ধির কথার উত্তর যতটা কম কথায় দেওয়া সম্ভব ততটাই বাক্য ব্যবহার করেছেন। তবে যাত্রাপথের মধ্যেই জীবসিদ্ধি জানতে চেয়েছিল,

আচার্য, বিধোরক কোন যুদ্ধের কথা বলছিল? যে যুদ্ধে রাজধানী আক্রমণ করতে গিয়ে তার পরিবার মারা গিয়েছিল, সে-বিষয়টা কী?

চাণক্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন,

– তুমি তো জানোই জীবসিদ্ধি, সম্মুখসমরে ধনানন্দর বিশাল সেনাকে পরাস্ত করা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না। তাই আমাকে এক কূট-রণকৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল মগধের প্রান্ত জনপদগুলো আগে দখল করা, যাতে রাজধানীকে অন্য রাজ্যের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায়। এর ফলে রাজধানীর সঙ্গে বাণিজ্যপথ বন্ধ হবে। ক্রমশই খাদ্য ও অন্য জরুরি সামগ্রীর অভাব দেখা দেবে, যার ফলে সেনা ও প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে এবং মগধের অন্দরেই বিদ্রোহ সৃষ্টি হবে। আমরা এভাবেই মগধকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে দুর্বল করে তবেই পরাস্ত করেছিলাম তাদের।

জীবসিদ্ধি বলল,

– হ্যাঁ, সে তো জানি, আচার্য।

চাণক্য বললেন,

হুমম। কিন্তু মগধের প্রান্তের বা সীমান্তবর্তী রাজ্য জয় করতে গেলে আগে প্রয়োজন ছিল সেখান থেকে মগধের সেনাকে সরিয়ে দেওয়া। এই কাজ কিন্তু কঠিন ছিল জীবসিদ্ধি, কারণ ভুলে যেয়ো না সেইসময়ে ধনানন্দর মহামাত্য ছিল স্বয়ং রাক্ষস। তাকে অন্য অন্য রাজ্য থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে ফেলতে বাধ্য করার একমাত্র উপায় ছিল যদি কোনোভাবে নন্দ ও রাক্ষসের মনে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে, রাজধানী পাটলিপুত্র আক্রান্ত। একমাত্র রাজধানীতে আক্রমণ হলে, তবেই নন্দ তার বাহিনীকে অন্য রাজ্য থেকে সরিয়ে পাটলিপুত্রে নিয়ে আসত রাজধানীর সুরক্ষার কথা ভেবে। অতএব, আমার প্রয়োজন ছিল একটি সেনাদলের যারা পাটলিপুত্র আক্রমণ করবে। এই সেনাদলকে আমি কখনোই আমার আসল উদ্দেশ্য বলিনি। বলিনি যে, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে চলেছে রাজধানীতে আক্রমণ করে মগধের বিশাল সেনার কাছে পরাস্ত

হওয়া। তারা আমার জন্যে ছিল উচ্চতর মহৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধির স্বার্থে বলিপ্রদত্ত কয়েকটি প্রাণ।

চাণক্য কিছুক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে রইলেন। চোখ না খুলেই বললেন,

- আমি জানতাম তারা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে চলেছে আমারই দেখানো পথ অনুসরণ করে। তাদের আমি মিথ্যা বীরত্বের দিবাস্বপ্ন দেখিয়েছিলাম। বিশ্বাস জাগিয়েছিলাম মনে যে, আমার রণনীতি অনুযায়ী তারা যুদ্ধে গেলে তাদের জয় হবে। তারা আমার মিথ্যা কথায় আশ্বস্ত হয়ে পাটলিপুত্রে আক্রমণ করে। রাজধানীতে আক্রমণ হতে ধনানন্দর আদেশে মগধের সমস্ত সেনা রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হয়ে যায় অন্যান্য রাজ্যকে অরক্ষিত রেখেই। এবং, সেই সুযোগেই আমরা দখল নিই সেইসব অরক্ষিত রাজ্যের। পরবর্তী ঘটনার সাক্ষী তুমি নিজে ছিলে। কিন্তু এর মূল্য দিতে হয়েছিল সেই সেনাবাহিনীকে যারা নিজেদের অজান্তেই আমার আদেশে পাটলিপুত্রে আক্রমণ করে প্রাণ দিয়েছিল। সেই বাহিনীতেই বিধোরকের পরিবারের সদস্যরাও ছিল।

চাণক্য থেমে চোখ খুললেন। জীবসিদ্ধি কোনো কথা বলল না, একদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল। শুনতে পেল চাণক্য বলছেন,

এই মানুষদের মৃত্যুর দায় আমার, শুধুই আমার। আমি এই পাপ মাথা পেতে নিয়েছি এবং এর ফলে যদি মৃত্যুর পর ঈশ্বরের আদেশে আমাকে নরকের অগ্নিতে অনন্তকাল পুড়তে হয়, তবুও আমি রাজি। কিন্তু, আমি আমার জীবনে যে অসংখ্য তথাকথিত অধর্মের মার্গ অবলম্বন করেছি, সেই সকল পাপের দায় স্বীকার করে নিয়েও আমি বলতে পারি, যে তার কোনোটাই আমি নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভেবে করিনি। আমি আজ অবধি যা যা করেছি শুধুমাত্র এই দেশের, আমার মাতৃভূমির হিতের স্বার্থে করেছি। এবং, একই পরিস্থিতিতে, আমি পুনরায় ঠিক তাই করব!

জীবসিদ্ধি অবাক চোখে তার গুরুর দিকে দেখল। তার মনে পড়ে যাচ্ছে মহাভারতের কাহিনি। কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধর শেষে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল স্বেচ্ছায়। ধর্মযুদ্ধ জয়ের জন্যে কি সেও বারংবার অধর্মের পথ অবলম্বন করেনি? সে তো দেবতা ছিল, স্বয়ং বিষ্ণু। আর এই বিষ্ণু তো সাধারণ মানবমাত্র। অথচ কী অদ্ভুত মিল তাদের...।

৪৬.

গোটা পাটলিপুত্র সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর জয়ের উৎসব পালনে ব্যস্ত। সম্রাট পঞ্চনদ জয় করেছেন। এখন আর্যাবর্তর উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু ঠিক

বিপরীত চিত্র রাজমহলের অন্দরে। চন্দ্রগুপ্তর রাজমহলে গভীর শোকের ছায়া। বহু বছর পর আজ আবার পাঁচ গুরুভ্রাতা একত্রিত হয়েছে একই স্থানে। ঠিক যেমন দেশের উত্তর-পশ্চিমের ভার ছিল শশাঙ্কর উপর। একইভাবে তার ছাত্র পুরুষদত্ত যার উপর আর্যাবর্তর পূর্ব অংশের দায়িত্ব দিয়েছেন চাণক্য।

আর্যাবর্তর মধ্যভাগের দায়িত্ব পালন করে অক্ষয় এবং পশ্চিমের সীমানার দায়িত্বে আছে আদিত্য। রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে চন্দ্রগুপ্ত এবং গোটা আর্যাবর্তে ছড়িয়ে থাকা গুপ্তচর বাহিনীর কেন্দ্রে আছে জীবসিদ্ধি।

চাণক্য প্রথম থেকেই জানতেন যে, একসময় গোটা আর্যাবর্ত শাসনের ভার আসবে চন্দ্রগুপ্তর উপর। একা একজন রাজা কখনোই পারবে না এই বিশাল দেশের শাসন পরিচালনা করতে যদি না দেশের বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব আলাদা আলাদা করে দেওয়া যায়। এবং, সেই দায়িত্ব তারাই পালন করতে পারবে যারা নিজেরাও এক-একজন রাজা হওয়ার যোগ্য। তাই একজন নয়, একে একে বিভিন্ন রকমের চারিত্রিক পরীক্ষা করে ছয়জন ছাত্র বেছে নিয়েছিলেন চাণক্য তাঁর গুরুকুল থেকে। তাদের একত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন চাণক্য। যার ফলে এরা প্রত্যেকেই কুশল যোদ্ধা, রাজনীতিজ্ঞ এবং মগধ শাসনের মূল ছয়টা স্তম্ভ। এই ছয় গুরুভ্রাতা ছাত্রাবস্থা থেকেই একে অন্যের সুহৃদের চেয়েও বেশি। তারা বাস্তবেই যেন ভিন্ন মাতার গর্ভে জন্ম নেওয়া ছয় ভ্রাতা। কিন্তু সুরক্ষা স্বার্থে চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন বাকি পাঁচজনের প্রকৃত পরিচয় জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি কোনোদিন। সকলের চোখে তারা মগধের প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু চাণক্যই শুধু জানেন যে, মৌর্য সাম্রাজ্য আসলে পরিচালনা করছে ছয়জন। চন্দ্রগুপ্ত সম্মুখ দিবালোকে দাঁড়িয়ে এবং অন্য পাঁচজন আঁধারে দাঁড়িয়ে গোপনে প্রতিদিন দেশকে রক্ষা করে চলেছে।

তাই আজকে আবার তারা একত্রিত হয়েছে তাদের ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিতে, শেষ বিদায় জানাতে। শশাঙ্কর মৃত্যুতে তারা প্রত্যেকেই শোকাহত। বিশেষ করে জীবসিদ্ধি। কারণ তক্ষশিলা গুরুকুলে শশাঙ্কর সঙ্গেই তার প্রথম সখ্যতা হয়েছিল। চাণক্যর আশ্রমে জীবসিদ্ধিকে প্রথমবার নিয়ে এসেছিল এই শশাঙ্কই। তাই শশাঙ্কর মৃত্যু সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে সম্ভবত তারই উপর।

শশাঙ্কর অস্থিপাত্র ঘিরে বসে আছে চাণক্য ও অন্যরা। কারুরই মুখে কোনো কথা নেই। পুরুষদত্ত কিছুটা নিজের মনেই বলে উঠল,

— আমি ভাবতেই পারছি না শশাঙ্ক মৃত। এ কীভাবে হতে পারে? আচার্য, জীবসিদ্ধির মুখে আমি গোটা ঘটনাই শুনেছি। শশাঙ্কর প্রকৃত পরিচয় ওই হত্যাকারী কীভাবে জানল?

চন্দ্রগুপ্ত তার কথার রেশ ধরেই বলল,

- শুধু শশাঙ্ক নয়, ভুলে যেয়ো না জীবসিদ্ধিকেও হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে ইতিমধ্যে। অর্থাৎ, আমাদের সকলের বিষয়েই আমাদের শত্রু জানে। অক্ষয় বলল,

– কিন্তু, তা কী করে সম্ভব? এই গোপন তথ্য আমরা ব্যতীত কেউ জানে না। যদি-বা ধরেও নিই যে, শকুনি যেহেতু তক্ষশিলায় আচার্য ছিল আমাদের ছাত্রাবস্থায়, সে অনুমান করতে পারে যে, আমাদের কয়েক জনের মধ্যে আজও সখ্যতা রয়েছে। কিন্তু, বিধোরক বিশেষ করে 'ছয়' ছাত্রের সংখ্যাটাও উল্লেখ করেছে। একথা তার পক্ষে কখনোই জানা সম্ভব নয়। আমাদের অন্দর থেকেই কেউ গোপন তথ্য শকুনিকে জানাচ্ছে। কিন্তু আমরা কয়েক জন বাদে আর কেউ যে জানেই না এ তথ্য।

একজন জানে।

জীবসিদ্ধির কথায় সকলেই তার দিকে তাকাল। আদিত্য প্রশ্ন করল,

- কার কথা বলছ তুমি, জীবসিদ্ধি?

উত্তর না দিয়ে জীবসিদ্ধি চাণক্যর দিকে চাইল। তার মনের সন্দেহের কথা অনুমান করতে পেরেই চাণক্য বললেন,

– আমি জানি তুমি কার কথা বলছ। তুমি অমাত্য রাক্ষসের কথা বলছ, তাই তো? তুমি এখনও তাঁকে সন্দেহ করো যে, তিনি আমাদের শত্রুপক্ষ।

- আমার এ সন্দেহ কি অমূলক, আচার্য? একসময় সে-ই কিন্তু ছিল আপনার চরম শত্রু।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,

- তোমারও কি একই মত, চন্দ্র?

চন্দ্রগুপ্ত দু-দিকে মাথা নেড়ে বলল,

না। গত এক বছরে আমার প্রধানমন্ত্রী পদে অমাত্য রাক্ষসকে আমি পর্যবেক্ষণ করেছি। তার প্রতি সন্দেহ আমারও ছিল। কিন্তু এখন তা দূর হয়েছে। এর সঠিক কারণ আমি বলতে পারব না, কিন্তু ধরে নিন এটা আমার একটা অনুভূতি। তা ছাড়া দুর্ধরা তার উপর বিশ্বাস রাখে। আদিত্য বলল,

রানি দুর্ধরা বালিকাবস্থা থেকে রাক্ষসকে দেখে আসছে। অতএব, তার প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব থাকবেই। তার মতামত এখানে কুয়াশাচ্ছন্ন হবে। চন্দ্রগুপ্ত বলল,

আমার কিন্তু সেইরকম মনে হয় না। তা ছাড়া রাক্ষস তো সবেমাত্র এক বছর হল আমাদের সঙ্গে আছেন। শকুনি তো তার পূর্বেও আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। -

চাণক্য হাত তুলে সকলকে থামতে ইঙ্গিত করলেন। সকলেই আলোচনা থামিয়ে গুরুর মতামত শোনার অপেক্ষায় চুপ করল। চাণক্য ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন,

আমি জানি অমাত্য রাক্ষসকে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাটাকে তোমরা ভুল ভাবো। তোমরা সন্দেহ করো যে, সে-ই আমাদের শত্রু। কিন্তু তোমরা কেউই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছ না। এবং, সেটা হল মনস্তত্ত্ব। সব কিছুর আড়ালে আমি যে মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত পাচ্ছি তা আমাকে বিচলিত করছে।

চাণক্য একটু থেমে বললেন,

অমাত্য রাক্ষস ছিলেন আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই যদি-বা ধরে নিই যে, তোমাদের আশঙ্কায় সত্যতা আছে এবং তিনি আমার থেকে প্রতিশোধ নিতে চান, তবে তাঁর প্রতিশোধও হবে রাজনৈতিক। অর্থাৎ, তিনি আঘাত করবেন মগধের সিংহাসনে, তাঁর শাসনব্যবস্থায়। আমাদের থেকে মগধের অধিকার কেড়ে নেওয়াটাই হত তাঁর পক্ষে যথাযথ প্রতিশোধ। কিন্তু বিধোরকের কথাগুলো মনে করে দেখো। শকুনির উদ্দেশ্যর কথা সে আমাদের বলেছে। শকুনি মগধকে শাসন করতে চায় না, সে চায় মগধকে ধ্বংস করতে! অমাত্য রাক্ষস কোনোদিনই এতে লিপ্ত হবেন না। দেশের প্রতি তাঁর প্রেম আমার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

চাণক্যর ললাটে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,

শকুনির এই প্রতিশোধের পদ্ধতি যেন বড্ড বেশি ব্যক্তিগত। প্রায় তিন বছর পূর্বে যখন পাটলিপুত্রর রাজপ্রাসাদে গান্ধারের দূতকে সে হত্যা করিয়েছিল যাতে অন্য রাজ্যরা আমাদের অবিশ্বাস করে, সেই আঘাত ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু দু-বছর পূর্বে সে ব্যবহার করল আমারই প্রাক্তন ছাত্র ইন্দ্রজিৎকে। এবং, এইবার আমার প্রতিপক্ষ ছিল আমারই দোষে পরিবার হারানো প্রতিশোধকামী বিধোরক। হত্যার চেষ্টা করল আমার ছাত্রদের। তিন বছর পূর্বের ঘটনার সঙ্গে শেষ দুটি ঘটনাকে মেলাতে পারছি না আমি। কিছু যেন বদলে গিয়েছে এর মধ্যে। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মনস্তত্ত্ব উঠে আসছে। না না হে, জীবসিদ্ধি, শকুনি মগধকে নয়, সরাসরি আমাকে আঘাত করতে চাইছে বারংবার। মগধের পতন তার মূল উদ্দেশ্য হলে আমাকে সর্বপ্রথম হত্যা করার চেষ্টা করত সে। কিন্তু শকুনি আমাকে হত্যা করতে আগ্রহী নয়, সে আমার চোখের সামনে আমার ছাত্র, আমার স্বপ্ন আমার জীবনের উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করতে চাইছে। এ আঘাত বড্ড ব্যক্তিগত। তার আঘাতের লক্ষ্য মগধ নয়, তার লক্ষ্য আমি।

জীবসিদ্ধি বলল,

— আপনি কী ইঙ্গিত করছেন, আচার্য?

আমি চিন্তিত, জীবসিদ্ধি। খুব চিন্তিত। আমি এতদিন যে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে শকুনির সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধ শুরু করেছিলাম, সে-আত্মবিশ্বাস আমি এই মুহূর্তে অন্তত রাখতে পারছি না। -

চন্দ্রগুপ্ত বলে উঠল,

একথা বলবেন না, গুরুদেব! শশাঙ্কর মৃত্যুর প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে! আপনি পরাজয় স্বীকার করে নিলে আমরা এই যুদ্ধ যে অর্ধেক হেরেই গেলাম, আচার্য।

চাণক্য আবারও মাথা নেড়ে বললেন,

— আমি পরাজয় স্বীকার করছি না, চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে গোটা বিষয়টা আবার প্রথম থেকে ভেবে দেখার সময় এসেছে। আমাদের প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে বাস্তব মিলছে না। আমি হয়তো তোমাদের বোঝাতে পারছি না, কিন্তু এটুকু জেনে রাখো যে, কোথাও কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা এখনও আমাদের দৃষ্টিতে আসেনি। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে, গোটা সমস্যার সমাধান সূত্র আমার সম্মুখেই আছে, কিন্তু তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার কোথাও একটা মারাত্মক ভুল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা জীবসিদ্ধি, বিধোরকের শেষ কথাগুলো তোমার মনে আছে?

সব মনে আছে। কিন্তু আপনি ঠিক কোন কথাটার বিষয়ে বলছেন? -

সে বলেছিল শকুনি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। সে মৃত। এই কথার কী অর্থ করো তোমরা? -

আদিত্য বলল,

সে নিশ্চিতভাবেই আমাদের বিভ্রান্ত করতে এই কথা বলেছে। -

চাণক্য কোনো উত্তর দিলেন না। গভীর ভ্রূকুটি তাঁর কপালে। আদিত্য বলল, আমরা মূল আলোচনা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছি, আচার্য। আপনি এবং

চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চিত যে, অমাত্য রাক্ষস এইসবের আড়ালে নেই? চাণক্যর মুখের ভাব পরিবর্তিত হল। স্মিত হেসে বললেন,

হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। বিশেষ করে গত কয়েক মাসে তাঁর সাহায্য ছাড়া কখনোই পঞ্চনদ জয় সম্ভব হত না। তোমরা কেউই গোটা ঘটনা জানো না। তাই তোমাদের মনে অমাত্য কাত্যায়নের প্রতি এখনও প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। -

তখনই কক্ষের দ্বার খুলে অমাত্য রাক্ষস এবং রানি দুর্ধরা প্রবেশ করলেন। আসতে পারি, আচার্য?

আসুন, অমাত্য। আসুন, রানি। আপনাদের সঙ্গে এই তিনজনের পরিচয় করিয়ে দিই। এরা আমার ছাত্র এবং চন্দ্রগুপ্তর গুরুভ্রাতা আদিত্য, অক্ষয় ও পুরুষদত্ত।

রানি দুর্ধরা বললেন,

আপনাদের সঙ্গে আমার সম্মুখে পরিচয় না থাকলেও আমি সম্রাটের মুখে আপনাদের বিষয়ে সব কিছুই শুনেছি। অনুকূল পরিস্থিতিতে আপনাদের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ বড়োই হর্ষের হত। কিন্তু আপনাদের ভ্রাতা শশাঙ্কর মৃত্যুতে আমিও দুঃখিত।

রাক্ষস যথারীতি অভিব্যক্তিহীন মুখে সকলকে প্রণাম জানিয়ে একটি আসনে বসলেন। চাণক্য বললেন,

আপনাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল, অমাত্য কাত্যায়ন। আমার মনে হয় গত কয়েক মাসের ঘটনাক্রম এইবার ওদের জানার সময় এসেছে। অমাত্য রাক্ষস নিরুৎসাহিত কণ্ঠে বললেন,

আপনার যা অভিরুচি, আচার্য চাণক্য।

চাণক্য উপস্থিত সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,

বেশ। তবে প্রথম থেকে শুরু করা যাক।

৪৬.

চাণক্য বলতে শুরু করলেন,

যেদিন কুলূত থেকে পত্র এল সেইদিনই অমাত্য কাত্যায়ন বলেছিলেন যে, মলয়কেতুর কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ সে মূর্খ হলেও পঞ্চনদের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা এবং জানা যাচ্ছে সে অন্য রাজাদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করছে। জীবসিদ্ধির মাধ্যমে এই খবর আসে যে, মলয়কেতুকে পরিচালনা করছে অন্য কেউ। সে ব্যক্তি যে আচার্য শকুনি, তা অনুমান করা কঠিন কিছু ছিল না। আমি এবং অমাত্য আলোচনা করি। কাত্যায়নের মতামত ছিল যে, মলয়কেতুকে সরিয়ে ফেলাই শ্রেয়। কিন্তু তাতে কী লাভ হত? তার জায়গায় অন্য কাউকে শকুনি ব্যবহার করা শুরু করত। তাই এমন কিছু করার প্রয়োজন ছিল যাতে শত্রুকে তার শেকড় থেকে নষ্ট করে দেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমন কিছু করতে হত যাতে গোটা পঞ্চনদ আমরা সহজেই জয় করে মগধের অন্তর্গত করতে পারি। আমি চেয়েছি কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে। নিজেদের সেনাক্ষয় ও অযথা যুদ্ধ না করে যে যুদ্ধ জয় করা যায়, সেটাই শ্রেষ্ঠ জয় নয় কি? -

আমি আর অমাত্য কাত্যায়ন একটি সুদূর বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করি। তাতে অনেকগুলো ছোটো বড়ো চরিত্র আমরা সাজিয়ে তুলি। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার মূল মন্ত্র একটাই ছিল— গোপনীয়তা। প্রতিটি চরিত্র নিজেদের কাজটুকু শুধু করবে, কিন্তু গোটা পরিকল্পনার বিষয়ে কেউই জানবে না।

সেই অনুযায়ী, প্রথম দান হিসাবে মলয়কেতুর অন্দরমহলে আমি নিজের এক বিশ্বস্ত বিষকন্যা, পদ্মাকে নিযুক্ত করি। তার কাজ ছিল মলয়কেতুর কাছাকাছি পৌঁছানো, তাকে নিজের রূপে, ছলে বশ করা। তার বিশ্বাস জয় করে তার মনে শকুনি তথা অন্য ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে বিষ ঢেলে দেওয়া। বিষকন্যার শুধুই ঠোঁটে বিষ থাকে না, তার কথাতেও বিষ থাকে বই কী।

পদ্মার থেকেই জানতে পারি যে, শকুনি ও মলয়কেতুর সঙ্গে কোন কোন রাজা যোগ দিয়েছে। পরবর্তী ধাপ ছিল তাদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নেওয়া, যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার ক্ষমতার উর্ধ্বে। যেমন সিন্ধুসেনা। এরপরের চাল দিলেন অমাত্য কাত্যায়ন। তিনি একটি পত্র লিখলেন সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে। সংকেতের শব্দগুলো অনেক ভাবনাচিন্তার পর আমরা ঠিক করেছিলাম। কেন সেই শব্দগুলো জরুরি, সেকথায় পরে আসছি। কিন্তু সেই পত্রের শেষে অমাত্যের নিজস্ব অঙ্গুরীয় মুদ্রার ছাপ সিন্ধুসেনাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে যথেষ্ট ছিল যে, অমাত্য তার সঙ্গে মিলে মগধের পতন করতে চান। আমি ইচ্ছা করেই নিজে কুলূত যাওয়ায় রাজি হয়েছিলাম। যাতে আমাদের শত্রুদের মনে হয় যে, চাণক্যর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই অমাত্য কাত্যায়ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। কারণ আমাদের সঙ্গে তার এই মৈত্রী বিষয়টা নিয়ে অনেকেই মনে সন্দেহ পোষণ করে। কথাগুলো বলার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন কাত্যায়ন, কিন্তু অনেকেই এখনও মনে করে যে, তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

চাণক্য আরও একবার সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। জীবসিদ্ধিসহ অন্য সকলেই লজ্জিত ভঙ্গিতে চোখ নামিয়ে নিল। চাণক্য মৃদু হেসে বললেন,

— কাত্যায়ন তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর নিপুণকের মাধ্যমে পত্র পাঠালেন সিন্ধুসেনার কাছে। তাতে বিশেষ কিছু তথ্যের সংক্ষিপ্ত উত্তর চাওয়া হয়েছিল। সিন্ধুসেনা সেইমতোই সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে পত্রের উত্তর লিখল। নিপুণক সেই উত্তর নিয়ে রওনা হল। এবং, এখানেই শুরু হল আমাদের পরিকল্পনার তৃতীয় ধাপ। নিপুণক নিজে না গিয়ে, কাত্যায়নের পূর্ব নির্দেশমতোই সিন্ধুসেনার সেই পত্র মাঝপথে তুলে দিল রোচকের হাতে। রোচক একজন মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত আসামি এবং তাকেই বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ ছিল, সে বোবা। তাকে বলা হল এই পত্র মগধ অবধি পৌঁছে দিলেই তার সাজা

ক্ষমা করা হবে। কিন্তু বাস্তবে তাকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না। আমি শুধু তার মৃত্যুদণ্ডের পদ্ধতিটা নিজের প্রয়োজনে বদলে দিয়েছিলাম। রোচক পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করতেই নিপুণক কাত্যায়নের নির্দেশে একটি বেনামে পত্র লিখল মলয়কেতুর উদ্দেশে। সেই পত্রে পরোক্ষভাবে পত্রবাহক রোচকের কথা জানানো হল তাকে।

কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যেন রোচক পৌরব রাজ্য পার করার সময়ে ধরা পড়ে এবং সিন্ধুসেনার পত্র মলয়কেতুর হাতে পৌঁছায়। সেইমতোই রোচককে ইচ্ছে করেই ভুল পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল যাতে তার উপর সন্দেহ হয় প্রহরীদের।

পরিকল্পনামতোই রোচক ধরা পড়ল এবং যখন মলয়কেতু দেখল যে, এই লোকটি বোবা এবং অশিক্ষিত, অতএব এর থেকে কোনো তথ্যই পাওয়া যাবে না, অতএব তার গর্দান নিল। এই পত্রের সাংকেতিক শব্দগুলো আমি ও কাত্যায়ন এমনভাবেই ভেবে বের করেছিলাম যাতে সেই পত্র মলয়কেতু পাঠ করলে তার মনে বিশ্বাস জন্মায় যে, এখানে তার পর্বত্যকা রাজ্যে আক্রমণ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন, মগধকে লেখা হল পর্বত, ভদ্রকেতু হল গৃধ্র যাতে গৃধ্র পড়লেই শকুনের কথা মাথায় আসে। মলয়কেতুর মনেও যথারীতি শকুন অর্থাৎ শকুনির উপর সন্দেহের বীজ প্রবেশ করল।

কথায় বাধা দিয়ে চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

কিন্তু আচার্য, যদি এই পত্র পাঠ করে মলয়কেতু ভিন্ন ব্যাখ্যা করত? তাহলে? চাণক্যর ঠোঁটে হালকা হাসি ফুটল। বললেন,

সেক্ষেত্রে তার মনে সন্দেহে জাগিয়ে তোলা হত। আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পত্রের ব্যাখ্যা মলয়কেতু না করলে, তার মাথায় সেই ব্যাখ্যা প্রবেশ করানোর দায়িত্ব ছিল পদ্মার উপর। সত্যি বলতে সে আমাদের পরিকল্পনার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে অভূতপূর্ব পারদর্শিতার সঙ্গে। পদ্মা মা-কে তোমার বীররত্ন পুরস্কার দেওয়া উচিত, চন্দ্রগুপ্ত।

চাণক্য কিছুটা বিরতি নিয়ে বললেন,

– গোটা পরিকল্পনায় বাধ সাধলেন মলয়কেতুর মন্ত্রী সুদীপ্তক। তিনি বুদ্ধিমান, তিনি রাজাকে হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে বললেন। আমার অনুমান ছিল যে, শুধুমাত্র একটি পত্র দিয়ে কাজ হবে না। মলয়কেতুর মনে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এ বিশ্বাস দৃঢ় করতে আরও একটি চাল দিতে হবে আমাদের। এইবার গোটা ঘটনাক্রমে আরও একবার গতি আনার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই কাজে সাহায্য করল পদ্মা। তার আবদারে মলয়কেতু তাকে নিয়ে আখেটে গেল জঙ্গলে। আমি এইবার আমার চতুর্থ চাল দিলাম। এখানে আমি ব্যবহার করলাম মগধের কারাগারে থাকা আরও এক বন্দিকে।

ভীমা! ভীমাকে মনে পড়ে, চন্দ্রগুপ্ত? জীবসিদ্ধির অন্তত তার কথা মনে থাকা উচিত। জীবসিদ্ধি বলল,

— আপনার পত্রে নামটা দেখে কিছু একটা পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ছিল বটে। কিন্তু এই নামটা আগে ঠিক কোথায় শুনেছি তা কিছুতেই স্মরণ করতে পারিনি।

সেকী? পাটলিপুত্রর সেই শৃঙ্খল-হত্যাকারীর কথা ভুলে গেলে এই ক-বছরেই? তিন বছর পূর্বে পাটলিপুত্রর পথে পথে, রাত্রে যে উন্মাদ হত্যাকারী পতিতা নারীদের হত্যা করে গোটা নগরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, সেই ভীমার কথা ভুলে গেলে?

চন্দ্রগুপ্ত ও জীবসিদ্ধি চমকে উঠে বলল,

ভীমা!

- হ্যাঁ, সে-ই।

চন্দ্রগুপ্ত বলল,

— কিন্তু তাকে তো আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম তখনই!

চাণক্য বললেন,

এবং আমি সেই আদেশই পালন করেছি সম্রাট, শুধু তিন বছর বিলম্বে। তুমি তো জানতে জীবসিদ্ধি, তার বিষয়ে। মনে পড়ে? জীবসিদ্ধি বলল,

— হ্যাঁ। আপনি বলেছিলেন যে, এই বলশালী উন্মাদ আমাদের অস্ত্র হতে পারে যদি তাকে প্রশিক্ষিত করা যায়।

— হ্যাঁ তাকে মানসিকভাবে প্রশিক্ষিত করে আমাদের নির্দেশমতো কাজ করা এক অস্ত্র বানাতে আমরা সক্ষম হয়েছি গত তিন বছরে। আমার নির্দেশে কাত্যায়ন ভীমাকে পাঠালেন শিকারের পথে জঙ্গলের মাঝে যেন সে মলয়কেতুকে হত্যা করে। কিন্তু এবারও, আমাদের উদ্দেশ্য বাস্তবে তাকে হত্যা করা ছিল না। তাই ভীমার বিষয়ে পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া হয় পদ্মাকে। তার কাজ ছিল মলয়কেতুর প্রাণ রক্ষা করা যাতে মলয়কেতু সম্পূর্ণভাবে পদ্মার উপর বিশ্বাস করতে শুরু করে। এদিকে ভীমাকে নির্দেশ দেওয়া ছিল সে যেন বলে যে, সিন্ধুসেনার আদেশে সে মলয়কেতুকে হত্যা করতে এসেছ। পদ্মা এখানেও আরও একবার নিজের পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সফল করল। মলয়কেতু তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করল এবং তার মনে এইবার নিশ্চিত ধারণা হল যে, সিন্ধুসেনা, শকুনিসহ অন্য রাজারা কাত্যায়নের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। এবং, তারা মলয়কেতুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

অনেকক্ষণ কথা বলায় গলা শুকিয়ে যাওয়ায় চাণক্য থামলেন। আদিত্য তাঁর দিকে জল এগিয়ে দিল। তা পান করে তিনি বললেন,

ধন্যবাদ, আদিত্য। তো, এই ছিল আমার আর কাত্যায়নের পরিকল্পনা। পদ্মাই মলয়কেতুর মস্তিষ্কে এই পরিকল্পনা দেয় যে, সে যেন শকুনিসহ অন্য রাজাদের জরুরি আলোচনার মিথ্যে অজুহাতে আমন্ত্রণ পাঠায়। এবং, সেই আলোচনা সভায় তাদের হত্যা করে। মলয়কেতু পদ্মার কথামতোই কাজ করল। কিন্তু আফশোস এই যে, শকুনি পূর্বেই মলয়কেতুর মহলে নিজের চর রেখেছিল। যার ফলে এই পরিকল্পনার কথা সে আগেই জেনে ফেলে এবং সেই সভায় সে আসে না। তাই আমাদের প্রধান শত্রু শকুনি বেঁচে গেল।

এদিকে সিন্ধুসেনার বাহিনী চলছিল মগধের পথে। মলয়কেতু ভাবল তারা আসছে তার রাজ্যের উদ্দেশে। অতএব, উপত্যকা অঞ্চলে মলয়কেতু তাদের উপর আক্রমণ করল। সহজেই পরাজিত হল সিন্ধুসেনা। এই ঘটনা যে ঘটবে তা পূর্বেই আমরা জানতাম। তাই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল চন্দ্রগুপ্ত। মলয়কেতুর সেনা যখন সিন্ধের সেনার সঙ্গে যুদ্ধজয়ের পরে ফিরছে, তখন তাদের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করল চন্দ্রগুপ্তর সেনা। পূর্বেই যুদ্ধে ক্লান্ত মলয়কেতুর বাহিনীর সৈন্যরা পরাজিত হল সহজেই।

এদিকে ইতিমধ্যে আরও একটি ধাপ আমরা পার করে ফেলেছিলাম সেকথা মলয়কেতু টের পায়নি। মনে আছে জীবসিদ্ধি, তুমি আমায় প্রশ্ন করেছিলে যে, কুলূতের সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার পরেও কেন আমরা আমাদের সেনা সেখানেই রেখে দিয়েছি? তার কারণ ছিল। মলয়কেতু তিন রাজ্যে আক্রমণ করতে গিয়ে নির্বোধের মতো নিজের রাজধানী ও দুর্গ অরক্ষিত ছেড়ে তার সমস্ত সেনা যুদ্ধে ব্যবহার করছিল। সেই সুযোগে আমার নির্দেশে পর্বত্যকা রাজ্যের প্রতিবেশী রাজ্য কুলূতে বহাল থাকা মগধের সেনা মলয়কেতুর রাজধানীতে আক্রমণ করে। সেনাবাহিনী না থাকায় সহজেই সেনাপতি সিংহরণের নেতৃত্বে মৌর্য সেনা দুর্গ ও রাজধানী দখল করে। অতএব, মলয়কেতুর সেনা ঘর ও বাহির দুই হারাল। এভাবেই সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ— নীতি অবলম্বন করে সহজেই আমরা ছয় শত্রু রাজ্যকে পরাস্ত করে পঞ্চনদ জয় করলাম।

চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করল,

– কিন্তু মলয়কেতুর কী হল, আচার্য? সে তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক হয়ে আত্মগোপন করছে।

সেটাও পদ্মার কথাতেই সে করেছিল, চন্দ্র। যেকোনো সেনাই অর্ধেক মনোবল হারিয়ে ফেলে যদি তাদের রাজা তাদের পরিত্যাগ করে। বিশেষ করে তাদের সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রী সুদীপ্তক যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যথাসম্ভব সামান্য যুদ্ধে জয় করা। তাই মলয়কেতু তাদের পরিত্যাগ করায় তাদের

মনে যেটুকু প্রতিরোধের ইচ্ছে তাদের হৃদয়ে ছিল তাও শেষ হল। তারা স্বইচ্ছায় মগধের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

- আর মলয়কেতু? সে এখন কোথায়?

তার চিন্তা আমাদের আর করার প্রয়োজন নেই। সে নিজের ভূমিকা পালন করেছে, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মলয়কেতুর ব্যবস্থা পদ্মা করেছে। গতকালই তার পত্র পেয়েছি। পদ্মা পাটলিপুত্র ফিরছে। সবাই জানবে যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানিতে মলয়কেতু আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

চাণক্য কথা থামাতে কেউই কোনো কথা বলল না। কিছুক্ষণ প্রত্যেকে চুপচাপ বসে রইল নিজের স্থানে। অমাত্য রাক্ষস বললেন,

- আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে?

চাণক্য বললেন,

- আচার্য শকুনি আড়াল থেকে বেরিয়ে এইবার সম্মুখে এসেছে। তার সন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। যেহেতু সে মাঝে মাঝেই কুলূত ছেড়ে কোথাও যেত এবং কয়েক সপ্তাহ ব্যবধানে ফিরে আসত, অতএব, আমার অনুমান তার মুখ্যালয় আর্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিমেই কোথাও আছে। গোটা দেশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র উত্তরপশ্চিমে আমাদের সন্ধান চালানো উচিত। ইতিমধ্যে গত তিন বছরে, তিনবার শকুনি আমাদের উপর পরোক্ষভাবে আক্রমণ করেছে। দু-বার সে পরাজিত হলেও এইবার আমাদের একটি মোক্ষম আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে। সবথেকে আশঙ্কার কথা যে, সে আমাদের সম্বন্ধে এমন অনেক গোপনীয় তথ্য জানে যার ধারণা আমাদের পূর্বে ছিল না। তার প্রধান লক্ষ্য জীবসিদ্ধিকে রক্ষা করা গেলেও আমরা শশাঙ্ককে হারিয়েছি। প্রথমত উত্তর-পূর্বের দায়িত্ব অবিলম্বে তোমাদের মধ্যে কাউকে নিতে হবে। মনে রেখো, উত্তর-পূর্ব অঞ্চল হল এই দেশের প্রধান প্রবেশদ্বার। তাকে সুরক্ষিত করতে না পারলে সমূহ আর্যাবর্তের বিপদ। দ্বিতীয়ত, আমাদের গোপনীয়তার দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। যেহেতু শকুনি তোমাদের বিষয়ে জানে, অতএব তোমাদের পরিবারের উপর বিপদ আসার সমূহ সম্ভাবনা। পরিবারকে ব্যবহার করে সে তোমাদের অবধি পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারে। তাই যদি তোমাদের পরিবারের কোনো সদস্য পাটলিপুত্রের বাইরে থেকে থাকে, তাদের জরুরি ভিত্তিতে রাজধানীতে আনার ব্যবস্থা করো। তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা দ্বিগুণ করে দাও। অমাত্য কাত্যায়ন এই বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করবে। এবং, তোমরা নিজেরাও সতর্ক হয়ে যাও। ধরেই নেবে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপের উপর শত্রুর নজর আছে। সামান্যতম অসতর্কতা তোমাদের জন্যে এই মুহূর্ত থেকে প্রাণঘাতী হতে পারে।

চাণক্যর পাঁচ শিষ্যের চোয়াল শক্ত হল। চাণক্য বললেন,

আমায় আবার প্রথম থেকে নিজের ধারণাগুলোকে সাজাতে হবে। শুরু থেকে আবার আমাকে শুরু করতে হবে। আমাকে অনেক ভাবতে হবে। মন বলছে শকুনির বিষয়ে এমন কোনো রহস্য আছে যা আমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছি না। এবং, নিশ্চিতভাবেই জেনে রেখো, শকুনি আবারও আঘাত করবে! আমাদের তাই সবদিক থেকে তার আঘাত প্রতিহত করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

দ্বারের বাইরে থেকে প্রহরীর কণ্ঠ শোনা গেল,

— আর্য শশাঙ্কর স্ত্রী দেবী অহনা এসেছেন।

আলোচনা থামিয়ে চাণক্য বললেন,

— কেউ অহনাকে ভিতরে নিয়ে এসো।

রানি দুর্ধরা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

আমি যাচ্ছি, আচার্য। এই মুহূর্তে তার পাশে একজন স্ত্রীলোকের থাকা - প্রয়োজন।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন,

ধন্যবাদ, রানি। যাও, তাকে নিয়ে এসো এখানে। সবচেয়ে কঠিন কাজটা এবার আমায় করতে হবে। ভদ্রে অহনার হাতে তার স্বামীর অস্থি তুলে দিতে হবে।

দুর্ধরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে চাণক্য বললেন, -

— চন্দ্র, যদি তোমার অনুমতি হয় তবে শশাঙ্কর স্ত্রীর হাতে তার স্বামীর অস্থি আমি সমর্পণ করতে চাই।

— আপনি, গুরুদেব?

হ্যাঁ, চন্দ্র। শশাঙ্কর মৃত্যুর জন্যে যদি কেউ দায়ী হয়, তবে সে আমি। এইটুকু করে যদি আমার পাপ কিছুটা ক্ষমা হয়, সেই সুযোগ আমায় দাও, সম্রাট। চন্দ্রগুপ্ত হাতজোড় করে বলল,

- একথা বলবেন না, আচার্য। নিজেকে দায়ী করবেন না। আপনি না থাকলে আমাদের কারুরই কোনো অস্তিত্ব থাকত না। তবুও আপনার ইচ্ছাই শিরোধার্য হোক।

রানি দুর্ধরা নিজের বাহু কাঁধে রেখে এক স্ত্রীলোককে নিয়ে প্রবেশ করলেন। কোলে কাপড় জড়ানো একটি একমাস বয়সি শিশুকন্যা কেঁদে চলেছে। যেন পিতার মৃত্যুর শোক তাকেও ছুঁতে পেরেছে। অহনার পরনের বিধবার বেশ এবং চোখে-মুখের অসহায় বিহ্বল ভাবের দিকে এক দৃষ্টি পড়তেই উপস্থিত সকলের হৃদয়ে যেন ধাক্কা দিয়ে গেল। শোকস্তব্ধ সকলেই মাথা নীচু করে শুধুই দাঁড়িয়ে থাকল। চাণক্য অস্থিপাত্র তুলে নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন। অহনার সামনে গিয়ে মাথা নীচু করে বললেন,

‘মা, তোমার স্বামীকে আমি রক্ষা করতে পারিনি। স্বামীকে শেষ দেখাও তুমি দেখতে পাওনি। শশাঙ্ক তার কন্যার মুখদর্শন করে যেতে পারেনি। তোমার ও এই শিশুর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মতো সাহস আমার নেই। শশাঙ্কর এই শেষ স্মৃতি গ্রহণ করে দয়া করে আমায় কিছুটা অন্তত দায় মুক্ত করো। এবং, সম্ভব হলে এই পুত্রহারা এক পিতাকে ক্ষমা করো।’

অহনা ভেজাচোখে শশাঙ্কর অস্থিপাত্র গ্রহণ করল এবং সেইসঙ্গে নিজের কোলের শিশুকন্যাকে চাণক্যর কোলে দিল। কাঁপাস্বরে বলল,

‘আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল আমাদের কন্যার নামকরণ আপনি করবেন। শুনেছি মৃত্যুর শেষমুহূর্তেও ও…।’

কথা শেষ করতে পারল না অহনা। তার গলা ধরে এল। নিজেকে আবারও সামলে নিয়ে বলল,

‘আপনি দয়া করে ওর নামকরণ করুন, আচার্য।’

চাণক্যর কোলে গিয়ে শিশুকন্যাটির কান্না থেমেছে। চাণক্যর কুরূপ মুখের দিকে চেয়ে শিশুটি হেসে উঠল। তার ছোটো ছোটো দু-হাত দিয়ে চাণক্যর শিখা ধরতে চাইছে।

চাণক্য আর্দ্রস্বরে বললেন,

‘প্রতিটি শিশু এই অন্ধকার পৃথিবীতে আসে একটি আশার আলোর কিরণ হয়ে। পৃথিবীতে বড়ো অন্ধকার। এখানে আলোর বড়ো প্রয়োজন। তাই তোমার নাম রাখলাম— জ্যোতি!’

Author's Note:

১. সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ চাণক্যর কূটনীতির চার উপাদান। 'সাম' অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করা অথবা কাউকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কার্যসিদ্ধি করা (brainwashing)। 'দাম' অর্থাৎ আর্থিক বা অন্যপ্রকার লোভ দেখিয়ে কার্যোদ্ধারের নীতি (bribing)। 'দণ্ড' অর্থাৎ অপরাধীকে সাজা দেওয়া (punishment)। 'ভেদ' অর্থাৎ অন্যের গুপ্তরহস্য জেনে তাকে তা প্রকাশ করার ভয় দেখিয়ে নিজের কার্যে ব্যবহার করা (blackmail)।

২. অমাত্য রাক্ষসের অঙ্গুরীয় মুদ্রার ছাপ ব্যবহার করে পত্র লিখে শত্রুদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা অংশটি বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'-এর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। চতুর্থ শতাব্দী বা অষ্টম শতাব্দীতে সংস্কৃত কবি বিশাখদত্ত দ্বারা রচিত একটি ঐতিহাসিক নাটক 'মুদ্রারাক্ষস' সম্ভবত বিশ্বের প্রথম পলিটিকাল থ্রিলার। জটিল রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কৌশলের মধ্যে দিয়ে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর রাজনৈতিক উত্থান এই নাটকের মূল উপজীব্য। তবে এই নাটকে চাণক্যর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী অমাত্য রাক্ষস। আমার এই উপন্যাস-এর প্রেক্ষাপট ও কাহিনিবিস্তার সম্পূর্ণই ভিন্ন।

৩. বিশ্বাসঘাতক ছয় রাজার নাম ও তাদের রাজ্যের নাম 'মুদ্রারাক্ষস' থেকেই নেওয়া। মুদ্রারাক্ষস-এ যে ছয় বিশ্বাসঘাতক রাজার নাম উল্লিখিত আছে যাঁরা মৌর্যদের বিরুদ্ধে তাঁরা হলেন— পার্বত্য প্রদেশের রাজা মলয়কেতু, মলয়নগরের মহারাজ সিংহনাদ, কাশ্যপনগরের মহারাজা পুষ্করক্ষ, সিন্ধের শাসক সিন্ধুসেনা, সুদূর পারস্যের মহারাজ মেঘনন্দ এবং কুলূলুতের রাজা চিত্রবর্মা। মলয়কেতুকে কোনো জায়গায় বলা হয়েছে পুরুষের ভাইয়ের ছেলে, কোথাও-বা আবার তার ছেলে। আমি এই উপন্যাসে তাকে এক বীর পুরু রাজার মূর্খ পুত্র হিসাবেই তুলে ধরলাম।

৪. এই উপন্যাসে উল্লিখিত ময়নাতদন্ত (post-mortem) সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বাস্তবে চাণক্যর 'অর্থশাস্ত্র'-তে লেখা আছে। মৃতদেহর পরীক্ষা পদ্ধতি, পাকস্থলীর অপাচিত খাদ্য পরীক্ষা পদ্ধতি, যাবতীয় পদ্ধতির উল্লেখ চাণক্য করে গিয়েছেন নিজের অর্থশাস্ত্রে। এই বিষয় নিয়ে কয়েকটি রিসার্চ পেপারের উল্লেখ রেফারেন্সে দিলাম।

৫. চাণক্য তাঁর শত্রুদের গোড়া থেকে নিঃশেষ করাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই দিক ব্যাখ্যা করতে একটি বহুল প্রচলিত কাহিনি আছে যে, চাণক্য কীভাবে কাঁটাঝোপ মারতে তার গোড়ায় দইয়ের তৈরি মিষ্টি 'মঠঠা' শরবত ঢেলে দিয়েছিলেন যাতে পিঁপড়ে এসে শেকড় খেয়ে যায়। এই কাহিনির উল্লেখ এখানেও করলাম। গোটা উপন্যাসই সেই কাহিনির রূপক মাত্র, যেখানে বুদ্ধিবলে অন্য শত্রুদেরই ব্যবহার করা হয়েছে অন্য শত্রুদের শেষ করতে।

References:

1. T Ganapati Śāstri, Kouṭaliyam Arthasā -stra - Śrimulākhyayā vyākhyā, Rastriya Sanskrit Samsthān, New Delhi, Edition 2002, Part 1 and 2.

2. Vishakhadutta krit Mudrarakshasha (in Hindi), anubadakBharatbhusan Shri Bharatendu Harischandra, Ramnarayan Lal Publishers, 2006.

3. Parth Kumar Chaudhary, Dr Vasudev A Chate, Dr Shreevathsa. Insight into Kautilya Arthashastra with Perspective of Ayurveda, RGUHS Journal of AYUSH Sciences. 2022, Volume: 9, Issue: 1, Page no. 38-49, DOI:10.26715/rjas.9_1_2.

4. Sharda Hanumantrao et al: Poisoning in ancient India w.s.r. to Kautilya Arthashastra www.ijaar.in IJAAR VOLUME III ISSUE 1 MAR-APR 2017 page No:150-154.

5. GP Prasad, G Babu, G K Swami, Historical evidences on medicolegal autopsy and toxicological descriptions in Kautilya's Arthaśāstra, Bulletin of the Indian Institute of History of Medicine (Hyderabad), 36(2):167-76, 2006.

6. Prof (Dr) Veenus Jain, Vishkanya: The Poisonous Celibate, International Research Journal of Commerce Arts and Science, Volume 8, Issue 4, 2017.

7. Sandhya Varadharajan, Forensics in Arthashastra, Sandhya's Blog (http://sandhya.varadh.com/2020/03/forensics-in arthashastra.html).

8. Indubala Kachhwa, Mithridatism- Story of a King who consumed poison to be safe, (https://www.linkedin.com/pulse/mithridatismstory-king-who-consumed-poison-besafe-indubalakachhawa)

9. Prateek Dasgupta, Visha Kanyas: The Deadly Cult of Poisonous Female Assassins (https://medium.com/teatimehistory/visha-kanyas-the-deadly-cult-of-poisonous-femaleassassins-3d38c7e0d3a9)

চাণক্য সিরিজ ২

আরও একবার স্বাগত আপনাকে প্রাচীন ভারতবর্ষে। যেখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে রহস্য, হত্যা, রাজনীতি, ষড়যন্ত্র এবং... আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য।

চাণক্য কি পারবেন নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর তদন্তপদ্ধতিতে, আপাতদৃষ্টিতে প্রায় অসম্ভব রহস্যের সমাধান করতে?

এক কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে মগধের সম্রাটের সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়েছে তাঁর শত্রুপক্ষের কন্যার। কিন্তু বিবাহের দিনে ভাবী মহারানিকে হত্যার চেষ্টা করল কে? গুপ্তহত্যা নাকি চক্রান্ত? মগধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে এক অদৃশ্য শত্রু। তার অবধি পৌঁছোনোর একমাত্র সূত্র হল একটি বিষাক্ত বাণ। কিন্তু কোন উপায়ে জনসমাগমের মাঝেই নিহত হলেন কুলূতের রাজা, অথচ হত্যাকারীকে কেউ দেখতে পেল না? কীভাবে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে উধাও হয়ে গেল গৃহবন্দি?

* * *

সকল প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে বইয়ের দুটি উপন্যাসের পাতায়। যে রহস্যের, রাজনীতির ও বুদ্ধির চতুরঙ্গ খেলার শুরু হয়েছিল 'হত্যা-শাস্ত্র'-তে, সেই খেলার দ্বিতীয় দানের সময় এবার আগত।


9 789392 722929